শারদীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
১৩৬৬

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় — লেখকের নাম — পৃষ্ঠা

কবিতা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

COSSIMBAZAR
কর্ম্মহীনে
কর্ম্মদান
সেবা
বেকারীর অবসানই আজ সমস্যা ঃ অগণিত কর্ম-উন্মুখ নরনারী কর্মসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে জীবনে বিতৃষ্ণ হ'য়ে পড়ছে। 'মণীন্দ্র মিল' এই সমস্যার সমাধানে যথাসাধ্য সহায়তা করছে এবং বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি ও অধিকতর সংখ্যক লোকের কর্ম-সংস্থানের উদ্দেশ্যে মিলে যন্ত্র-পাতির সংখ্যা বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।
মণীন্দ্র
মিলস
লিমিটেড
অন্যতম ডি, এন, চৌধুরী শিল্প প্রতিষ্ঠান
পি-৪৯, বি, কে, পাল এভেন্যু, কলিঃ-৫
মিল—কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ জেলা।

প্রাচীন পট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শ্রীবৃন্দাবনবিহারী মল্লিকের সৌজন্যে

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ॥

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

মহালয়া

১৩৬৬

॥ মাতৃপূজা ॥

বাঙ্গালীর ঘরে মা আসিতেছেন! কেমন সে মা? মা আমাদের দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী। তিনি বীরেন্দ্রসিংহ পৃষ্ঠবিহারিণী। তাঁহার দক্ষিণে ঐশ্বর্যস্বরূপিণী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী। তাঁহার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ। এবং বলরূপী কার্তিকেয়। বাঙ্গালীর মানসলোক উজ্জ্বল করিয়া শরচ্চন্দ্র নিভাননা জননীর এই চিন্ময়মূর্তি খুলিয়াছে। সে রূপের আকর্ষণে বাঙ্গালী নাচিয়াছে, মাতিয়াছে। শোক দুঃখ ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গালী মাতৃপূজার অর্ঘ্যোপচার আহরণ করিয়াছে। বাংলার দিকে দিকে উঠিয়াছে গান, জাগিয়াছে প্রাণ। মাতৃপূজায় সন্তানের ঐকান্তিক সেই অবদানের সমারম্ভ প্রভাবে এদেশের আকাশে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার পুঞ্জীভূত আঁধারে বহ্নিবীর্য বিকীরিত হইয়াছে। মেঘের কোলে সৌদামিনীর সে খেলা। দিগ্দাহী বজ্রানলবাহী বিদ্যুৎদামের চমকে সন্তানের দল জাগিয়াছে। ফাঁসীমঞ্চে তাহারা জীবনের জয়গান গাহিয়াছে। শোণিতের অঞ্জলী দিয়া তাহারা মায়ের পদতল রঞ্জিত করিয়াছে।

সিদ্ধি মিলিয়াছে কি বাঙ্গালীর এই সাধনায়? মাতৃপূজায় এখনও আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। মা আমাদের সন্তানের স্নেহে উন্মাদিনী। তিনি জটাজুট সমাযুক্তা। মায়ের অগণিত সন্তান আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন; আশ্রয়হীন তাহারা।

মায়ের শান্তি কোথায়? কে আছ মাতৃসাধক, মায়ের দুঃখ উপলব্ধি কর। আর্ত, পীড়িত, নিরাশ্রয় মায়ের সন্তানদের অশ্রু মুছাইতে আগাইয়া যাও। বীরের ব্রত গ্রহণ কর। দুর্বল যে, যে ভীরু, মায়ের সেবায় তাহার অধিকার নাই। জীবনের যত গ্লানি লইয়া পড়িয়া থাকুক সে পিছনে। তুমি আগাইয়া চল। মাতৃযজ্ঞে জীবন আহুতি দিতে প্রস্তুত হও। দুর্বৃত্তের কৃত্তাশমনকল্পে মায়ের খড়্গ দুলিয়া উঠিবে। মাতৃপূজা সার্থক হইবে।

দেবী ভগবতী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

বাঙালী সহজভাবে মাকে পাইয়াছিল। কেমন এই মা? তিনি ভগবতী, তিনি পরমা দেবী। সহজভাবে তাঁহাকে পাওয়া কিন্তু সহজ নয়; কারণ তিনি অচিন্ত্যা, তিনি মহাব্রতা। তাঁহাকে পাইতে হইলে দুই-এক দিনের ব্রত অথবা সাধনা নহে, দীর্ঘকাল সেজন্য মহাব্রত অবলম্বন করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞ যাঁহারা, যাঁহারা মুনিঋষি, ইন্দ্রিয়নিচয় নিরোধ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। এমন যে মা বাঙালী তাঁহাকেই পাইয়াছিল; পাইয়াছিল অর্থ—দেখিয়াছিল। কারণ পাওয়া বলিলে প্রত্যক্ষতাই বুঝায়। যে বস্তু অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, তেমন বস্তুতে আমাদের সম্বন্ধ জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে না এবং আমাদের চিত্তে তৎসম্বন্ধে ভাব জন্মে না। অথচ ভাবেই প্রত্যয়বোধ বা পাওয়া। প্রত্যুত ব্যক্ততাতেই আত্মস্থের উদ্দীপ্ত এবং সেই উদ্দীপ্তির সর্বতোময় অনুভূতিই প্রাপ্তি। এমন প্রাপ্তি বা লাভ সাধকের মনের মূলের সকল সংস্কার আলো করিয়া সর্ব সম্বন্ধে আত্মভাব বিস্তার করে এবং রূপে, রসে, স্পর্শে, গন্ধে তাঁহার অন্তরে সাধ্যতত্ত্বকেই প্রমূর্ত করিয়া তোলে। মনোময় সেই প্রমূর্ত লীলার আবর্তে সাধক সর্ব সম্বন্ধে সাধ্যতত্ত্বকে জড়াইয়া ধরিতে উন্মুখ হন। সেই উন্মুখতায় বা আকুলতায় অন্তরের ভাবটি ঘনীভূত হইয়া স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভাবে পরম মাধুর্য বিস্তার করে; দেবতা বিগ্রহ-রূপে সর্বভাবে সেবার স্বাচ্ছন্দ্য এবং সৌলভ্যে ভক্তের কাছে ধরা দেন।

বাঙালী এই ভাবেই মাকে পাইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের মূলীভূত যে সত্য বাঙালীর দেবী দশভুজার মূর্তিতে তাহারই চিন্ময় অর্থাৎ বাঙ্ময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় বিলাসই প্রকটিত হইয়াছে। ইতিহাস যাহাই বলুক, বাঙালীর ঘরে দেবী দুর্গার বিগ্রহরূপে আবির্ভাবের মূলে বাঙালীর প্রাণধর্মের পরিপ্লাবনশীল উচ্ছ্বাসই কাজ করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেবী দুর্গার অনুধ্যানটি বাঙালী সাময়িক কোন প্রয়োজনবোধের প্রেরণায় বা স্বার্থকেন্দ্রিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদে পায় নাই। বৃহতের বেদনাতেই দেবী অখণ্ড এবং এক রসের বিগ্রহে দীপ্তি এবং দ্যুতি লইয়া বাঙালীর আঙিনায় তাঁহার উদার মাতৃমহিমার পরম মাধুর্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে আসিয়া বাঙালীকে নিজ করিয়া লইয়াছিলেন। দেবীর রূপ দেখিয়া এবং দুর্গতিহারিণী দুর্গা এই মন্ত্রবীজে মজিয়া বাঙালী ভারতকে প্রাণধর্মে সঞ্জীবিত করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিল। বস্তুত বাঙালীর কাছে দেবীর দুর্গারূপে এই আবির্ভাবটি পরম রহস্যময়। সাধক যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষেই তাহা অনুভবের বস্তু। কিন্তু যাঁহারা সেই সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই, তাঁহাদেরও পক্ষে দেবীর এই দুর্গা-রূপে আবির্ভাবের তত্ত্বটি অনুধ্যেয়, কারণ জাতির অভ্যুন্নতির পক্ষে তাহার একান্ত-ভাবে প্রয়োজন আছে, ফলত ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্র যে বহ্নিবীজে জাতিকে দীক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সাধনায় সিদ্ধি-লাভ আজও জাতির পক্ষে ঘটে নাই। সেই মন্ত্রের সাধনায় দেবীর রূপটি যদি আমরা অনুধ্যেয় স্বরূপে গ্রহণ করিতে না পারি, তবে আধ্যাত্মিকতার কথা না হয় থাকিল, ঐহিকতার পক্ষেও আমাদের অগ্রগতির সকল প্রচেষ্টা প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। মাকে যদি আমরা অন্তরে না পাই, তবে শুধু বাহিরের উপচার বাড়াইয়া আমরা বাঁচিব না। পক্ষান্তরে সে-পথে আগাইতে গেলে আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহাও আমরা হারাইয়া ফেলিব। বলিতে কী, অতি আধুনিকতার এই যুগে এইসব কথা বলা অনেকটা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বাহিরের উপচার বাড়াইবার দিকে অন্ধভাবে ছুটিয়া চলিয়াছি। এই অন্ধতা মানুষ হিসাবে নিজেদের অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। ইহার ফলে আমাদের অসহায়ত্ব উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে এবং স্বাধীনতার নামে জড় স্বার্থগত পশুর জীবনের পরবশ্যতার ভিতর আমরা যাইয়া পড়িতেছি। আসুরিক প্রবৃত্তি আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। নিতান্ত নির্মম, নিষ্ঠুর এবং ক্রূর সেই শক্তির গতি। ইহার পেষণে জাতির মনোমূল ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। আমরা আমাদের অন্তরের বলিষ্ঠ কোন আদর্শের প্রেরণা অনুভব করিতে পারিতেছি না। নিতান্ত অনাখ্য এই যে পরিভব ইহার প্রতিবেশে মনুষ্যত্ব আজ নির্জিত হইতে চলিয়াছে। নিঃস্ব আমাদের অবস্থা। "নিঃস্ব-জনের দুঃস্বপনের বন্ধ ঘুচানো দায় রে," কবির উক্তিটি এই সম্পর্কে মনে পড়ে। সতাই নিঃস্ব জনকে দুঃস্বপ্নের বন্ধন হইতে মুক্ত করা বড়ই শক্ত। দেবীর কৃপা ব্যতীত এই অবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বোধ হয় কোন উপায় নাই।

প্রশ্ন উঠিবে এই যে, দেবী বলিতে যাঁহাকে বুঝাইতে চাহিতেছি, যাঁহাকে বলিতেছি মা, তাঁহাকে পাইলে আমাদের জীবনের দুর্গতি দূর হইবে, এসব সে-কালের কথা, অতীতের ভাববিলাসিতা মাত্র। হয়ত আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিবেন, প্রেতের আত্মা তোমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। সেই দেবী বা মায়ের সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের সংযোগ কতটুকু এবং তাঁহার সাধনার সঙ্গে সামাজিক চেতনা আছে কতখানি? আমরা চাই সমাজকল্যাণ, ; সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট এবং অনর্থক কোন ভাবাদর্শে ভাসিয়া গেলে আজ আমাদের চলে না, ইত্যাদি। এমন যুক্তি যাঁহারা উপস্থিত করেন, তাঁহাদের কাছে আমাদের বক্তব্য এই যে, দুর্গা এই যে দেবী, ইঁহার সহিত আমাদের জীবনের সর্বভাবে সংযোগ রহিয়াছে। এই দেবী জাতির সমষ্টি-চেতনার এবং সর্বজনীন বেদনার মনোময় বিগ্রহস্বরূপিণী। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের যতকিছু ভোগ। আমরা ত এই ভোগই চাহিতেছি এবং এই ভোগার্থেই জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের মুখে মুখে আজকাল আন্তর্জাতিকতার কথা। আমরা দেশের জন্য, জাতির জন্য যতটা না ভাবি, জগতের জন্য তাহার চেয়ে আমাদের বেশী ভাবনা। বিশ্বের জন্য আমাদের সকলের বুকে ব্যথা। আমাদের যিনি মা, তিনি জগৎ ছাড়া নহেন। পক্ষান্তরে জগৎই তাঁহার মূর্তি, সমগ্র জগৎ তাঁহারই আত্মশক্তিতে পরিব্যাপ্ত। অন্য কথায় জগৎকে আপন করিবার ভাবটি লইয়াই তাঁহার প্রভাব। জগৎকে আমরা আপন

করিতে চাই, কিন্তু সে-কাজটি সম্পন্ন করিব কী ভাবে? এই আত্মভাবটি অন্তরে দীপ্ত করিয়াই ত? জগতের গাছ, মাটি, পাথর—এইগুলি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ত জগৎকে আপন করা যায় না। জগৎকে আপন করিয়া পাইতে হইলে আমাদের সমগ্র প্রতিবেশে আগে আত্মভাবটিকে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হয়। আত্মভাবের এই ঘনিষ্ঠতা আবার নৈকট্যবোধকে ভিত্তি করিয়াই বিস্তার লাভ করে, অর্থাৎ আমাদের দেশ, আমাদের জাতি ইহাদিগকে যখন আমরা আপন করিতে পারি, তখনই আমরা জগৎকে আপন করিবার যোগ্যতা লাভ করি, নতুবা আমাদের মনের গোড়ায় ফাঁক থাকিয়া যায় এবং সত্যকার কোন শক্তি ব্যাপ্তিশীল সামর্থ্যে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয় না। বস্তুত আমরা যদি আত্ম-শক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারি, তবে পরের অনুকৃতি বা অনুগতির দ্বারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মত শক্তি আমাদের মিলিবে না। যে-জাতির আত্মপ্রত্যয় নাই, নিজেদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতির মধ্যে নিজ ভাবটিকে যাহারা সত্য করিয়া পায় নাই, তাহাদের ভিক্ষাবৃত্তিই সার —হয়। মিথ্যাচারের পথে তাহারা নিজেরা বিড়ম্বিত হয় এবং জগতের নিকট হইতে ধিক্কারই লাভ করে।

এদেশের ঋষিরা বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত অনন্ত শক্তির মূলে জগদেকশক্তির ব্যাপ্ত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই প্রত্যক্ষতা তাঁহা-দিগকে ঘরে-বাহিরে পরে-অপরে পরম বলে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যক্ষতার এই বল বলিতে বিচার-বিতর্ক, সন্দেহ এবং সংশয়ের অতি প্রাণময় উজ্জ্বল লীলা বুঝায়, বুঝায় সব জুড়িয়া [illegible]রেরই খেলা। সে অনু-ভূতিতে হেলা-ফেলার কোন কারবার নাই, সর্বত্র শ্রদ্ধা-প্রণিহিত এবং সর্ব সম্বন্ধে থাকে সেখানে উদার দৃষ্টি। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মভাবের ব্যক্ততাই লীলা। অন্য কথায় আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে আত্মশক্তির সে অবস্থায় অভিব্যক্তি তখন জড়ে চৈতন্য-ময় পরতত্ত্বের লাবণ্য আমাদের দৃষ্টিতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে, এবং অনিত্য রূপ-প্রতীতির ক্ষেত্রে নিত্য সত্যের সেখানে প্রকাশ ঘটে। এমন প্রকাশে আমাদের মনো-বৃত্তিসমূহ অনায়াসে পরিস্ফূর্তি পায়; আমাদের মননের মূলে বীর্যময় মাধুর্য ফুটিয়া উঠে, সব সংশয় কাটিয়া যায়। তখন জীবনের সর্বত্র নির্ভয়। আমাদের জীবনের মূলে যত সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে এই ভয়। পরস্পরের সম্বন্ধে সংশয় বা পরবোধই এই ভয়ের মূলে কাজ করে। সুতরাং ভয়কে জয় করিতে হইলে এই বোধকে অতিক্রম করা প্রয়োজন। অন্য কথায় আমাদের নিজেদের

স্কেচ শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু

মনকে বদলাইয়া ফেলা দরকার। দেবী দুর্গার অনুধ্যানে মনে এই ব্যাপ্তিশীল উদ্দীপনা লাভের ভারটি বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে। সর্বশক্তিময়ী মাকে অন্তরে না পাইলে, অন্য কথায় সকলকে আলিঙ্গন দানে সর্বদা সমুদ্যতা মায়ের লীলাটি হৃদয়ে উদ্দীপ্ত না হইলে, পরবোধ নিরাকৃত হইতে পারে না। ফলত মায়ের সর্বতোব্যাপ্ত ব্যক্ত ভাবটি অন্তরে বীজরূপে পাইয়া সেইভাবে মজিয়া তবে ভয়কে জয় করা যায় এবং সকলের সঙ্গে সমাত্ম সম্বন্ধের বা প্রীতির ভিত্তি রহিয়াছে সেইখানে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষিতিতত্ত্বে অর্থাৎ আধি ভৌতিক ক্ষেত্রে খোলা কথায় আমাদের ঘরে, আমাদের সংসারে প্রত্যক্ষরূপে মায়ের কৃপার স্পর্শ না পাইলে সাধনায় দিব্য-ভাবের উজ্জীবন ঘটে না। যৌগিক ভাষায় মূলাধারে মায়ের আত্মভাবটি ব্যক্ত না হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়া উঠেন না। ফলত আনন্দময়ী দেবীকে সমগ্রভাবে যিনি পান, সাধিভূত, সাধিযজ্ঞ এবং সাধিদৈব নিজের সমগ্র চেতনার মূলে তাঁহাকে তিনি অখণ্ড রসে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সে-ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনে সকল ভাবে মায়ের সেবা সত্য হইয়া উঠে, কর্মের কোন স্তরকে ফাঁকি দিয়া মায়ের সঙ্গে দেখাদেখি, মাখা-মাখি চলে না। মায়ের আত্মশক্তির যোগান এমন অভিব্যক্তি, কেমন সে রাজ্য? সাধকেরা বলেন, সেইখানে আমাদের স্বারাজ্য। সেখানে "মা-ই মোদের রাজা মা-ই মোদের রানী;" সেখানে তিনিই ব্যক্তি, তিনিই বাণী। তাঁহার চিন্ময়লীলার সেখানে উল্লাস, সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত সেখানে তাঁহার প্রকাশ। সেখানে সন্তানকে লইয়া তাঁহার ঘর। মা সেখানে ঐশ্বর্যের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া সন্তানের কাছে ছুটিয়া আসেন। সকলকে তিনি আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন। মায়ের আদরের সেই স্পর্শ অগ্নিময়। তাহার দুরন্ত তাপে দিগন্তের আঁধার দূর হইয়া যায়, অগ্নিময়ী মায়ের

কাঠখোদাই — শিল্পী ঃ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সেই আগুনের খেলায় আমাদের সকল অবীর্য দগ্ধ হয় এবং সকল গ্রন্থি, সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমরা তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাই। ব্যক্তভাবে মায়ের অনুভাবের এমন যে বৈচিত্র্য, এই যে বিলাস, তাহার মাধুর্যের এমন যে চাতুর্য, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকেই বা কতটুকু ব্যক্ত করিতে পারি? এমন অবস্থায় নিখিল বিশ্বের যিনি জননী তাঁহার স্নেহময় বিগ্রহের মাধুরী এবং চাতুরী যে অব্যক্ত থাকিবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মা ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন। তাঁহার অব্যক্ত ভাবেও ব্যক্ত ভাবটি বেদনার বীজরূপে নিহিত থাকে এবং ব্যক্ত ভাবেই আমরা তাঁহাকে নিজরূপে জানি এবং চিনি। ব্যক্তভাবে তিনি আমাদের পক্ষে অনন্ত এবং অব্যক্ত মাধুর্য-বীর্যে সনাতনী। বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তভাবে তাঁহার রূপটি না দেখিলে নয়ন মেলিয়া তাঁহার অনন্ত এবং অশেষ রূপের মাধুরী পান করা যায় না। তাঁহার পাদপদ্মসেবায় প্রেমভক্তি মিলে না।

বাঙালীর দেবী দুর্গার অনুধ্যানে এই ব্যক্ত ভাবটিই বড় কথা। বৈদিক ঋষিগণ মায়ের এই ব্যক্ত ভাবটি ধরিয়াই মাকে তাঁহাদের জীবনে সত্য এবং নিত্য করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা দেবীকে মা এই-রূপে নিজেদের ঘরে, নিজেদের সংসারে পাইয়াছিলেন। কন্যারূপে তাঁহারা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। শব্দে শব্দে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন মায়েরই পদধ্বনি। সেই ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তারলাভ করিয়া তাঁহাদের শ্রুতিপথে উদিত হইয়াছিল। তাঁহারা নিখিল বিশ্বকেন্দ্রে মায়ের সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তভাবে এমন সাধনাতেই ভক্তি লাভ হয় এবং শক্তি মিলে এবং আমাদের জীবনের সকল কর্মের ভিতর দিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সমাজের সংস্থিতিতে বিশ্ব-হিতে জাতির প্রাণশক্তির উদার অভ্যুদয় সেই পথেই সম্ভব হইতে পারে।

নিঃশেষ-দেবগণ শক্তিসমূহ মূর্তি এই জননী। সকল দেবতার উপাসনা মায়ের উপাসনাতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেব-শক্তির তিনি আধার; সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিলে সর্ববিধ কামনার পরিতৃপ্তি ঘটে। বস্তুত কামনার বশে পরিচালিত হইয়াই আমরা বিভিন্ন দেবতার পরিকল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠা একেকে আশ্রয় করিয়াই জাগে এবং নিষ্ঠার অভাবে কোন সাধনাই প্রাণধর্মে বলিষ্ঠ হইতে পারে না, সুতরাং সে-পথে আমাদের প্রয়োজনও মিটে না। ফলত সর্বদেবময়ী যিনি, যিনি সর্বাত্মস্বরূপিণী, যিনি আমাদের সকলের জননী, তাঁহার পূজাতেই আমাদের জীবন সার্থকতা লাভ করে। বাঙালী এমন মাকে দেখিয়াছিল, দেখিয়াছিল সর্বৈশ্বর্য-স্বরূপিণী যিনি তাঁহাকে; দেখিয়াছিল সে পরমা দেবী যিনি ভগবতী সেই মাকে। দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী, সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলরূপী কার্তিকের, ইঁহাদিগকে লইয়া বাঙালীর দৃষ্টিতে বিশ্বজননী তাঁহার আত্মমহিমা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মাকে এমন দেখা সোজা ব্যাপার নয়। গীতার ভগবদ্‌উক্তি অন্তরে স্মরণ করিতে বাসনা জাগে, এমন দর্শন লাভ দেবতাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কারণ "প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার, তাঁহার কৃপাতে হয় সাক্ষাৎ তাঁহার", বাঙালী এই প্রেমের অধিকারী হইয়াছিল। সেই প্রেমের জয়, আর জয় তাঁহার যাঁহার এমন কৃপা। প্রেম যেমন নিত্য, প্রেম যেমন সত্য, কৃপাও তেমনই নিত্য ও সত্য। দেবী-পূজার শুভলগ্নে প্রেম-প্রভাবিতা দেবীর পরম কৃপা নিত্য, সত্য এবং ধ্রুব স্মৃতিতে আমাদের অন্তরে জাগ্রত হউক। আমরা জাতির সকল নরনারীর মধ্যে মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরম বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইব। দেবীর আবির্ভাবে অসুরের ভীতি নিরাকৃত হইবে। দেবগণের স্তুতি-গীতিতে বিশ্বের সর্বত্র প্রাণশক্তি বিচ্ছুরিত হইবে। বাঙলার মাটিতে মানুষ জাগিবে। বাঙলার মানুষের সাধনবীর্যে বিশ্বজগতে মানব-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

নদীতীরে — শিল্পীঃ শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

হেমন্ত পাল চৌধুরীর বয়স ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু সে একজন পাকা ব্যবসাদার, পৈতৃক কাঠের কারবার ভাল করেই চালাচ্ছে। রাত প্রায় নটা, বাড়ির একতলার অফিস ঘরে বসে হেমন্ত হিসাবের খাতাপত্র দেখছে। তার জ্ঞাতি-ভাই নীতীশ হঠাৎ ঘরে এসে বলল, তোমার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। বড় ব্যস্ত নাকি?

হেমন্ত বলল, না, আমার কাজ কাল সকালে করলেও চলবে। ব্যাপার কি, এমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছ কেন? তোমাদের তো এই সময় জোর তাসের আড্ডা বসে। কোনও মন্দ খবর নাকি?

নীতীশ বলল, ভাল কি মন্দ জানি না, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। যা বলছি স্থির হয়ে শোন।

নীতীশের কথার আগে তার সঙ্গে হেমন্তর সম্পর্কটা জানা দরকার। এদের দুজনেরই প্রপিতামহ ছিলেন মদন-মোহন পাল চৌধুরী, প্রবলপ্রতাপ জমিদার। তাঁর দুই পুত্র অনঙ্গ আর কন্দর্প বৈমাত্র ভাই, বাপের মৃত্যুর পর বিষয় ভাগ করে পৃথক হন। অনঙ্গ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, অনেক সম্পত্তি বন্ধক রেখে কন্দর্পের কাছ থেকে বিস্তর টাকা ধার নিয়েছিলেন। অল্পবয়স্ক পুত্র বসন্তকে রেখে অনঙ্গ অকালে মারা যান। কন্দর্প তাঁর ভাইপোর সঙ্গে আজীবন মকদ্দমা চালান। অবশেষে তিনি জয়ী হন এবং বসন্ত প্রায় সর্বস্বান্ত হন। পরে বসন্ত কাঠের কারবার আরম্ভ করেন। তিনি গত হলে তাঁর পুত্র হেমন্ত সেই কারবারের খুব উন্নতি করেছে।

কন্দর্প আর তাঁর পুত্র যতীশও গত হয়েছেন। যতীশের পুত্র নীতীশ এখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। জমিদারি আর নেই, আগেকার ঐশ্বর্যও কমে গেছে, কিন্তু পৈতৃক সঞ্চয় যা আছে তা থেকে নীতীশের আয় ভালই হয়। রোজগারের জন্যে তাকে খাটতে হয় না, বদখেয়ালও তার নেই, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আর সাহিত্য সিনেমা ফুটবল ক্রিকেট রাজনীতি চর্চা করে সময় কাটায়। হেমন্ত তার সমবয়স্ক, দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়েছিল। এদের বাপদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না, কিন্তু হেমন্ত আর নীতীশের মধ্যে পৈতৃক মনোমালিন্য মোটেই নেই, অন্তরঙ্গতাও বেশী নেই।

মাথায় দু হাত দিয়ে নীতীশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, ভাই হেমন্ত, মহাপাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

হেমন্ত বলল, পাপটা কি শুনি। খুন না ডাকাতি না নারীহরণ? কি করেছ তুমি?

—আমি কিছুই করি নি, করেছেন আমার ঠাকুরদা।

—কন্দর্পমোহন পাল চৌধুরী? তিনি তো বহুকাল গত হয়েছেন, তাঁর পাপের জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন? উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বেয়াড়া ব্যাধি পেয়েছ নাকি?

—না, আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। আজ সকালে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটছিলুম। জমিদারি তো গেছে, বাজে দলিল আর কাগজপত্র রেখে লাভ নেই, তাই জঞ্জাল সাফ করছিলুম। ঠাকুরদার আমলের একটা কাঠের বাক্সে হঠাৎ কতকগুলো পুরনো চিঠিপত্র আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে

গেছি, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। ওঃ, মহাপাপ মহাপাপ!

—ব্যাপারটা কি?

—আমার ঠাকুরদা কন্দর্প তোমার ঠাকুরদা অনঙ্গের নায়েব-গোমস্তাদের ঘুষ দিয়ে কতকগুলো দলিল জাল করেছিলেন আর মিথ্যে সাক্ষী খাড়া করেছিলেন। তারই ফলে তোমার বাবা মকদ্দমায় হেরে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—বল কি! না না, তা হতে পারে না, নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে।

—ভুল মোটেই হয় নি। আমার ভগিনীপতি ফণীবাবুকে জান তো? মস্ত উকিল। তাঁকে সব কাগজপত্র দেখিয়েছি। তিনিও বলেছেন, আমার ঠাকুরদার জাল-জোচ্চুরির ফলেই তোমার বাবা বসন্ত পাল চৌধুরী সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—তা এখন করতে চাও কি? ফণীবাবু কি বলেন?

—বললেন, চুপ মেরে যাও। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মন খারাপ ক'রো না, পুরনো কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেল, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

—তাই বুঝি তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে জানাতে এসেছ? ফণীবাবু বিচক্ষণ ঝানু লোক, পাকা কথা বলেছেন, গতস্য অনুশোচনা নাস্তি। পুরনো কাসন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। আর, ও তো তামাদি হয়ে গেছে।

উত্তেজিত হয়ে নীতীশ বলল, কি যা তা বলছ, পাপ কখনও তামাদি হয় না। আমার ঠাকুরদা জোচ্চুরি করে যা আদায় করেছেন তা আমি ভোগ করতে চাই না। খতিয়ে দেখেছি, সুদে আসলে প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা তোমার পাওনা। সে টাকা তোমাকে না দিলে আমার স্বস্তি নেই।

—ওই টাকা দিলে তোমার অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে?

—খুব মন্দ হবে। কষ্টে সংসার চলবে, রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে। কিন্তু তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।

—আচ্ছা, তোমার বাবা এসব জানতেন?

—বোধ হয় না। তিনি নিজে জমিদারি দেখতেন না, নায়েবের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। নায়েব নতুন লোক, তারও কিছু জানবার কথা নয়।

—তোমার বউকে জানিয়েছ?

—না। জানলে কান্নাকাটি করবে, শ্বশুর মশাইকে বলে মহা হাঙ্গামা বাধাবে। আগে তোমার পাওনা শোধ করব তার পর জানাব।

—বাহবা! দেখ নীতীশ, ভাগ্যক্রমে আমি নিঃস্ব নই, রোজগার ভালই করি, বেশী বড়লোক হবার লোভও নেই। ফাঁকতালে তুমি যা পেয়ে গেছ তা তোমারই থাকুক, নিশ্চিন্ত হয়ে ভোগ কর। আমি খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে বলছি, ওই টাকার ওপর আমার কিছুমাত্র দাবি নেই। চাও তো একটা না-দাবি পত্র লিখে দিতে পারি। আরও শোন—সাড়ে সাত লাখ টাকা না পেলেও আমার পরিবারবর্গের স্বচ্ছন্দে চলবে, কিন্তু ওই টাকার অভাবে তোমার স্ত্রী ছেলে মেয়ের অবস্থা কি রকম হবে তা ভেবেছ? তুমি না হয় একজন প্রচণ্ড সাধুপুরুষ, সাক্ষাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্র, কিছুই গ্রাহ্য কর না, কিন্তু তোমার স্ত্রী আর সন্তানরা যে রকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে কষ্ট দেবে কেন? তোমার ঠাকুরদার কুকর্ম আমাকে জানিয়েছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট, তোমারও দায়িত্ব খণ্ডে গেছে। আর কিছু করবার দরকার নেই।

সজোরে মাথা নেড়ে নীতীশ বলল, ওই পাপের টাকা ভোগ করলে আমি মরে যাব। যা তোমার হক পাওনা তা নেবে না কেন?

একটু ভেবে হেমন্ত বলল, শোন নীতীশ, আজ তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছ, তোমার মাথার ঠিক নেই। কাল সন্ধ্যের সময় এখানে এসো, দুজনে পরামর্শ করে একটা মীমাংসা করা যাবে, যাতে তোমার মনে শান্তি আসে। তোমার ভগিনীপতি ফণীবাবুর সঙ্গেও আর একবার পরামর্শ ক'রো।

পরদিন সন্ধ্যায় নীতীশ আবার এল। হেমন্ত প্রশ্ন করল, ফণীবাবুকে তোমার মতলব জানিয়েছ?

—হুঁ। তিনি রফা করতে বললেন।

—রফা কি রকম?

—বিবেকের সঙ্গে রফা। বললেন, ওহে নীতীশ, তুমি আর হেমন্ত দুজনেই সমান বোকা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। টাকাটা আধাআধি ভাগ করে নাও, তা হলে দুজনেরই কনশেন্স ঠাণ্ডা হবে।

—হেমন্ত হেসে বলল, চমৎকার। তুমি কি বল নীতীশ?

—ড্যাম ননসেন্স। চুরির টাকা চোররা ভাগ করে নেয়, কিন্তু তুমি আর আমি চোর নই। পরের ধনের এক কড়াও আমি নিতে পারি না। তোমার যা হক পাওনা তা পুরোপুরি তোমাকে নিতে হবে।

—আমার হক পাওনা কি করে হল? জমিদারি পত্তন করেন তোমার-আমার প্রপিতামহ মহামহিম দোর্দণ্ডপ্রতাপ মদনমোহন পাল চৌধুরী। তিনি রামচন্দ্র বা বুদ্ধদেব ছিলেন না। সেকালে অনেক দুর্দান্ত লোক যেমন করে জমিদারি পত্তন করত তিনিও তেমনি করেছিলেন। ডাকাতি লাঠিবাজি জালিয়াতি জোচ্চুরি ঘুষ—এই ছিল তাঁর অস্ত্র। তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে?

—ওই রকম শুনেছি বটে।

—তা হলে বুঝতে পারছ, ওই জমিদারিতে কারও ধর্মসংগত অধিকার থাকতে পারে না। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আমার হাতছাড়া হয়েছে তা ভালই হয়েছে।

—কিন্তু আমার তো হাতছাড়া হয় নি, প্রপিতামহ আর পিতামহ দুজনেরই পাপের ধন সবটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। তুমি যদি নিতান্তই না নিতে চাও তবে মদনমোহন যাদের বঞ্চিত করেছিলেন তাদের উত্তরাধিকারীদের দিতে হবে।

—তাদের খুঁজে পাবে কোথায়, সে তো এক-শ সওয়া-শ বছর আগেকার ব্যাপার। তুমি সম্পত্তি দান করবে এই কথা রটে গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোচ্চোর এসে তোমাকে ছেঁকে ধরবে।

—তবে জনহিতার্থে টাকাটা দান করা যাক। কি বল?

—সে তো খুব ভাল কথা।

—দেখ হেমন্ত, ওই টাকাটা সদুদ্দেশ্যে খরচ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে, আমি এ কাজে পটু নই।

—রক্ষে কর। আমি নিজের ব্যবসা নিয়েই অস্থির, তোমার দানসত্রের বোঝা নেবার সময় নেই। আর একটা কথা। সদুদ্দেশ্যে দান, শুনতে বেশ, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? মন্দির মঠ সেবাশ্রম হাসপাতাল আতুরাশ্রম ইস্কুল-কলেজ, না আর কিছু?

—তা জানি না। তুমিই বল।

—আমিও জানি না। আমাদের সঙ্গে ফেলু মহান্তি পড়ত মনে আছে? তার শালা ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী

সম্প্রতি ইওরোপ আমেরিকা ফার-ঈস্ট টুর করে এসেছেন। শুনেছি তিনি মহাপণ্ডিত লোক, প্লেটো কৌটিল্য থেকে শুরু করে বেন্থাম মিল মার্ক্স লেনিন সবাইকে গুলে খেয়েছেন। চীন সরকার নাকি কনসল্টেশনের জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি যদি রাজী হও তবে ডক্টর প্রেমসিন্ধুর মত নেওয়া যাবে, তোমার টাকার সার্থক খরচ কিসে হবে তা তিনিই বাতলে দেবেন।

—বেশ তো। তাঁর সংগে চটপট এনগেজমেণ্ট করে ফেল।

পরদিন বিকালবেলা হেমন্ত আর নীতীশ প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারীর বাড়ি উপস্থিত হল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবুর সংকল্প খুবই ভাল, কিন্তু সাড়ে সাত লাখ টাকা কিছুই নয়, তাতে বিশেষ কিছু করা যাবে না।

হেমন্ত বলল, যতটুকু হতে পারে তারই ব্যবস্থা দিন।

একটু চিন্তা করে ডক্টর খাণ্ডারী বললেন, সর্বাধিক লোকের যাতে সর্বাধিক মঙ্গল হয় তাই দেখতে হবে, কিন্তু অযোগ্য লোকের জন্যে এক পয়সা খরচ করা চলবে না। সমাজের ক্ষণস্থায়ী উপকার করাও বৃথা, এমন কাজে টাকাটা লাগাতে হবে যাতে চিরস্থায়ী মঙ্গল হয়। আচ্ছা নীতীশবাবু, আপনার ইচ্ছেটা আগে শুনি, কি রকম সংকার্য আপনার পছন্দ?

একটু ইতস্তত করে নীতীশ বলল, আমার মা খুব ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁর নামে টাকাটা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর মঠে দিলে কেমন হয়? ধর্মের প্রচার হলে লোকচরিত্রের উন্নতি হবে, তাতে সমাজেরও মঙ্গল হবে।

প্রেমসিন্ধু হেসে বললেন, অত্যন্ত সেকেলে আইডিয়া। টাকাটা পেলে সাধু মহারাজদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে, তাঁরা লুচি মণ্ডা দই ক্ষীর খেয়ে পুষ্টিলাভ করবেন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল কিছুই হবে না। তা ছাড়া আপনার মায়ের নামে টাকা দিলে তো নিঃস্বার্থ দান হবে না, টাকার বদলে আপনি চাচ্ছেন মায়ের স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা।

লজ্জিত হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা, মায়ের নামে না-ই দিলাম। যদি কোনও ভাল সেবাশ্রমে—

—সব ভাল সেবাশ্রমেরই প্রচুর অর্থবল আছে। তেলা মাথায় তেল দিয়ে কি হবে? আর, আপনার সাড়ে সাত লাখ তো ছিটেফোঁটা মাত্র।

—যদি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্যে দেওয়া যায়?

—খেপেছেন! উদ্বাস্তুদের হাতে পোঁছুবার আগেই বাস্তুঘুঘুরা টাকাটা খেয়ে ফেলবে। কাগজে যে সব কেলেঙ্কারি ছাপা হয় তা পড়েন না?

—একটা কলেজ বা গোটাকতক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়?

—ভস্মে ঘি ঢাললে যা হয়। স্কুল কলেজে কি রকম শিক্ষা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন। আপনার টাকায় তার চাইতে ভাল কিছু হবে না, শুধু নতুন একদল হল্লাবাজ ধর্মঘটী ছোকরার সৃষ্টি হবে।

—তবে না হয় সরকারের হাতেই টাকাটা দেওয়া যাক। তাঁরাই কোনও লোকহিতকর কাজে খরচ করবেন।

অট্টহাস্য করে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবু, আপনি এখনও বালক। হয়তো মনে করেন সরকার হচ্ছেন একজন অগাধবুদ্ধি সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক পুরুষোত্তম। তা নয় মশাই, সরকার মানে পাঁচ ভূতের ব্যাপার। কোটি কোটি টাকা যেখানে খরচ হয় সেখানে আপনার সাড়ে সাত লাখ তো সমুদ্রে জলবিন্দুর মতন ভ্যানিশ করবে।

স্কেচ শিল্পীঃ শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

হেমন্ত বলল, আচ্ছা আমি একটা নিবেদন করি। শুনতে পাই ভগবান এখন মন্দির ত্যাগ করে ল্যাবরেটরিতে অধিষ্ঠান করছেন, সেখানেই তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু হয়েছেন। কৃষি আর খাদ্যের রিসার্চের জন্যে কোনও ইন্স্টিটিউটে টাকাটা দিলে কেমন হয়?

—হেমন্তবাবু, সে রকম ইন্স্টিটিউট দেশে অনেক আছে। বলতে পারেন, ঢাক পেটানো ছাড়া কোথাও কিছুমাত্র কাজ হয়েছে?

হতাশ হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা, টাকাটা যদি কোনও আতুরাশ্রমে দেওয়া যায়? অন্ধ বোবা-কালা পঙ্গু উন্মাদ অসাধ্য-রোগগ্রস্ত—এদের সেবার জন্যে?

ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। তার পর বললেন, শুনুন নীতীশবাবু, আপনার মতন নরম মন অনেকেরই আছে, কিন্তু তা একটা মহা ভ্রান্তির ফল। যদি শক্ড না হন তবে খোলসা করে বলি।

সুরেন বাড়ুজ্যে যেমন বলতেন, এ্যাজিটেশন এ্যাজিটেশন অ্যান্ড এ্যাজিটেশন

নীতীশ আর হেমন্ত একসঙ্গে বলল, না না, শক্ড হব না, খোলসা করেই বলুন।

—নীতীশবাবু যে সব আতুরজনের কথা বললেন, তাদের বাঁচিয়ে রাখলে সমাজের কি লাভ? ধরুন আপনি বেগুনে কি ঢ্যাঁড়সের খেত করেছেন। পোকাধরা অপুষ্ট গাছগুলোকেও কি বাঁচিয়ে রাখবেন? নিশ্চয়ই নয়, তাদের উপড়ে ফেলে দেবেন, নয়তো ভাল গাছগুলোর ক্ষতি হবে। পঙ্গু আতুর জনও সেই রকম, তারা সমাজের কোনও কাজে আসে না, শুধু গলগ্রহ। যদি স্বহস্তে উৎপাটন করতে না চান তবে অন্তত তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন না, চটপট মরতে দিন। দেখুন, আমাদের দেশে নানা রকম অভাব আছে, খাদ্য বস্ত্র আবাস বিদ্যা চিকিৎসা, আরও কত কি। সমাজের যারা যোগ্যতম, অর্থাৎ সুস্থ প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিমান কাজের লোক, শুধু তাদেরই যাতে মঙ্গল হয় সেই চেষ্টা করুন, যারা আতুর অক্ষম জড়বুদ্ধি আর স্থবির তাদের সেবার জন্যে টাকার অপব্যয় করবেন না। জানেন বোধ হয়, ২৫।৩০ বৎসর পরে ভারতের লোকসংখ্যা ৪০ কোটির স্থানে ৮০ কোটি হবে। এত লোক পুষবেন কি করে? যতই কৃষিবৃদ্ধি আর জন্ম-শাসনের চেষ্টা করুন, বিশেষ কিছু ফল হবে না, আশি কোটি অধিবাসীর ঠেলা কিছুতেই সামলাতে পারবেন না।

—আপনি কি করতে বলেন?

—আমি যা চাই তা শুনলে নেহেরুজীর মতন র্যাশনাল লোকও কানে আঙুল দেবেন। আমি বলি—লীভ ইট টু নেচার। কিছুকালের জন্যে সব হাসপাতাল বন্ধ রাখতে হবে, ডাক্তারদের ইনটার্ন করতে হবে, পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি আধুনিক ওষুধ নিষিদ্ধ করতে হবে, ডি ডি টি আর সারের কারখানা বন্ধ রাখতে হবে। কলেরা বসন্ত প্লেগ যক্ষ্মা দুর্ভিক্ষ বার্ধক্য ইত্যাদি হল প্রকৃতির সেফটি ভালভ, এদের অবাধে কাজ করতে দিন, তাতে অনেকটা ভূভার হরণ হবে। শায়েস্তা খাঁর আমলে দু আনায় এক মন চাল পাওয়া যেত। তার কারণ এ নয় যে তিনি ধানের চাষ বাড়িয়েছিলেন কিংবা কালোবাজারীদের শায়েস্তা করেছিলেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে লড়েন নি, ফ্রী হ্যান্ড দিয়েছিলেন। আর আমাদের এখনকার দয়াময় দেশনেতাদের দেখুন, বলেন কিনা প্রাণদণ্ড তুলে দাও! আমার মতে শুধু খুনী আসামী নয়, চোর ডাকাত জালিয়াত ঘুষখোর ভেজালওয়ালা কালোবাজারী দাঙ্গাবাজ ধর্ষক রাষ্ট্র-দ্রোহী—সবাইকে সরাসরি ফাঁসি দেওয়া উচিত। তাতে যতটুকু লোকক্ষয় হয় ততটুকুই লাভ। আতুরাশ্রম সেবাশ্রম হাসপাতাল আর হেল্থ সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করলে দেশের সর্বনাশ হবে। প্রকৃতিকে বাধা দেবেন না মশাই, কাজ করতে দিন।

তার পর দেশের বাড়তি জঞ্জাল যখন দূর হবে, লোকসংখ্যা যখন চল্লিশ কোটি থেকে নেমে দশ কোটিতে দাঁড়াবে, তখন জনহিত কর্মে কোমর বেঁধে লাগবেন।

হেমন্ত বলল, তা হলে নীতীশের টাকাটার কোনও সদ্‌গতি হবে না?

—কেন হবে না, অবশ্যই হবে। ওই টাকায় প্রোপাগান্ডা করে লোকমত তৈরি করতে হবে, সুরেন বাঁড়ুজ্যে যেমন বলতেন, এজিটেশন এজিটেশন অ্যান্ড এজিটেশন। আমার একটা থিসিস লেখা আছে, তার লক্ষ কপি ছাপিয়ে লোকসভা রাজ্যসভা আর বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে বিলি করতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাকে 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' বলেছেন তা ঝেড়ে না ফেললে নিস্তার নেই। দেশের ওআর্থলেস রুগ্ন অথর্ব অক্ষম লোকদের উচ্ছেদ করে শুধু বলবান বুদ্ধিমান কাজের লোকদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুনুন নীতীশবাবু হেমন্তবাবু, আগে আমাদের দেশনেতাদের নির্মম বজ্রাদপি কঠোর হওয়া দরকার, তার পর জমি তৈরী হলে মনের সাধে লোকহিত করবেন।

হাততালি দিয়ে হেমন্ত বলল, চমৎকার। গীতার 'শ্রীভগবানুবাচ' আর Nietzscheর Thus spake Zarathustraর চাইতে ঢের ভাল বলেছেন। বহু ধন্যবাদ ডক্টর খাণ্ডারী, আপনার বাণী আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখব। এই কুড়ি টাকা দয়া করে নিন, যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। আচ্ছা আজ উঠি, নমস্কার।

ফেরার পথে নীতীশ বলল, লোকটা উন্মাদ না পিশাচ? হেমন্ত বলল, তেত্রিশ নয়ে পইসে উন্মাদ, তেত্রিশ পিশাচ আর চৌত্রিশ জবরদস্ত জনহিতৈষী। মনুস্মৃতি, মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, সবই এখন সেকেলে হয়ে গেছে, তাই ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী নতুন বাণী প্রচার করে যুগাবতার হবার মতলবে আছেন। তবে এঁর প্রলাপবাক্যের মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটাও কিঞ্চিৎ আছে। শোন নীতীশ, তোমার দানসত্রের ভার পরের হাতে দিও না, তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না, কেবলই মনে হবে ব্যাটা চুরি করছে। নিজের খুশিতে দান কর, সেবাশ্রমে আতুরাশ্রমে হাসপাতালে স্কুল-কলেজে, যেখানে তোমার মন চায়। যদি ভুলক্রমে অপাত্রে কিছু দিয়ে ফেল, তাতেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কিন্তু ফতুর হয়ে দান ক'রো না। নিজের সংসারযাত্রার জন্যেও কিছু রেখো। তোমার স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে যদি কষ্টে পড়ে, তোমাকে যদি রোজগারের জন্যে ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে লোকসেবায় মন দিতে পারবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীতীশ বলল, বেশ, তাই হবে। কিন্তু টাকাটা তো আসলে তোমার, অতএব লোকসেবার ভার তুমিই নেবে, আমি তোমার সহকারী হব।

—আঃ, তোমার খুঁতখুঁতুনি এখনও গেল না দেখছি। বেশ, টাকাটা না হয় আমারই। কিন্তু আমার ফুরসত কম, দানসত্রের ভার তোমাকেই নিতে হবে, তবে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী আছি। জান তো, ভক্ত বৈষ্ণব তাঁর সর্ব কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। তুমিও নিষ্কামভাবে লোকহিতে লেগে যাও, কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের বদলে আমাকেই অর্পণ ক'রো। পিতৃপুরুষদের দেনা শোধ করে তুমি তৃপ্তিলাভ করবে, স্বহস্তে দান করে ধন্য হবে। আর, তোমার দানের পুণ্যফল আমি ভোগ করব। ফণীবাবুর ব্যবস্থার চাইতে এই রকম ভাগাভাগি ভাল নয় কি?
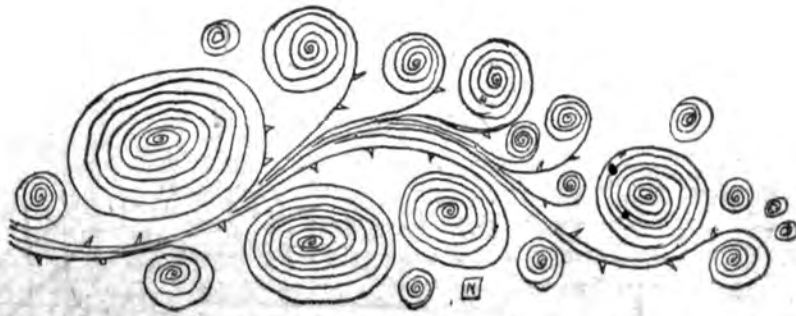
সীমা ও অনন্ত

ক্ষিতিমোহন সেন

মার মাঝে অসীম তুমি......
মরমীদের একটি সার সত্য সীমার মধ্যে থেকেও অসীমের জন্য ব্যাকুলতা। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথও তাঁর অপূর্ব গানে সেদিন জানিয়ে গেছেন।

ঘরের ঠিকানা হল না গো
প্রাণ করে তবু যাই যাই।

কথাটি নতুন নয়। প্রাচীন কথা নতুন গানে নতুন রূপ পেল।

পাঁচশ বছর আগে মরমী সাধক কবি রবিদাস, কবীর প্রভৃতি সন্তকবিরা গেয়ে গেছেন—

নাঁব্ না জানুঁ গাঁব্কা
প্রাণ কহৈ জাঁব্ জাঁব্

অর্থাৎ কোন্ গ্রামে কোথায় যেতে হবে সে খবর পাইনি। তবু প্রাণ সদাই বলছে যাই যাই।

আবার এরও হাজার বছর আগে এই তত্ত্বই উপনিষদের ঋষি জানিয়ে দিলেন দ্বা সুপর্ণা নামে অপূর্ব মন্ত্রে। সংহিতার ঋষি আরও প্রাচীনকালে তাঁর বৈদিকে মন্ত্রে গাইলেন—

কথং বা তো নেলয়াতি
কথং ন রমতে মনঃ।

অর্থাৎ কেন মানুষের মনে স্বস্তি নেই। কেন সে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বস্তি পায় না। অসীম আকাশে সে বায়ুর মত ভেসে যেতে চায়।

নানা দেশে নানা কালে একই রকমের সত্য আপনাকে প্রকাশ করেছে। প্রকাশ করেছে সুন্দর সুন্দর কবিতায়, গানে বা গল্পে বা কাহিনীর ভিতর দিয়ে। তাই সন্ত সাধকদিগের মধ্যে কাহিনীর এত আদর। একই কাহিনী নানা যুগে নানা দেশে আত্মপ্রকাশ করেছে।

*

এক দেশে একই গুরুর কাছে নানা রকমের ছাত্র পড়তে আসতেন। তাঁরা সবাই সুফী। একই বিদ্যালয়ে রাজার ছেলে ও চাষীর ছেলের পড়াশুনা তখনও অসম্ভব হয়নি।

দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করে অভীষ্ট বিদ্যা লাভ করে রাজপুত্র গেলেন রাজ-প্রাসাদে আর চাষীর ছেলে গেলেন গাঁয়ের কুটীরে। তখন আর তাঁদের দেখাশোনা হয় না। দুই সতীর্থ বন্ধু মাঝে মাঝে গুরু-গৃহের আনন্দে উচ্ছল পুরাতন দিনগুলি মনে করে খুশী হন।

বহুকাল পরে রাজপুত্রও গেছেন তীর্থ করতে এক মজারে (মুসলমান তীর্থে)। আর চাষীর ছেলেও ঘটনাক্রমে সেই দিনেই সেই মজারেই গেছেন তীর্থদর্শনে। দুই পুরাতন বন্ধুতে হঠাৎ দেখা। পুরানো কাহিনী স্মরণ করে দুজনেরই মহা আনন্দ। তারপর নানা কথাপ্রসঙ্গে নিজেদের ভরপুর করে তুলতে চাইলেন। বন্ধুত্ব যতই পুরাতন হক তবু বর্তমানে তাঁদের মধ্যে একজন সম্রাট আর-একজন কৃষক। এই ভেদবুদ্ধি-টুকু ত সম্পূর্ণ দূর হয়নি। তাই রাজ-পুত্র হঠাৎ তাঁর চাষীবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ভাই এখন কী কর? চাষীর ছেলে শান্তভাবে বললেন, আমার বাবা করতেন চাষ। বাবা মারা যেতে সেই ভার এল আমার উপরে। আমি এখন চাষ ও পশুপালন করে সংসার চালাই।

রাজপুত্র প্রশ্ন করলেন, তোমার বাবা ত ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর স্মৃতি তুমি কী রকম করে রক্ষা করছ?

কৃষক তখন সংকোচের সঙ্গে বললেন, আমি গরীব, মর্মরের দালান বা কোন স্মৃতিমন্দির তৈরি করবার শক্তি আমার কোথায়? রাজসিক কোন মক্বরা আমার কাছে কেউ আশাও করেন না। বাবার মাটির কবরের উপর আমি গোলাপ গাছ একটি লাগিয়েছি। গাছে ফুল ফোটে আর তার পাপড়ি নীচে চোখের জলের মত ঝরে পড়ে। এইটিই আমার গরীব বাপকে স্মরণ করবার একমাত্র উপায়। এইটুকুই আমার সাধ্যে কুলোয়।

রাজপুত্র তখন বলে বসলেন, হায় রে কপাল!

কৃষক বললেন, তোমার বাবা কি জীবিত আছেন?

রাজপুত্র জবাব দিলেন, তিনি বহুদিন হল গত হয়েছেন। তাঁর কর্মভার এখন আমারই উপর এসে পড়েছে।

কৃষকপুত্র জানতে চাইলেন, বললেন, তুমি তাঁর স্মৃতি কীভাবে রক্ষা করছ?

রাজপুত্র বললেন, আমার ত অর্থের অভাব নেই। ত্রিশ হাজার সঙ্গ্-তরাশ (পাথর-মিস্ত্রী) বিশ হাজার নিরন্তর কাজ করে তাঁর সমাধি-মন্দির এই সেদিন শেষ করেছে। বেশ একটু গর্বের ভাবেই গরীব বন্ধুকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন।

কৃষকপুত্র হাসতে হাসতে বললেন, তুমি তাঁর কী সর্বনাশ করেছ তা তিনি টের পাবেন কেয়ামতের (পরলোকের বিচারের) দিনে।

যখন আল্লা বিচারের জন্য ডাক দেবেন তখন আমার বাবা এবং তাঁর মত যত সব অকিঞ্চনের দল ডাক শুনেই মাটির কবর থেকে চট করে উঠে পড়বেন, আর আল্লার কাছে গিয়ে প্রণত হয়ে তাঁর বিচার গ্রহণ করবেন।

আর তোমার বাবা আল্লার সেই ডাক শুনে সেই পাষাণপুরীর মধ্যে বন্ধ হয়ে শত শত বছর ছট্‌ফট্ করতে থাকবেন। ত্রিশ হাজার পাথরকাটা মিস্ত্রী বিশ বছর ধরে নানা মালমসলা দিয়ে হাজার রকম যন্ত্র-পাতির সাহায্যে বজ্রকঠিন করে দিয়েছেন—সেটা তাঁকে ভাঙতে হবে একাই। কোন সহায় তাঁর নেই, কোন যন্ত্রপাতি নেই, শুধু নিজের নখ আর আঙুলের সাহায্যে ছাড়া। বল ত ভাই, কত যুগ চলে যাবে এই বজ্রবাঁধন থেকে আপনাকে মুক্ত করতে?

এই এই কথা শুনে রাজপুত্র একেবারে বসে পড়লেন। তাঁর সেই অভিমান কোথায় গেল উড়ে। নিঃসহায়ের মত বন্ধুর দিকে চেয়ে রইলেন।

*

এই রাজপুত্র-কৃষকবন্ধু কাহিনী বহু সুফী সন্ত সাধকদের মুখে শোনা গিয়েছে। নানা জনে নানা সময়ে এই একটি কাহিনী বার বার নতুন করে আমাদের শুনিয়ে গিয়েছেন। তার কারণ কী?

বিধাতার ডাক সমানভাবে সকলের কাছেই আসে। যাঁরা অকিঞ্চন তাঁরা ভারহীন হয়ে সত্যের সেই ডাক শুনেই সাড়া দিতে পারেন। আর যাঁরা ভারচাপা তাঁরা শুনতে পেয়েও সেই মুহূর্তেই সাড়া দিতে পারেন না। এইসব ভারই আমাদের সাধনার পথে মস্ত বাধা। কত রকমেরই এইসব ভারের রূপ। ধনের ভার, মানের ভার, কুলশীল সামাজিক মর্যাদার ভার, জ্ঞানের ভার। ভারের আর অন্ত নেই।

নদীর পলিপড়া মাটি যেমন স্তরের পর স্তরে গঠিত, ভারতের সাধনাভূমিও তেমনি

অনেক জানা ও অজানা নানা স্তরে স্তরে গঠিত।

ভারতে যুগে যুগে এসেছে দলের পর মানবের দল, আর আপন আপন সাধনা দিয়ে তারা গড়ে তুলেছে ভারতীয় সাধনার প্রবাল-দ্বীপের এক-একটি স্তর। প্রভেদের মধ্যে এই যে, স্তর রচনা করে প্রবালটি মরে যায়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের দল যুগের পর যুগ আপন আপন সাধনা নিয়ে এখানেই জীবিত রয়ে গিয়েছেন। বৈদিক আর্যেরা এখানে আসবার আগেই ভারতে দ্রাবীড় সাধনা ছিল। তারও আগে বিচিত্র বহু বহু দ্রাবীড়-পূর্ব নানা জাতীয় সাধনা। বৈদিক আর্যদের পরে অবৈদিক আর্য ও আর্যেতর নানা শ্রেণী এদেশে এসেছে—কেউ কাউকে বিনষ্ট করেনি।

ভারতে বেদপূর্ব বৈদিক আর্য অবৈদিক আর্য, নানা শ্রেণীর ও নানা মতের অনার্য, উচ্চ-নীচ ভাল-মন্দ নানা সভ্যতা চিরদিন পাশাপাশি বাস করে এসেছে। কাউকে নিঃশেষ হতে হয়নি। চিরদিন নানা-প্রকারের মতবাদ এইভাবে পাশাপাশি বাস করাতে ভারতের চিত্ত দিনে দিনে পরমত-সহিষ্ণু ও উদার হয়েছে।

বৈদিক আর্যদের ভারতে আগমনের আগে কত কত বড় বড় ধর্মমত যে এ দেশে প্রচারিত হয়ে এসেছে তা বলা কঠিন। সবই আজ স্তর-বদ্ধ হয়ে এক ভারতীয়-সাধনার ভূমি হয়ে গিয়েছে। বৈদিক আর্যদের পরেও অনেক অবৈদিক আর্যদল ভারতে এসেছে। আর্যেতর অনেক বড় বড় মতবাদও ভারত-বর্ষে এসেছে। তাদের সকলের সম্মিলিত ধর্মই আজ ভারতের ধর্ম; তাকে বৈদিক, অবৈদিক বা কোন দলবিশেষের নাম দেওয়া চলে না। বলতে গেলে বলতে হয় 'ভারতে'র অর্থাৎ 'হিন্দ'-এর ধর্ম অর্থাৎ 'হিন্দুধর্ম'। দলের নামে নামকরণ অসম্ভব বলেই দেশের নামে নামকরণ হয়েছে। এমনটি জগতে আর কোথাও হয়নি।

বেদের প্রধান কথা যজ্ঞ, কর্ম-কাণ্ড। তাদের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্র যজ্ঞভূমি; তাদের কাম্য স্বর্গসুখভোগ। জন্মান্তরবাদ, অহিংসা, যোগ, বৈরাগ্য, নির্বাণ, ভক্তিবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে দেব-দেবী-মূর্তি শিলা-লিঙ্গাদির পূজা, নদী-বৃক্ষ-তীর্থাদির মাহাত্ম্য প্রভৃতি বড় বড় সব মতবাদ ত বেদের প্রথম দিক দিয়ে দেখাই যায় না। ভারতের বাইরে অন্য দেশীয় আর্যদের মধ্যেও কি এইসব কোথাও দেখা যায়? তবে ভারতীয় আর্যদের মধ্যে এই ধর্ম, এই গুণ এল কোথা থেকে? এই সত্যই ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের ঐতিহাসিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইসব মতবাদের মধ্যে অনেকগুলি অবৈদিক তৈর্থিকদের। তৈর্থিকদের মত বেদবাহ্য। তীর্থে তীর্থে তৈর্থিকেরা একত্রিত হয়ে ধর্ম আলোচনা করতেন। যাক্ সে অন্য কথা।

ভারতের মধ্যযুগ, ভাষা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত রচনা। এদেশে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মে নানা ভক্ত ও মনীষীর জন্ম। তাঁদের মধ্যে কোন কোন লোক সাম্প্রদায়িক বিধি মানতেন, অনেকে আবার মানতেন না। সেই না-মানাদের দলে নামদেব, কবীর, রবিদাস, দাদূ প্রভৃতি বহু বহু মনীষী ছিলেন নিরক্ষর। নানক অক্ষর জানলেও পণ্ডিত ছিলেন না। এঁদের ভাবের গভীরতায় অবাক হতে হয়। পণ্ডিত বহু দেখা যায়, মনীষী দুর্লভ। আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে যে সব গভীর মর্মের কথা পাওয়া যায় তা পাণ্ডিত্যের মধ্যে মেলে না। এইসব মহাগুরুরা কেমন করে যে এত বড় বড় এবং মহান ভাব মানবের অন্তরে সঞ্চার করতে পেরেছেন তা দুর্বোধ্য। কাজেই দেখা যায় শাস্ত্র ছাড়াও গুরু চলে, কিন্তু গুরু ছাড়া শাস্ত্র ব্যর্থ। ব্যবহারের অতীত মাটির রসকে সরস করে তোলে বৃক্ষ, সত্যকে গ্রহণীয় করে তোলেন সদ্-গুরু।

এঁরা না থাকলে শাস্ত্র মানুষের থেকেও নেই। এঁরা যে পণ্ডিত নন তাই রক্ষে। মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই এঁদের সব লেন-দেন।

বিমাতৃভাষার কৃত্রিম সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কুবুদ্ধি তাঁদের ঘটেনি। কবীর বলেছেন, সংস্কৃত হল কূপজল, ভাষা হল বহতা ধারা। যখন চাও পড় এই ধারায় ঝাঁপিয়ে, শরীর জুড়বে।—

সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতা নীর।
জব চাহৌ তবহী কূদো শাংত হোয় শরীর॥

ব্যাকরণের অনেক খোন্তা-কোদাল ক্ষয় করলে কূপের মধ্যে জল পাওয়া যাবে। তার মধ্যে না আছে চলন্ত ধারার গতি, না আছে গীত।

*

গল্প দিয়ে কঠিন বিষয়কে সহজ করবার পদ্ধতিটি ভারতের। এই পদ্ধতি বিশেষ করে সুফীদের মধ্যে বেশী প্রচলিত।

সুফীদের ভাষা ও ভাবপ্রকাশের রীতি-গুলি আমাদের দেশের রীতিনীতির সঙ্গে এতটা মেলে যে তাকে অনেকে ভারতের নীতিই মনে করেছেন।

ভারতের আউল-বাউলদের এবং কবীর রবিদাস প্রভৃতি মরমীদের প্রকাশভঙ্গিটি প্রায় এই রকমেরই। কাজেই এই পদ্ধতি-গুলি আমাদের সকলেরই খুব আপন মনে হয়।

পরমহংসদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির উপদেশ ও বাণীগুলির মহত্ত্ব এইখানে।

এই সন্তপদ্ধতি ও বাউলিয়া রীতিতে পাণ্ডিত্যের তেমন প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন হয়েছে গণ-সাহিত্য অথবা লোক-সাহিত্যের।

কাজেই এখানে পণ্ডিত মূর্খদের কাছে শিক্ষা নিচ্ছেন। এইরূপ অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে।

আবদার রহিম খানখানা তাঁর ভৃত্যের কাছে কবিতা রচনার ছন্দ পেয়ে এমন খুশী হয়েছিলেন যে নূতন ছন্দে (বারোয়াঁ ছন্দে)-রামায়ণ রচনা করেন।

রহিম ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আরবী, ফার্সী, তুর্কী, এই তিন ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ—তেমনই ছিল হিন্দী ও সংস্কৃতে। রহিমের সংস্কৃত মালিনী ছন্দে লেখা কবিতা, স্তবমন্ত্রের মত ব্রাহ্মণেরাও প্রতি দোল পূর্ণিমাতে উচ্চারণ করে থাকেন।

সেই আটটি কবিতার নাম মদনাষ্টক।

কলিত ললিত মালা বা জবাহির জড়া থা।
চপল চখন বালা, চাঁদনী মেঁ খড়া থা॥
কটি তট বিচ মেলা, পীত মেলা নরেলা।
অলি বন আলবেলা যার সেরা অকেলা॥

রহিম আকবরের সভাসদ ছিলেন। একদিন সভায় কথা হয় যে, ভারতের পদ্ধতি এই যে তাঁদের দেবতারা সব তরুণ হবে।

তার মধ্যে ব্রহ্মা হলেন পিতামহ।

ব্রহ্মার পত্নী লক্ষ্মী, সরস্বতী। এর মধ্যে সরস্বতী হলেন বাক্‌বাদিনী মুখরা এবং লক্ষ্মী যাঁর চঞ্চলা অপবাদ চিরন্তন রয়েছে।

লক্ষ্মী যিনি তিনি কেন চঞ্চলা হবেন? বড় বড় পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়েও বুঝলেন না। মধুসূদন সরস্বতী তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পর্যন্ত এর কোনো কিনারা করতে পারলেন না। রহিমের উপর পড়ল এই অসঙ্গতিতে সঙ্গতি স্থাপনের ভার।

ব্রহ্মা হলেন পিতামহ, কাজেই বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর পত্নী যদি অল্পবয়সের হন তবে তাঁর চঞ্চলা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

পুরুষ পুরাতন কী বধূ
ক্যোঁ ন চঞ্চলা হোয়॥

রনো দিনের কলকাতা, প'চাত্তর-ছিয়াত্তর বছর আগে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, এইটাই শহরের প্রধান রাস্তা। ট্রাম চলেছে রাস্তা দিয়ে, ঘোড়ার টানা ট্রাম। ঘোড়ার মাথায় টুপি পরানো।

ফুটপাথের একধারটা অভিজাত, সেদিকে সারি সারি কৃষ্ণচূড়াফুলের গাছ, ফুটপাথের গা ঘেঁষে কোঠা বাড়ির সারি—একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ি খুবই কম।

অন্য ধারে খোলার-ছাউনি-দেওয়া ঘরের সারি, সেধারের ফুটপাথটা সরু আর কর্দমাক্ত।

আমার মনে পড়ছে, একটি মেয়ে কৃষ্ণচূড়া-গাছের পাতা নিয়ে আর হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে খেলা করছে তিরানব্বই নম্বর বাড়ির সম্মুখে। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি সেই ছোট্ট মেয়েটিই কি এই বৃদ্ধা?

তিরানব্বই নম্বর বাড়িটা দোতলা; সে বাড়ির একতলা, দোতলা, রোয়াক, দোতলার বারান্দা, দোতলার পিছনের দিকের খোলা ছাদ, সেই ছাদের ইঁটের-আড়াল-দেওয়া সেই খেলাঘর—এসব এখনও একেবারে ছবির মত মনের সামনে রয়েছে স্পষ্টভাবে।

বাড়ির দুটো দরজা ছিল, দুটোই রাস্তার দিকে। একটা বাড়ির ভিতরের দরজা অর্থাৎ অন্তঃপুরের। দরজা পার হয়ে রোয়াক, রোয়াকের পর চৌকো উঠোন, উঠোনে জলের কল, কলের কাছে বসে বাসনমাজার মানুষ বাসন মাজছে।

কলকাতায় তখন জলের কষ্ট ছিল না। রাস্তায় কল, আর প্রায় অনেক বাড়িতেই কল এসেছে, জলও খুব তোড়ে পড়ে। তা ছাড়া বাড়ি বাড়ি পাতকুয়া আছে, কুয়ার জল গলায় গলায়। দু হাত দড়ি দিয়েই জল তোলা যায়। পুকুরও আছে বিস্তর।

কিন্তু তবুও গঙ্গার জল আসে প্রত্যেক বাড়িতে বিধবাদের রান্না আর খাওয়ার জন্য। ঠাকুরবাড়িতে অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে বিশেষ এক তিথিতে (যে তিথিতে গঙ্গার জলে নুন থাকে না) সারা বৎসরের জন্য পানীয় জল জালায় জালায় ভর্তি ক'র রাখা হয়; জালার মুখে গঙ্গামাটি ও মাটির সরা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে রাখা হয়, সে জলে পোকা হয় না। যে ঘরে সেই সব জলের জালা থাকে, তার নাম জলের ঘর।

৯৩ নম্বরের বাড়িটা ভাড়াটে বাড়ি, ভাড়া ছিল কুড়ি টাকা। বাড়ির মালিক কালাচাঁদ চক্রবর্তী মশায়ের প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। এই বাড়ির ঠিক পিছনেই, একটা সরু গলি দিয়ে সে-বাড়িতে যাওয়া যায়।

গলির অন্য পাশে পালিতদের একতলা পুরান বাড়ি, আর তার গায়ে গায়ে আরও অনেক বাড়ি। সবগুলিই কোঠা বাড়ি আর সবগুলিই পুরনো বাড়ি। দেখে মনে হয় সেই সব বাড়ির যাঁরা মালিক তাঁদের অবস্থা এখন খারাপ হয়ে গিয়েছে।

একটা দোতলা বাড়ির রাস্তার দিকের রোয়াকে রোজ সকালে একটি বছর-দুই বয়সের ছেলেকে একটা গেলাস হাতে করে বসে থাকতে দেখতাম।

আমার ভয় হ'ত, ছেলেটি একা বসে আছে, যদি রোয়াক থেকে রাস্তায় পড়ে যায়। রাস্তায় ত ট্রাম যাওয়া-আসা করছে, যদি ট্রামের নীচে গিয়ে পড়ে। কী হবে তা হলে!

কিন্তু ছেলেটি এমন শান্ত, গেলাসটি হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকত, একটুও নড়াচড়া করত না।

রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালারা হাঁক দিয়ে যেত। সকালবেলায় দুধওয়ালা গয়লারাও যেত। তারা হাঁক দিত না। তাদের কাঁধের দুধের-কলসী-শুদ্ধ বাঁক দেখেই লোকে বুঝতে পারত এরা দুধ বিক্রি করে।

দুধারে দুটো কলসী, পিতলের ঘড়া। একটার গায়ে খোদাই করা আছে "জল-মিশ্রিত দুগ্ধ, টাকায় আট সের।" আর-একটায় খোদাই করা আছে, "নির্জলা দুগ্ধ, টাকায় ছয় সের।" এরা বাড়ি বাড়ি দুধের জোগান দিত। মার মুখে শুনেছি, টাকায় আট সের লেখা থাকলেও যাদের বাড়ি ওরা বারো মাস দুধ দেয় তারা দশ সের দরেই দুধ নিত।

আমাদের দুধ দিত বিনোদের মা। রাস্তার ওপারের একটা ঘরে সে আর তার ছেলে থাকে। তার একটা দিশী গরু আছে, তারই দুধ বিক্রি করে কায়ক্লেশে দিন কাটায়। মা বলতেন, ভদ্রঘরের মেয়ে, দত্তবাড়ির বউ। বিধবা হবার পর ভাসুররা সব ঠকিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন ছেলেটি নিয়ে এইভাবে দিন গুজরান করে। ছেলেটিকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।"

রোয়াকে-বসা সেই ছেলেটি। সেই দিকেই আমার মন পড়ে থাকে। নড়ি চড়ি, আর একবার এসে দেখি ছেলেটি ঠিক আছে না পড়েই গিয়েছে!

একদিন দেখলুম, বাঁক কাঁধে এক গোয়ালা এসে দাঁড়াল তার কাছে। বললে, "কী সোনা, গেলাস নিয়ে বইসেই আছ, মুখ-খান যে কালি হয়ে গিয়েছে। দাও গেলাসে তোমার দুধ দিয়ে যাই।" বলে খোকার হাতের সেই আধসেরী গেলাসটা নিয়ে নির্জলা দুধের কলসী থেকে তাতে দুধ ভর্তি করে দিলে।

তারপর জানলার দিকে চেয়ে বললে, "মা ঠান্, সোনারে তুলে ন্যান, কাগে বগে আইসে দুধের গেলাসে মুখ দিতি পারে।" যশোর জেলার মিষ্টি মিষ্টি কথা।

দেখলাম এক থানকাপড়-পরা মেয়ে বেরিয়ে এলেন তখনই ঘর থেকে, খোকাকে কোলে নিয়ে আর দুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

কেন যে খোকা গেলাস হাতে সকাল থেকে বসে থাকে এখন তা বুঝতে পারলাম।

মা বললেন "গয়লা ওকে বিনা দামেই দুধ দেয়। বলে—ঠাকুর দ্যাবতারেই পুজো দিতি হয়, এ আমার গোপালের পুজো।"

চক্রবর্তী বাড়ির কথা

চক্রবর্তী-বাড়ির তিন মেয়ে, তারা প্রায়ই মার কাছে আসে। বড় ক্ষেত্রমণি, মেজো নৃত্যকালী ছোট মেনকা। সকলের শেষে, এক ছেলে, ছেলের নাম বিপিন, বছর আট-দশ বয়স, ভারি দুরন্ত, দুর্দান্তও বলা চলে।

মেয়েরা সধবা, পাড়াগাঁয়ে তাদের শ্বশুর-বাড়ি। একজনের সোনারপুর, আর দুজনের রাজপুর আর চাংড়িপোতা। মেয়েরা সুপুরি কাটে, পশমের কম্ফটার আর ছোট ছোট টুপি আর মোজা বোনে। দোকানের লোক এসে পশম আর সুপারি দিয়ে যায় ওজন করে, আবার ওজন করেই নিয়ে যায়।

গলাবন্ধ যত হাত লম্বা হবে হাত-পিছু এক আনা মজুরি। আর ছোট ছেলেদের টুপির মজুরি দু আনা, এক জোড়া মোজাও দু আনা।

মেয়েরা মার কাছে নিজেদের দুঃখের

কথা যখন বলে, মা বলেন "তুই এখানে বসে বসে কী শুনছিস? যা, ও-ঘরে যা।" কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে নড়িনে, বুঝি বা না-বুঝি তাদের কাহিনী শুনি মন প্রাণ দিয়ে।

মা বলেন, "শীতের মধ্যে লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়েই বোনো কী করে? কাঠি থেকে ঘর পড়ে যায় না?"

"না কাকিমা, ও আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। দিনে ত সময় নেই, রান্নাবান্না থেকে মসলা-পেষা, রান্নাঘর ধোয়া পর্যন্ত সব। বাবা বড় পিট্‌পিটে মানুষ, ঝিকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেন না। আর কেনই বা দেবেন? আমরা যখন তিন-তিনটে ঝি আর রাঁধুনী আছি। মা যখন ছিলেন এত কষ্ট ছিল না, জামাইরাও তখন আসত শাশুড়ীর আদর খেতে।"

মা বললেন, "তোমাদের ত মেয়ের বিয়েতে পণ নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয় শুনেছি। তোমার বাবা কি জামাইদের কাছে পণ নেননি?"

"তা যদি নিতেন সে ত ভালই হত। বললেন যে, সদ্‌ব্রাহ্মণ যারা তারা কন্যা দান করে, তারা পাঁঠাপাঁঠির মত মেয়ে বেচে না। এই নিয়ে বাবার কী গুমর? বলেন, আমার মেয়ে যাবে চাংড়িপোতার ভশ্চাযিদের গোয়াল কাড়তে? আমি ত মেয়ে বেচিনি, পঞ্চ হত্তুকি দিয়ে সালঙ্কারা কন্যা দান করেছি। সালঙ্কারা! দেখুন কী গয়না আমাদের? সরু সরু দুগাছা রুলি, আর গলার এই সুতোর মত হার। এ বেচলে আর কত হবে, আঠারো টাকা সোনার ভরি, দু ভরিও হবে না। ভাগ্যে আমাদের সব বোনের ছেলে হয়নি, আর হবেই বা কোথা থেকে? মা যাওয়ার পর থেকে জামাইরা কি এ-বাড়িতে মাথা গলাতে পায়? তা হলে কি রক্ষা রাখেন? বলেন, মেয়ে পুষছি বারোমাস, আবার জামাই এসে পাত্‌ড়া মারবে? এরপর এণ্ডিগেণ্ডিতে ঘর ভরে গেলে তার হ্যাপা নেবে কে? এণ্ডিগেণ্ডি? ওই ত নেত্যকালীর ওই শিবরাত্তিরের সলুতে, একপো দুধ বরাদ্দ, তাও হজম হয় না। না আছে চিকিচ্ছে, না আছে পথ্যি। এদিকে ত খরচখরচার অন্ত নেই। বারো মাস চলছে কথকতা, রামায়ণ গেল ত মহাভারত। ঠাকুর সেবা, দোল আছে, রথ আছে, আবার রাস আছে, এই সব উচ্ছবে বামুন বোষ্টম খাওয়ানো আছে। এই যে গাদি গাদি মেয়ে পুরুষ কথা শুনতে আসে তাদের পান দেও জল দেও এসব করি ত আমরাই, আর কে আছে? কাকিমা, দুঃখের কথা বলব কী, ছেলেটার গায়ে একটা জামা আছে কিনা সে খোঁজও নেন না, তারপর আছে বিপিনের উৎপাত। হাতে হাতে চুনটুকু নুনটুকু পর্যন্ত না জোগালে ছেলের কি মুখের তোড়। বলে কি না, দুবেলা যে গিলছ তা আসছে কোথা থেকে সে খেয়াল নেই?" বলতে- বলতে ক্ষেত্রমণি কেঁদে ফেলল।

তারপর বলল, "মা ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের দোর ধরেছিলেন, আমি জন্মালুম, তাই ক্ষেত্রমণি নাম হল। এখন ভাবি কেন মার এ দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, কেন শ্যামনগরে গেলেন ক্ষেত্রপালের ওষুধ নিতে। আমিই সকলের বড়, আমারই হয়েছে জ্বালা। ছেলেটা কি বাঁচবে? দেখছেন তো ওর দশা।"

আমাদের বাড়িতে আসতেন ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথির গোঁড়া ভক্ত।

ডাক্তার ভাদুড়ী প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন, চার টাকা মাত্র ভিজিট, তাও নিতেন না সব বারে। মাঝে মাঝে জামাই প্রতাপ মজুমদারকেও সঙ্গে আনতেন। আমাকে "বুড়ী মা, বুড়ী মা" বলে ডাকতেন। কী সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর, চোখ দুটি সব সময় ঢুলু ঢুলু, রোগীরা বলত সাক্ষাৎ মহাদেব। আবার অনেকের কাছে শুনেছি, মরফিয়া খান বলে চোখ সব সময় ঢুল ঢুল করে। কিন্তু অদ্ভুত চিকিৎসা ছিল তাঁর। ছেলেটি হাঁটতে পারত না, পিছনের দিকটা শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। তার মাসী যদি কোলে তুলতে আসত, বলতেন, খবরদার কোলে নেবে না, যত পারে দৌড়াদৌড়ি করুক। রোজ স্নান করাবে, গায়ে জামা পরাবে না। পেট ভরে ভাত মাছের ঝোল খাবে, পেটের অসুখের ভয়ে খাওয়া বন্ধ করবে না। আর রাত্রে কড়কড়ে সুজির রুটি, সুজি সিদ্ধ করে তারপর পাতলা করে বেলে রুটি সেঁকবে, কড়কড়ে হবার জন্য উনুনের গায়ে রেখে দেবে।"

ছেলের মা-মাসী পথ্যের ভার দিয়ে দিয়েছিল মার হাতে, মা ছাড়া তেমন রুটি কেউ করতে পারত না। ছেলেটি তাই প্রায় সব সময় মার রান্নাঘরের দুয়ারেই বসে থাকত। মাছের ঝোল আর ভাত মা-ই করে দিতেন। মাসী যদি কোন দিন রেঁধে দিত ছেলের তা পছন্দ হত না। তাই তার মাসী হাসতে হাসতে বলত, "ভারী যে দিদিমা সোহাগী হয়েছ, এতদিন কার হাতে খেয়েছিলে?"

পালিত-বাড়ি

পালিতদের একতলা বাড়ি। দুই ভাই, কিন্তু ভিন্ন হয়েছেন তাঁরা। বড় ভাই কোন্ সাহেবের অফিসে মোটা মাইনেয় চাকরি করেন। একটিমাত্র মেয়ে, তার নাম গোলাপী। গেল-বৎসর মেয়ের বিয়ে হয়েছে। খুব ঘটা করে পুজোর সময় তত্ত্ব করেছেন মেয়ের বাবা। তারাও আবার তত্ত্ব করেছে। সেই তত্ত্বের মিষ্টি আমাদের বাড়িতে দিয়ে গেল।

মেজবাবুর অবস্থা ভাল নয়। মাইনে কম, আবার প্রায়ই অসুখে পড়েন, সে সময় মাইনে পান না। তাই মেজগিন্নির গায়ের সব গয়নাই একে একে বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

গোলাপীর বয়স বেশি নয়, কিন্তু এর মধ্যেই যেন গিন্নী হয়ে গিয়েছে। একদিন আমার মাকে বলছিল, "জানেন কাকিমা, চক্রবর্তীদের বাড়িতে আগে একজন চাকর ছিল, সে রাত্রে কর্তার পা টিপত। ছোঁড়া চাকর, বাড়িতে মেয়ের পাল, তাই তাকে ছাড়িয়ে দিলেন।" মা শুনে বললেন, "তুমি এতটুকু মেয়ে, এসব কথা কেন? ছি, ওরকম কথা আর কক্ষনো বলবে না।" শুনে বোধ-হয় তার রাগ হল, তখনই বাড়ি চলে গেল। কিন্তু তার পরদিন আবার এল, সেদিন এসে বললে, "জানেন কাকিমা, ছোট্‌কার ঘরে আজ হাঁড়ি চড়েনি। চড়বে কী, ওই ত আয়—তারপর বারোমাস আপিস কামাই, তার পর এণ্ডিগেণ্ডি, আজ এর অসুখ, কাল ওর অসুখ। তা বাপু, যার যেমন অবস্থা তার তেমন ব্যবস্থা, অত আধিক্যেতা কেন, ডাক্তাররে, বদ্যিরে। ওই করে করেই ত সব্বস্ব খোয়ালে কাকিমা, তা নয়ত এমন হাল হল কেন? গায়ে ছিল একগা গয়না, সেই গয়নার কি একখানাও আছে? মা কত বুঝিয়েছে, ছোট্‌কি এমন ন্যাকার মত গায়ের গয়না খুলে দিসনি। গয়না হল মেয়েদের স্ত্রীধন, সে গয়না কি এমন করে খোয়াতে আছে? সোয়ামীর অসুখে গায়ের গয়না খুলে বাঁধা দিয়ে চিকিচ্ছে করলি, পতিভক্তি ত খুব দেখালি, কিন্তু সোয়ামী যদি নাই বাঁচে, তখন দাঁড়াবি কোথায়? কেন, বিনে চিকিচ্ছেয় কি রোগ সারে না, আর চিকিচ্ছে হলেই কি মানুষ বাঁচে। মহারানী তবে বিধবা হল কেন? রাজ-রাজড়ার বাড়ি তবে লোক মরে কেন? আমারও কি পতিভক্তি নেই? তোর ভাসুরের অসুখের সময় তা বলে কি গায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছি? বলে 'আত্ম রেখে ধম্ম।' তা কাকিমা ওই এক-ধরনের মানুষ, হিত কথা ওর মনে ধরে না।"

মা বললেন, "তোমার মা কি আজ তোমার কাকিমাকে চাল দিলেন?"

"কী বলেন? মা চাল দেবেন? কোথায় এত চাল পাবেন তিনি? বলে 'নিত্যি নেই দেয় কে, নিত্যি রোগ দেখে কে?' ওদের ত নিত্যিই নেই-নেই।"

মা শুনে আর-কিছু বলেননি। একটা ন্যাকড়ায় কিছু চাল ডাল ও গোটা কতক

ঝালু বেঁধে আমার হাতে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন "চুপি চুপি এটা ওদের রান্নাঘরে রেখে আয়। চাল যে রেখে এলি, পূর্ণশশীকে সে কথা বলে আসিস।"

পূর্ণশশী বড় মেয়ে, গোলাপীর চেয়ে এক বছরের ছোট। বিয়ের খোঁজ খবর চলছে। রঙটা ময়লা, তারপর টাকার সংস্থান নেই। পূর্ণশশীর জ্যাঠাইমা তাই নিয়ে মাঝে মাঝে বলেন, "আমার যদি অমন কেলে মেয়ে হত, আঁতুড় ঘরেই নুন গেলাতাম। একে মৌলিকের ঘর, তায় কেলে-পেতনী, ও মেয়ে গছবে কে?"

বেচারা পূর্ণশশী গঞ্জনা শুনে ঘাড় হেঁট করে থাকে। একটিও কথা বলে না। মেয়েটি বড় শান্ত।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন। মা লক্ষ্মীর পা এঁকেছেন সিঁড়িতে আর প্রত্যেক ঘরের দুয়ারে। এখন রান্নাঘরে গিয়ে পিঠে ভাজতে বসেছেন।

মা যশোর জেলার মেয়ে। অনেক রকম পিঠে জানেন। তবে এবার বাবা অনেক দিন অসুখে ভুগেছেন, কোর্টে যেতে পারেন নি। তাই নিয়মরক্ষা মত পিঠে করবেন এই কথা বলেছিলেন।

কিন্তু দেখলাম বিনোদের মা পাঁচসেরা ঘটির এক ঘটি দুধ দিয়ে গেল। আমি ভাবলাম এত দুধ নিয়ে মা কী করবেন, করবেনই বা কখন?

বাবার যখন অসুখ হয় [illegible] তখন নিতেন সমস্ত ভার, বাবার চিকিৎসার ভার পর্যন্ত। বাগবাজারে বাপের বাড়ি, ভাইদের কাছে কোন সাহায্যই চান না। এ সব ব্যাপারে মার নিজের সম্মানজ্ঞান ছিল খুব বেশী।

সংসার বেশ চলছে। চাকরের মাইনে, দাদার স্কুলের মাইনে, আর আমার টিচার মিস্ বিশ্বাসের মাইনে সবই মা ঠিকমত দিয়ে যাচ্ছেন। কোথা থেকে যে করেন মা-ই তা জানেন।

দেখি কী পূর্ণশশী কাঁচুমাচু মুখে ছোট ভাইটির হাত ধরে রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোদের ঘরে পিঠে হচ্ছে না!" পূর্ণশশীর মুখ কালি হয়ে গেল। সে উত্তর দিল না।

এমন সময় পূর্ণশশীর মা একতলার ছাদ থেকে ডাকলেন, "পূর্ণশশী! পূর্ণশশী!"

পূর্ণশশী বলল, "বাড়ি যাই কাকিমা। মা এ-বাড়ি আসতে বারণ করেছিল, কিন্তু খোকা কিছুতেই ছাড়লে না, তাই—"

"এ-বাড়ি আসতে বারণ করেছিলেন? কেন?" পূর্ণশশী থতমত খেয়ে গেলঃ "না, না, বারণ করেননি, জ্যাঠাইমা যখন পিঠে ভাজেন তখন তাঁর রান্নাঘরের কাছে গেলে তিনি ভারি রাগ করেন। বলেন, 'দিষ্টি দিতে এসেছ!' মা তাই বললেন, "ওবাড়ি বোধ হয় এখন পিঠে ভাজা হচ্ছে, এখন আর ওবাড়ি যেন যাসনে। কিন্তু খোকাটা বড় পিঠের গন্ধ ভালবাসে। বলে যে, দিদি, আমি ত কেবল নাক দিয়ে পিঠের গন্ধ শুঁকছি, পিঠে খেতে ত চাচ্ছি না। আয় খোকা, আমরা বাড়ি যাই, মা ডাকছে।" বলে ভাইয়ের হাত ধরে চলে যেতে উদ্যত হল।

মা বললেন, "দাঁড়াও একটু।" একটা কাঁসিতে সব রকম পিঠে সাজিয়ে পূর্ণশশীর হাতে দিলেন, পায়েসও দিলেন একবাটি।

"কাকিমা, মা বকবে।" বলে পূর্ণশশী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"না, না, বকবেন কেন, এরা খাবে আর তোমরা খাবে না? নিয়ে যাও, মা কিছু বলবেন না।"

তিনকড়ি পালের ফাঁসি

সে সময়ের একটা বিশেষ ঘটনা তিনকড়ি পালের ফাঁসি। কী আন্দোলন সে সময়!

এক পয়সা দামের বই বেরুল—
"হায় মরি কী দুঃখরাশি,
তিনকড়ি পালের ফাঁসি।"

মার মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আর হেসে কথা বলেন না। ব্রহ্মযুদ্ধের খবর যখন খবরের কাগজে বার হচ্ছিল তখনও মার মুখ এমনি গম্ভীর দেখেছিলাম।

মিস বিশ্বাস সপ্তাহে দুদিন করে আসতেন, পনেরো মিনিট বাইবেল পড়াবেন আর এক ঘণ্টার বাকী সময় ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক ও সেলাই করাবেন তাঁর এই নিয়ম ছিল।

আমাদের মানুষ করা ঝি দিদে; মিস্ বিশ্বাসকে সে চিনত, মাকে বলেছিল "হাজারী বিশ্বেসের মেয়ে ওই বসন্ত, ও ত পুকুরে গুগলি তুলতে যেত রোজ। ও আবার ম্যাম হয়েছে।"

মা বলতেন, "চুপ, চুপ, গিরির মা, ওসব কথা বল না, মিস বিশ্বাস শুনলে দুঃখ পাবে।"

দিদে বলত "তা, খীষ্টান হয়ে অত মিথ্যে কথা বলে কেন? সেদিনের কথা মনে আছে, তোমাকে বললে, আমরা তিন পুরুষে খীষ্টান। বললে, আগে যে কী জাত ছিলাম তা জানি না। জেনে শুনে এমন কথা বলে কী করে? হাসখালিতে ওদের বাড়ি, ওরা ত মোছলমান, সেবার আকালের সময় পাদরীরা নিয়ে ওদের সবাইকে খীষ্টান করলে, কেবল ওর ঠাকুরমা বুড়িই খীষ্টান হয়নি। ও তখন ছোট ছিল, তবে এমন ছোটও নয় যে কোন কথাই ওর মনে নেই।"

আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম, মিস্ বিশ্বাস ত লোক খারাপ নন; গম্ভীর স্বভাব, যীশুখৃীষ্টে দৃঢ় বিশ্বাস, তবে মিথ্যাকথা বললেন কেন? মুসলমান ছিলেন এ বলতে দোষ কী ছিল? উনি কি মুসলমানদের হীন বলে মনে করেন, তাই আগে মুসলমান ছিলেন এ-কথাটা স্বীকার করতে বাধল ও'র।

মিস বিশ্বাস আমাকে ভালবাসতেন, সুখ্যাতিও করতেন, মার কাছে বলতেন "ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে।"

ধর্ম নিয়ে মাঝে মাঝে ও'র সঙ্গে তর্ক হত। আমি বলতাম, "খৃীষ্টান ধর্মের অনন্ত নরকের কথা শুনলে আর ওরকম ধর্মে আস্থা থাকে না।"

"কিন্তু যীশুকে যে বিশ্বাস করবে তার ত সব পাপই ক্ষমা হবে। অনন্ত নরকের ভয় তার নেই।"

"আর যদি যীশুকে ভাল লোক বলে মনে করে, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস না করে?"

তিনি বলতেন, "কিন্তু তিনি ত সত্যই ঈশ্বরের পুত্র।"

আমি বলতাম, "আমরাও তো ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকর্তা, তবে সকলেই ত তাঁর ছেলে।"

মিস্ বিশ্বাস বলতেন "সে আলাদা কথা। কিন্তু যীশু ছিলেন তাঁর একজাত পুত্র।"

মা বলতেন "থাক, তর্ক করে সময় নষ্ট করিসনে।" কিন্তু মাও তর্ক করতেন মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে। মা বলতেন, "ইংরেজরা অত্যাচারী পররাজ্যলোলুপ, কত দেশের যে তারা সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই।"

আর মিস বিশ্বাস বলতেন, "ইংরেজ মহৎ জাতি, আর বীরের জাতি। সকল সময়েই সকল দেশেই তারা অত্যাচারীর হাত থেকে নির্যাতিতকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়েছে। এই আপনাদের দেশেই দেখুন না, আগেকার দিনে রাজারা প্রজার উপর কি কম অত্যাচার করত? ব্রিটিশ শাসনে সবই এক, রাজা প্রজার কোন তফাত নেই। মেয়েদের উপরই কি কম অত্যাচার হত সেকালে? ইংরেজ এসে 'সতীদাহ' বন্ধ করলে, তাই মেয়েদের এখন আর বিধবা হলে পুড়ে মরবার ভয় নেই।"

যেদিন এই সব তর্ক আরম্ভ হত, সেদিন মিস বিশ্বাস এক ঘণ্টার চেয়েও বেশী সময় থেকে যেতেন, বলতেন, "পড়ানোর সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

ব্রহ্মের যুদ্ধের করুণ কাহিনী যখন কাগজে বের হচ্ছিল— থীবের রাজচ্যুতিতে প্রজারা কী ভাবে মর্মাহত আর দুর্দশা-

গ্রস্ত হয়েছে, সোনার শিকল পরা শ্বেত-হস্তী না খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছে, রানীরা কী রকম লাঞ্ছিত হয়েছেন, মিস বিশ্বাসের কাছে সেই কাগজটা এগিয়ে দিয়ে মা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি বলতে চান একটা স্বাধীন দেশের উপর এইভাবে পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়া সেও কি ইংরাজের মহত্ত্ব?"

মিস বিশ্বাস বলতেন, "থীব ছিল দারুণ অত্যাচারী, তার অত্যাচারের হাত থেকে ব্রহ্মবাসীকে বাঁচাতেই ইংরেজ এগিয়ে গিয়েছিল, এ কথা ত সকলেই জানে. আপনিও কি জানেন না? জানেন কি, এই উদ্ধারকার্যে ইংরাজের কত অর্থব্যয় আর কত সৈন্যক্ষয় হয়েছে?"

মা বলেছিলেন "সবই জানি। যুদ্ধে দেশী সৈনাই মরেছে—নিজেরই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়ে. গোরা সৈন্য ক'জন মরেছে? আর অর্থ-ক্ষয়ের কথা বলছেন? সে কথা না-তোলাই ভাল। ব্রহ্মদেশ লুট করে কত ধন ইংরেজের পকেটে গিয়েছে তার কোন হিসেবই নেই। রাজার শ্বেতহস্তী, পায়ে তার সোনার জিঞ্জির, তার জন্য প্রতিদিন সুগন্ধি চালের পায়েস সোনার বালতিতে করে তার মুখের কাছে ধরা হত। হাতির পিলখানা ছিল ব্রহ্মবাসীর দেবমন্দির। কত উপহার আসত প্রতিদিন তার জন্য। সেই হাতির খোরাক বন্ধ করে টেনে নিয়ে গেল ইংরেজ অন্য একটা জায়গায়। বিলাত পাঠানোর তোড়জোড় হতে হতে হাতি মরে গেল। এ সবই ত খবরের কাগজেরই সংবাদ।"

মিস বিশ্বাস একটু হাসলেন, তাচ্ছিল্যের হাসি। বললেন, "এ যে দেখছি হস্তী-পুজা!"

সে দিন আর বিতর্ক হয়নি, মিস বিশ্বাস চলে গিয়েছিলেন।

মার সঙ্গে মিস বিশ্বাসের এইভাবে মত-বিরোধ ও বিতর্ক হত। কিন্তু সে তর্ক কখনও সীমা লঙ্ঘন করত না। আমি বুঝতে পারতাম. মিস বিশ্বাস যত তর্কই করুন. মনে মনে তিনি মাকে শ্রদ্ধা করেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের পরই বোধ হয় তিনকড়ি পালের ফাঁসির সংবাদে দেশে আবার হুলস্থুল পড়ে গেল।

তিনকড়ি পাল নবীন পালের ছেলে। তার বাবা হোমিওপ্যাথী ডাক্তারি করেন, শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। তিনকড়ি স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র, বয়স আঠারোর বেশী নয়।

এই বয়স নিয়েই খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই দৃঢ়ভাবে বলেছিল তার বয়স ষোল বৎসরের বেশী নয়৷ এত ছোট ছেলের ফাঁসি হতেই পারে না।

কুসুম নামে একটি মেয়েকে তিনকড়ি খুন করেছিল, মেয়েটি ছিল পতিতা।

আমি অল্প বয়সেই অনেক কিছু বুঝতাম, কিন্তু 'পতিতা' বলতে যে কী বোঝায় তা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

তবে যে সব খবর বেরিয়েছিল তার থেকে এটুকু বুঝলাম তিনকড়ি প্রায়ই স্কুল পালিয়ে ওই মেয়েটির বাড়ি যেত. মেয়েটিকে সে ভালবাসত।

আমার অনেক কথাই তখন মনে হয়েছিল। ভালই যদি বাসত তবে তাকে খুন করলে কেন? খুন করলে বিকেলবেলায়, মেয়েটি তার চেয়ে বয়সে বড়, তবে কী করে সে খুন করলে তাকে?

এক পয়সার বইতে পড়েও কিছু বুঝলাম না, কেবল এইটুকু বুঝলাম তিনকড়ি মেয়েটির উপর খুব রেগে গিয়ে তাকে "পাপিয়সী, বিশ্বাসঘাতিনী" বলে গালাগাল দিয়ে "এই তোর উচিত দণ্ড" বলে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল।

মেয়েটা ত পালিয়ে যেতেও পারত, কেন পালাল না সে? এই রকম কত কথাই যে মনে হয়েছিল আমার।

কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্কুলের মাস্টাররা একবাক্যে বলেছেন. তিনকড়ি শিষ্ট শান্ত ছেলে তার পক্ষে এ খুন সম্ভব নয়।

খুনের ঘরেই তিনকড়ি ধরা পড়েছিল, আর তখন সে মরফিয়া খেয়েছিল। এই দুটোই তার বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ।

কিন্তু প্রমাণের কোন দরকারই ছিল না. কোর্টে তিনকড়ি স্বীকার করলে, "আমিই খুন করেছি।" সুতরাং বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। মনে হল, সমস্ত দেশের লোকের বুকে যেন বজ্রাঘাত হল।

দেশের বড় বড় লোকের স্বাক্ষরে ছোট-লাটের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন গেল। কিন্তু সে-আবেদন মঞ্জুর হল না, তিনকড়ির ফাঁসির দিন ঠিক হয়ে গেল।

যেদিন তার ফাঁসির কথা, সেদিন মা খবরের কাগজ পড়লেন না, রান্নাঘরেও গেলেন না, আমাদের দুই ভাইবোনকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বাবার জন্য কেরাসিন স্টোভে মাগুর মাছ—চাল আর ডাল একসঙ্গে চড়িয়ে দিলেন, এ রান্নার নাম নাকি ফিস-রাইস। বাবার অসুখ তখনও ছিল।

বিকেলবেলা আমরা ফিরে এসে দেখলাম, মা তখনও একফোঁটা জলও মুখে দেন নি, সতীশদাদা এসেছেন আমাদের বাসায়। (ভাড়া বাড়িকে বাসা বলা হত।)

সতীশ দাদা আমার পিসিমার ছেলে, পিসিমা বিধবা হয়েছেন এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি আমার জ্যাঠামশায়ের কাছে থাকতেন।

সতীশদাদা তিনকড়ির ফাঁসির সময় উপস্থিত ছিলেন। জেলখানার উঠোনে সেদিন দারুণ লোকের ভিড় হয়েছিল। তিনকড়ির স্কুলের ছেলেরা সবাই প্রায় ছিল, তা ছাড়া আরও অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। তাই গভর্নমেণ্ট কড়া পুলিস পাহারা রেখেছিলেন।

সতীশদাদা বলছিলেন. "মামীমা, তিন-কড়ির সে কী মূর্তি, যেন সে মস্ত এক বীর, যুদ্ধে যাচ্ছে, কি বিয়ের বর বিয়ে করতেই যাচ্ছে! হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, 'বিদায় আমার জন্মভূমি, বিদায় আমার ভাইয়েরা।' আর সকলেই কাঁদছে, এক-জনেরও চোখ শুকনো ছিল না।

"তিনকড়ি বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'আমার প্রাণের বন্ধুরা, আমার দেশবাসী সমস্ত ভাইয়েরা, শেষ বিদায়ের সময় তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ কেউ যেন অসৎপথে যেও না। অসৎ-পথে যাওয়ার কী পরিণাম তা ত চোখের সমুখেই দেখছ। এই জ্যান্ত মানুষটাকে এখনি গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়তে হবে ওই গর্তের মধ্যে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে জিভ বেরিয়ে পড়বে, কী দারুণ মৃত্যু! এই মৃত্যু হল পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দেশের ছেলেরা যদি দেশের সুসন্তান না হয়, তবে তার পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্তই বিধান। ভাল থেক ভাই সব, দেশের সুসন্তান হয়ে চরিত্রবান হয়ে দেশের গৌরব বাড়িও, বিদায়ের কালে আমার এই অনুরোধ।'

সতীশদাদা বলতে লাগলেন, "লোকেদের তখন সে কী অবস্থা! কেউ কেউ ডুকরে কেঁদে উঠল। তার পর সব শেষ, ফাঁসি হয়ে গেল, যে যার বাড়ি ফিরল কাঁদতে কাঁদতে। ও কী মাসিমা, আপনার মুখটা যে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, মনে হচ্ছে যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তা আপনার এইরকম অবস্থা ত হবেই, জল্লাদ শুদ্ধু কেঁদে ফেলেছিল সেই সময়।"

এই সময় মিস্ বিশ্বাস এলেন। আমি তাঁকে দেখেই কেঁদে ফেললাম। তাঁকে বললাম, "মা এখনও জল পর্যন্ত খাননি, আপনি যদি একটু জল খাওয়াতে পারেন।"

তিনকড়ি পালের ফাঁসির কথা মিস বিশ্বাস হয়ত শোনেনইনি, অথবা শুনেও সেটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি।

দিদেকে ডেকে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আসতে বললেন, দিদে জল না এনে এক গ্লাস সরবত আনল, মা সমস্ত গ্লাসটাই খালি করলেন এক নিশ্বাসে, পাছে মনের উত্তেজনা একটুও প্রকাশ পায় সেজন্য সংযত হয়ে স্বাভাবিকভাবে বারান্দার রেলিংএ হেলান দিয়ে বসলেন।

মিস বিশ্বাস বললেন, "যান যান, এখনি গিয়ে খেয়ে আসুন। একটা খুনে ফাঁসি গিয়েছে তার জন্য আপনি উপোস করবেন?

ছি-ছি, এ কী দুর্বলতা! খুন করলে যে ফাঁসি হবে সে ত জানা কথাই। ষোল বছরের ছেলে! কিসের ষোল বছর, সতেরো-আঠারো বয়স হবেই। আর যদি ষোলই হয়, ক্ষুদে সাপকে ক্ষুদে বলে কি বাঁচিয়ে রাখা উচিত? জানেন, কতবড় শয়তান ও-ছেলেটা, একবার নাকি নিজের বাপকেই খুন করতে গিয়েছিল! আগাছা, সমাজের কলঙ্ক। ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিচারে কখনও অবিচার হয় না।"

মা উঠে পড়লেন, রান্নাঘরের দিকেই গেলেন। কিন্তু আমি জানতাম রান্নাঘরে সে-দিন খাওয়ার মত কিছুই ছিল না।

মিস বিশ্বাসের কথাই আমি ভাবছিলুম, একটা ছেলে ফাঁসিতে ঝুলে মরল তাতে তাঁর কোনও কষ্টই হল না? এতটা নিষ্ঠুর মানুষ কেমন করে হয়?

মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ-কথা। মা বললেন, "গোঁড়ামিই মানুষকে নিষ্ঠুর করে। মিস বিশ্বাস যে ইংরেজের গোঁড়া ভক্ত।"

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তোমারও কি গোঁড়ামি আছে?"

মা হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, "তা আছে বইকি কিছু। না হলে ইংরেজের নামেই রাগ আসে কেন? ইংরেজের মধ্যে কি ভাল লোক নেই? এই যে হেয়ার সাহেব, বেথুন সাহেব এরাঁও ত ইংরেজ।"

মা আরও বললেন,—"ইংরেজ এদেশ পরাধীন করেছে, কিন্তু পরাধীন হল কেন এত বড় দেশের কোটি কোটি লোক, জন-কতক বিদেশ-থেকে আসা মানুষের কাছে? তাদের অস্ত্র ছিল, এদেরও কি অস্ত্র ছিল না? ছিল সবই কেবল ছিল না নিজের দেশের উপর সত্যকার ভালবাসা।"

মিস বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের নিন্দা করতেন, বলতেন, "ঈশ্বর হলেন মাছ, ঈশ্বর হলেন শুয়োর—এ আবার একটা ধর্ম নাকি?"

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলত। মাকে গিয়ে একদিন বললাম, "মিস বিশ্বাসের নিজের দেশের উপর এত রাগ কেন? আর বিদেশীর উপরই এত ভালবাসা কেন?"

মা বললেন, "কেন হবে না? বিদেশী ত ওঁ'র কোন অনিষ্ট করেনি। দেশের লোক খৃষ্টান বলে ঘেন্না করেছে, আর বিদেশীই দিয়েছে আশ্রয় আর সম্মান। সেদিন গিরির মার কাছে শুনলি ত ছেলেবেলায় কী কষ্টে দিন গিয়েছে মিস বিশ্বাসের, তাই তিনি সেদিনের সম্পর্কই ছেড়ে দিতে চান। নিজের আগের জাতও তাই স্বীকার করেন না। বিদেশীর কাছে শিক্ষা পেয়ে হয়েছেন কর্তব্যপরায়ণ আর নিয়মানুবর্তী। দেখিস না, যেদিন আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তোকে পড়ানোর সময় কমে যায়, সে-দিন সে-সময়টি পুরিয়ে দিয়ে তবে যান। ও'দের মাপা সময়, তাই তার এদিক ওদিক হয় না।"

ছেলেবেলার কথায় মার প্রসঙ্গ এসে পড়ল, তাই এই লেখাটা কতকটা পারি-বারিকই হয়ে গেল, এটা মোটেই আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে সেকালের দিনের জীবনযাপনের ছাপ এতে আছে, তাই লিখলাম।

বেলা যে গেল

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি বিশ্বাস করিনে

ননসেন্স

গাঁজাখুরি

জোচ্চোর কোথাকার

ইনক্রেডিবল

“বেলা যে গেল” শুনে লালাবাবু কী করেছিলেন মনে আছে? সেই দণ্ডেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একবস্ত্রে। যেন ও-পাড়ায় যাচ্ছেন। তাঁর সন্ধান মিলল শেষে বৃন্দাবনে। সেখান থেকে তিনি আর দেশে ফিরলেন না। তাঁর সংসারের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল।

তুচ্ছ একটি কথা। যে বলেছিল সে কি তাই ভেবে বলেছিল? না বোধ হয়। তবু তার ফল হলো সুদূরপ্রসারী। জমিদার লালাবাবু হলেন পরম বৈরাগী। এমনটি সচরাচর ঘটে না। তবে একেবারেই ঘটে না যে কেমন করে বলি?

বর্ধমান স্টেশনে ডাউন বম্বে মেল দাঁড়িয়ে। শরৎকালের সকাল। স্নানের ঘর থেকে সাহেবী পোশাক পরে ফিটফাট হয়ে নিজের বার্থে এসে ঠেস দিয়ে বসলেন আর্য-কুমার নন্দী। কাগজওয়ালা তাজা কাগজ হাতে হাঁক দিয়ে যাচ্ছিল। কিনলেন একখানা। আগে থেকে বলা ছিল, ছোটো হাজরি দিয়ে গেল খানসামা। খেতে খেতে পড়তে, পড়তে ভদ্রলোকের আর কোন দিকে হোঁশ ছিল না, সেই অবস্থায় তাঁর একটা পা টেনে নিয়ে কাঠের বাক্সর উপর রেখে রঙ মাখাতে লাগল এক মুচির ছেলে। অনাহূত।

এমন সময় এক পাঞ্জাবী শিখ গণৎকার জানালার বাইরে থেকে হিন্দীতে বলল, “বাবুজী, দেখি আপনার হাত।” আর্য-কুমার ওসবে বিশ্বাস করতেন না। তিনি উদ্যোগী পুরুষসিংহ। পুরুষকারের দ্বারা লক্ষ্মী লাভ করেছেন। অন্য দিন হলে ভাগিয়ে দিতেন। কিন্তু পড়তে পড়তে খেতে খেতে তিনি অসতর্ক ছিলেন, আনমনে বাড়িয়ে দিলেন একখানা হাত। গণৎকার বলল, “এ হাত নয়, বাবুজী। ও হাত।” তখন ডান হাতখানা রুমাল দিয়ে মুছে বাড়াতে হলো।

ট্রেন তখন ছাড়ি-ছাড়ি করছে। মুচির ছেলে বকশিস চায়। খানসামাও সেলাম ঠুকছে। গণৎকার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, “বাবুজী, জলদি করুন। সময় বেশী নেই।”

মানে কী? মানে তো এই যে এক্ষুনি ট্রেন চলতে শুরু করে দেবে। যাকে যা দেবার তাকে তা যদি এক্ষুনি না দেন, তো কখন দেবেন? তবু আর্যকুমারের মনে খটকা বাধল। তিনি সেই গেরুয়া-আলখাল্লাপরা পাগড়িবাঁধা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ়কে শুধালেন, “আর কত সময় আছে?”

গণৎকার এর উত্তরে বলল, “বেলা যে গেল।”

আর্যবাবু লালাবাবুর গল্প জানতেন না। তবু তাঁরও মনে হলো, এর কী যেন একটা গূঢ় অর্থ আছে। প্রকাশ্য অর্থটা কিছু নয়। তিনি সেই গণৎকারকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করার পূর্বেই গাড়ি ছেড়ে দিল। নন্দী একখানা নোট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। গণৎকার কিন্তু কুড়িয়ে নিল না।

স্টক এক্সচেঞ্জের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করে ভদ্রলোক অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, “যত সব বুজরুক। টাকা কুড়িয়ে নিয়ে করত কী? গাঁজা খেত।”

হয়তো লোকটা আশা করেছিল এক টাকার বেশী। অনেক বেশী। তাই নোট-খানা ছুঁলো না। ছোঁবে ঠিকই। যথালাভ। হকের পাওনা তো নয়। ঠকিয়ে যা পাওয়া

যায়। নন্দী অমন কত দেখেছেন। তা হলেও তাঁর মনটা বিরস হয়ে রইল। তাঁর মতো বড়লোকের সঙ্গে এমন অসভ্যতা করবে এহেন আস্পর্ধা তিনি এর আগে প্রত্যক্ষ করেননি। ঐটুকু উক্তির জন্যে একটা টাকা কি বড় কম হলো। না ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ-করা কুপে দেখে তার পাওনা অমনি বেড়ে গেল?

ঘোড়দৌড় আর খেলাধুলোর পৃষ্ঠায় যখন তাঁর নজর, তখন তাঁর মন থেকে লোকটার চেহারা প্রায় মুছে গেছে। শত শত লোকের সঙ্গে তাঁর নিত্য কারবার। একটি-মাত্র মুখ তিনি কতক্ষণ মনে রাখবেন? ধরো, পাঁচ মিনিট। কিন্তু তাঁর কানে তখনো বাজছিল, বাবুজী জলদি করুন। সময় বেশী নেই। বেলা যে গেল।

কী এর প্রকৃত অর্থ? ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে। কী দেবেন দিন। সকাল-বেলাটা তো কেটে গেল। তেমন কিছু রোজগার হলো না আজ। আপনি বড়লোক। বউনি করুন। কেমন? এই তো এর মানে? এছাড়া আর কী হতে পারে?

আর্যকুমার কাগজখানা সরিয়ে রাখলেন। বিজ্ঞাপনগুলো পড়াও দরকার। কিন্তু এখন নয়। ভাবতে লাগলেন, কী হতে পারে গণৎ-কারের উক্তির তাৎপর্য। লোকটা কি হাত দেখেই বুঝে ফেলল যে, আর বেশী দিন পরমায়ু নেই? যা করবার করে নিন চটপট। আরো কয়েক লাখ টাকা। আরো কয়েকটা কোম্পানি পরিচালনা।

না, না, বয়স এমন কিছু হয়নি। বাহান্ন বছর বয়সে কেউ ভবের হাটে দোকানপাট গুটোনোর কথা ভাবে না। আরো আট বছর পরে না হয় রিটায়ার করা যাবে। কিন্তু ভবধাম থেকে নয়, তার আরো দেরি। ধরো, সত্তর বছর। এত টাকা আছে যখন তখন আয়ুই বা কিনতে পারবেন না কেন? আজকাল ডাক্তারির যা উন্নতি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষেরই জীবনের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। তিনি তো অপেক্ষাকৃত অসাধারণ। ইচ্ছা করলে পশ্চিমে গিয়ে বাস করতে পারেন। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। কিছু না হোক দার্জিলিং তো হাতের কাছেই। সেখানে বসতি করলে হয়।

কিন্তু হাওড়ায় পৌঁছবার আগে তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল এই ব্যাখ্যা যে, বিদায়টা শুধু কর্মক্ষেত্র থেকে নয়, মর্ত্যলোক থেকেই। এবং তার জন্যে সময়মতো আয়োজন না করলে হঠাৎ একদিন করোনারি থ্রম্বোসিস বা সেই জাতীয় কোন পরওয়ানা এসে হাজির হবে। ব্যাখ্যা বদ্ধমূল হলো বলে উক্তি বিশ্বাসযোগ্য হলো তা নয়। মানুষের মৃত্যু তো চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ নয় যে, কেউ গণনা করে বলতে পারে কবে ঘটবে। বিজ্ঞানীরা যা পারে না, তুমি ভিক্ষাজীবী গণৎকার—তুমি শুধু একবার হাত দেখেই তা পারলে আর আমিও তেমনি আহাম্মক যে বিশ্বাস করে একটা টাকা দক্ষিণা দিলুম।

"আমি বিশ্বাস করিনে।" কথাটা তিনি আপন মনেই উচ্চারণ করলেন একটু ঝোঁক দিয়ে। ট্রেন ততক্ষণে হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে গেছে। উর্দিপরা ড্রাইভার এসে সেলাম ঠুকছে। বাড়ির গাড়ি প্ল্যাটফর্মের ধারেই মোতায়েন। কুলীরা মাল নামাচ্ছে।

"আমি বিশ্বাস করিনে। বিশ্বাস করতে পারিনে।" আবার তিনি উচ্চারণ করলেন হাওড়ার পোলের উপর দিয়ে যাবার সময় গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। আমিহীন কলকাতায় আমিহীন গঙ্গা এমনি করে বইতে থাকবে, তা মানি। কিন্তু এত শিগগির নয়। এ কখনো হতেই পারে না যে, এক বছর পরে আমি-হীন মোটর আমিহীন পোলের উপর দিয়ে এমনি করে ছুটতে থাকবে। ইতিমধ্যেই সওয়ারি নামিয়ে দিয়ে থাকবে।

"ননসেন্স।" তিনি বলে উঠলেন স্ট্রাণ্ড রোডে পদার্পণ করে। বলা উচিত চক্রার্পণ। তারপর যখন ময়দান কেটে তাঁর মোটর হু হু করে এগোচ্ছে পার্ক স্ট্রীট অভিমুখে, তখন তিনি ড্রাইভার বেচারাকে হকচকিয়ে দিলেন হঠাৎ "ব্যাটা গাঁজা খেয়ে এসেছিল" বলে। চৌরঙ্গীর মোড়ে যখন লাল সঙ্কেত দেখে মোটর থামল, তখন তিনি তার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁর ভবন। গাড়ি থেকে নেমেই আবার বলে উঠলেন, "আমি বিশ্বাস করিনে।" অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই ভবনে তাঁর মেয়াদ আর ছ' মাস কি এক বছর। গৃহিণীকে তাঁর প্রথম সম্ভাষণ হলো, "গাঁজাখুরি।" অর্থাৎ তিনি যা শুনে এসেছেন সেটা গাঁজা-খুরি।

"কী হয়েছে? ব্যাপার কী? চিন্তিত স্বরে বললেন তাঁর সহধর্মিণী মনীষা।

'আর্যকুমার লজ্জায় বলতে পারলেন না, এক গণৎকার বর্ধমানে কী তাঁকে শুনিয়েছে আর তা শোনা অবধি তিনি অন্য চিন্তা ত্যাগ করেছেন। কিছুতেই ঘাড় থেকে ও ভূত নামছে না। লোকটা কি সম্মোহন জানে? জোচ্চোর কোথাকার!

"কিছুই হয়নি। মাথায় ঘুরছিল একটা কথা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।" এই বলে তিনি তখনকার মতো স্ত্রীকে বুঝ দিলেন।

কিন্তু রাত্রে ক্লাব থেকে তাস খেলে ফেরার পরও তাঁর মুখ ছিটকে বেরিয়ে গেল, "ইনক্রেডিবল।" অর্থাৎ তাঁর প্রয়াণ আসন্ন এটা অবিশ্বাস্য।

মনীষার মনে খটকা বাধল। তাস খেলায় হেরে যাওয়া এমন কী অবিশ্বাস্য ঘটনা। তিনি জানতে চাইলেন, "কেন ও কথা বললে? তোমার অবশ্য হাত ভালো ছিল।"

আর্যকুমার যেন একটা অবলম্বন পেয়ে গেলেন। "হাত ভালো ছিল বলেই তো বলছি অবিশ্বাস্য। এত ভালো হাত আমার। হাত দেখে অন্যরকম ধারণা হতেই পারে না।"

এমনি করে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ধোঁকা দিলেন। ভাবলেন, কী দরকার বেচারিকে উদ্বিগ্ন করে তোলা। মেয়েরা যেমন সরল-বিশ্বাসী, যে কোনো হতচ্ছাড়া গণৎকারের যে-কোনো অমূলক উক্তিকেই ওরা বেদবাক্য মনে করবে। মনীষা যদিও শিক্ষিতা মহিলা তবু তিনিও এসব ক্ষেত্রে সরলা অবলা। একবার এক সাপুড়ে তাঁকে একটা শিকড় গছিয়ে দিয়ে দশ টাকা নিয়ে চলে গেল। ওটা নাকি সাপের বিষের ওষুধ। ভাগনেটি বি এস-সি পাশ। সেও বোকার মতো আরো দশ টাকা দিল। তা হলে কিন্তু প্রমাণ হয় যে, ছেলেদেরও মাথায় হাত বুলোনো ঠিক তেমনি সহজ।

আর্যবাবুর দুই কন্যা। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এখন ঝাড়া হাত পা। বিশেষ কোনো সাংসারিক চাপ নেই। স্ত্রীর জন্যে যথেষ্ট অন্ন-সংস্থান আছে। তা ছাড়া মনীষা কেবল নামেই মনীষা নন। ইচ্ছা করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। সুতরাং নিছক সাংসারিক বিচারে আর্যকুমারের অকালপ্রয়াণ একটা সমস্যাই নয়।

তবু দেখা গেল তিনি সত্যি বিচলিত হয়েছেন। কাউকে বুঝতে দিলেন না কেন। নিজেকেও ভোলালেন। তাঁর যেখানে যতকিছু অ্যাসেট্স্ ছিল, তার একটা তালিকা তৈরি করতে বসলেন গোপনে। যেখানে যতকিছু লায়াবেলিটিস্ ছিল, তারও আরেক তালিকা। দিনের পর দিন তিনি এই নিয়ে মগ্ন রইলেন। তাঁর কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক সুনির্মলকে বললেন, "দেখ হে, নিজের সঙ্গে নিজের একটা হিসাবনিকাশ হয়ে থাকা ভালো। এসব তো আমি পরের জন্যে করছিনে। বাদসাদ দিয়ো না।"

নিজের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যখন তাঁর যথার্থ জ্ঞান জন্মাল, তখন তিনি মনে বেশ শান্তি পেলেন। সকলের সব পাওনা চুকিয়ে দিয়ে মোটের মাথায় তাঁর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তার থেকে দুই মেয়েকে দশ লাখ ও স্ত্রীকে দশ লাখ দেওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তারা রাখতে জানলে হয়। কে জানে, কে কখন তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে সেই সাপুড়ের মতো দশ আর দশ মিলে বিশ লাখ টাকার হাতসাফাই দেখাবে। তাই তিনি তিনজনের নামে তিনটে বাড়ি তৈরি করে দেবেন স্থির করলেন। সেই নিয়ে চলল স্থপতিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ। জমির সন্ধান। মালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা। অ্যাটর্নির বাড়ি আনাগোনা। কর্পোরেশনে

তাম্বর। ঠিকাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত।

তিনখানার দুখানা হবে ম্যানসন। বিভিন্ন পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হবে বহুসংখ্যক ফ্ল্যাট। একখানা হবে বিল্ডিংস্। এক বা একাধিক সওদাগরি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া হবে দীর্ঘ মেয়াদে। এত বড় কাণ্ড-কারখানা, কেউ ঘুণাক্ষরে টের পাবে না, তা কি হয়! কনিষ্ঠ জামাতা গৌতম বলল কনিষ্ঠা কন্যা দূর্বাকে। দূর্বা বলল তার জননীকে।

মনীষা বরাবর স্বামীর বিশ্বাসভাজন। এ যদি সত্য হতো স্বামী নিশ্চয় তাঁকে জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিতেন। তিনি বললেন, "বাজে কথা। আমাদের তেমন কোনো প্ল্যান নেই। বিজনেস থেকে টাকা উঠিয়ে নিয়ে জমিতে পোঁতা মূর্খতা। গবর্নমেণ্ট যেদিন খুশি নোটিশ দিয়ে অ্যাকোয়ার করবে।"

দূর্বা বলল, "কিন্তু কয়লার খনিও তো ওরা ন্যাশনালাইজ করতে পারে।"

মনীষা বললেন, "সে সাহস ওদের হবে মা। তা হলে সাহেবদের কলিয়ারিও ন্যাশনালাইজ করতে হয়। হুঁ হুঁ। অত বড় বুকের পাটা আছে কার!"

কিন্তু একদিন একখানা দলিল দেখে মনীষা নিজেই ধরে ফেললেন, নন্দী সাহেবের ফন্দী। দলিলখানা তাঁর নামে হবে। তাঁকে সই করতে হবে।

তিনি রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "এসব হচ্ছে কী? ও কেন?"

আর্যকুমার মুখ কাঁচুমাচু করে উত্তর দিলেন, "তোমারই স্বার্থে। আমার নয়।"

"তুমি তো জানো, বেনামী আমি পছন্দ করিনে। যা করবে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে করবে। লোকসান হয় হবে। চোরের মতো করতে যেও না। বাজারে তোমার সুনাম আছে, তুমি সৎ ব্যবসাদার। ঐ যে ক্রেডিট ওই তোমার সিকুইরিটি।"

আর্যকুমার কেমন করে ভেঙে বলেন যে, দলিলটা বেনামী নয়। তিনি হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যেতে পারেন বলেই আগে থেকে সব আটঘাট বেঁধে রাখছেন, যাতে লেশমাত্র গোলমাল না হয়। নইলে কে জানে কে কখন মামলা বাধিয়ে বসবে। মেয়ে-মানুষ লড়তে পারবেন কেন? লড়তে গেলেও তো স্বর্ণলঙ্কা উজাড় হয়।

তিনি আমতা আমতা করে বললেন, "আমাকে বিশ্বাস কর, আমি অসাধু কাজ করতে যাচ্ছিনে, তোমাকেও অসাধুতায় জড়াচ্ছিনে। মানুষের জীবন, কোনদিন আছে, কোনদিন নেই। পঞ্চাশের পর সব মানুষেরই কর্তব্য—হেঁহেঁ সব পুরুষেরই কর্তব্য—যাদের জন্যে ধন সঞ্চয় তাদেরই উপর তার ভার অর্পণ।"

"বাজে বকছ।" মনীষা রাগ করলেন এতদিন ধরে তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে এসব করা হচ্ছে বলে। লুকিয়ে লুকিয়ে করা কি সাধুতার পরিচায়ক?

ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করে এই দশা হয়েছে হিন্দুর ছেলের। উঠতে বসতে লেকচার আর বকুনি। শুধু কি তাই? কতবার যে ভদ্রমহিলা ছেড়ে চলে যাবার ভয় দেখিয়েছেন তার সংখ্যা নেই। ফলে আর্যসন্তানকে সত্যি সাধু হতে হয়েছে। নইলে তাঁর ক্রোড়পতি হওয়া ঠেকাত কে? সেই সঙ্গে উপসর্গগুলিও এসে জুটত। মনীষা সেদিকেও পথ রোধ করে রয়েছেন। পার্টিতে বল, ক্লাবে বল, নাইট ক্লাবে বল, যেখানেই ইনি সেখানেই উনি। একদণ্ড চক্ষের আড়াল করবেন না। ছায়ার মতো অনুগতা হবেন। হতভাগ্য স্বামী!

আর্যকুমার একবার ভাবলেন, বর্ধমানের গল্পটা শুনিয়েই দেবেন। তার পর সে ভাবনা বাতিল করলেন। কেননা তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মনীষা বলবেন, ওসব বুজরুকি বিশ্বাস কর কেন? বিশ্বাস না করলে তো এসব করার প্রশ্ন ওঠে না।

আর্যবাবুও কি বিশ্বাস করতেন? না, তিনি যুক্তিবাদী সাহেবীভাবাপন্ন বিলেত-ফের্তা বিজনেসম্যান। কে একটা পেশাদার গণৎকার কী বলেছে শুনে তিনি বিশ্বাস করবেন? অথচ তাঁর কাজে ধরা পড়ছিল যে তিনি বিশ্বাস করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তর্কে তিনি ভঙ্গ দিলেন। খুলে বললেন না, কেন তিনি অমন কাজ করতে গেলেন।

কাজ কিন্তু বন্ধ রইল না। অ্যাটর্নির পরামর্শ নিয়ে দলিলও হলো। তার থেকে মনীষার নাম বাদ গেল। অগত্যা কন্যাদেরও নাম। খবরটা কনিষ্ঠা কন্যাই বয়ে নিয়ে এলো মার কাছে। মনীষা এবার বিশ্বাস করলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না। বিভিন্ন সূত্রে অনুসন্ধান করে জানতে পেলেন যে, খবরটা খাঁটি। তখন বাক্যালাপই করলেন না।

ঝড় ওঠার আগে অন্তরীক্ষ শান্ত হয়ে যায়। একটি পাতাও নড়ে না। একটি পাখিও ডাকে না। বেশ শীতল লাগে গরমের দিন। আর তার পরে? তার পরেই তাণ্ডব। মাথার উপর ডাল ভেঙে পড়ে, ঘর ভেঙে পড়ে। ভাঙনের আওয়াজকে, প্রাণীদের চিৎকারকে ছাপিয়ে ওঠে ঝড়ের গর্জন।

আর্যকুমার অভিজ্ঞ স্বামী। তাঁর হাড়ে হাড়ে বরফের ছোঁয়া লাগল। আসন্ন মরণের চেয়েও তাঁকে ভাবিয়ে তুলল আসন্ন সাইক্লোন। কী করবেন, কী করতে পারেন তিনি? খুলে বলবেন স্ত্রীকে বর্ধমানের ব্যাপার? কিন্তু তার পরিণাম যদি আরো ভয়ঙ্কর হয়? "বাজে কথা" বলে দাবড়ি দেবেন গিন্নী। ভেস্তে যাবে ইমারত তৈরির আয়োজন। তখন যদি ঐ ব্যাটা গণৎকারের কথাই ফলে যায়, যদি করোনারি থ্রম্বোসিস কি হাই ব্লাড প্রেসার হয়, স্ত্রী-কন্যাদের ঠগের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হবে। তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পথে দাঁড়ালে কি তাঁর আত্মা পরলোকে শান্তি পাবে?

সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন নন্দী। বলতে গিয়ে অবশ্য কয়েকবার ঢোক গিলতে হলো। ভণিতাও করলেন তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা।

"আমি পরকাল মানিনে, পরলোকে বিশ্বাস করিনে। তবু যদি পরলোক থাকে। আমি ঈশ্বর মানিনে, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিনে। তবু যদি মৃত্যুর পর আত্মা থাকে। আমি দেহবিচ্ছিন্ন অশান্তি কখনো অনুভব করিনি, অনুভব করা সম্ভব মনে করিনে। তবু যদি আত্মা অশান্তি ভোগ করে। বুঝলে, মণি। আমার যখন উপায়ান্তর আছে, তখন কেন আমি এ ঝুঁকি ঘাড়ে করে মরি? কেন একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে যাইনে? তা হলে তোমরাও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত।"

মনীষার উত্তর হলো, "বেশ বানিয়ে বলতে পারো কিন্তু। রামমোহনের আগে জন্মালে তুমি আমার সহমরণের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে। তাতে তুমিও নিশ্চিন্ত আমিও নিশ্চিন্ত। তোমার মনে কী আছে বলব? তুমি চাও না যে আমি আবার বিয়ে করি।"

"আরে, নু নু নু নু না—আ! আরে, না, না, না—আ! আমি কি স্বপ্নেও কখনো ভেবেছি যে, তুমি আবার—ছি ছি ও কথা মুখে আনতে নেই।" জিব কাটলেন আর্য-পুত্র।

"হাঁ গো, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হাঁ—আ। আমি তোমার আত্মার অন্তস্থল অবধি দেখতে পাচ্ছি। তোমার কি ধারণা যে, আমার বিয়ের বয়স চলে গেছে? কেউ বিয়ে করবে না আমাকে?" এই বলে আর্যা এমন এক কটাক্ষ হানলেন যাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।

নন্দী সত্যি মনে করে চমকে উঠলেন। বললেন, "ছি ছি, মণি, তুমি কখনো পারো অমন কাজ? কেন তবে অমন কথা মুখে আনলে?"

"তা তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়ে সাধছে এই বয়সে ইহলোক ত্যাগ করতে? কার মগজে এ চিন্তা উদয় হয়েছে, বল? তোমার না আমার? গণৎকার কিছু দক্ষিণা আশা করেছিল, তা না হলে ওর পেট চলবে কেন? ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে, তুমি অন্যমনস্ক, তোমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, বেশী সময় নেই, যা দেবেন তা জলদি দিয়ে দিন। নোটখানা তুমি ওর হাতে না দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন? ওরও তো মানসম্ভ্রম আছে। ও কি অত লোকের সামনে উপুড় হয়ে ভিখিরীদের মতো পয়সা কুড়োবে নাকি? ট্রেন ছেড়ে দিলে তখন যেমন করে হোক

"তোমার কি ধারণা আমার বিয়ের বয়স চলে গেছে?"

তোমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করবে না। তখন তুমি যে জিনিসটিকে ভয় কর সেই জিনিসটি ঘটবে। তুমি ভাববে, গণৎকারের কথা ফলল। আমি ভাবব, তোমার অবিবেচনার ফল ফলল। তুমি কি মনে কর আমি তোমার টাকা চাই? আমি তোমাকেই চাই। যাকে বিয়ে করেছি সেই যদি না থাকল তবে আমি কাকে নিয়ে থাকব? মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে কি থাকতে পারি?"

"সব বুঝি, মণি। সব বুঝি। কিন্তু আমি যে মনঃস্থির করে ফেলেছি।"

"তা হলে আমাকেও মনঃস্থির করতে দাও। তুমি যখন আত্মহত্যা করবে বলেই বদ্ধপরিকর তখন আমিও দু'দিন আগে থাকতে মুক্ত হই। তুমিও আমার স্বামী নও, আমিও তোমার স্ত্রী নই। তারপর তোমার সম্পত্তি তুমি যাকে খুশি লিখে দিয়ে যাও। আমি বলবার কে?"

আর্যবাবু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। "তার মানে কী, মনীষা? তার মানে কী? কেন তুমি অমন কথা মুখে আনলে? আমি কি কোনো দিন অবিশ্বাসী হয়েছি? কোনো দিন অন্য নারী কামনা করেছি? কেন আমার যাবার আগে আমাকে এত বড় একটা দাগা দিতে চাও? আমাকে শান্তিতে যেতে দাও, মণি। আমি যে বড়ই বেদনা পাচ্ছি। তুমি সে বেদনায় প্রলেপ মাখাবে, না জ্বালা ধরিয়ে দেবে? সবই তো তোমার ও তোমাদের। চেতনা লুপ্ত হবার আগে তোমাদের ধন তোমাদের হাতে দিয়ে আমি নির্ধিমুক্ত হতে চাই।"

তুলে নেবে। তিলকে তাল করতে তোমার জুড়ি নেই। অকারণে কষ্ট পাচ্ছ এই ক' মাস। কলকাতা শহরে কি জ্যোতিষীর লেখাজোখা আছে? তাদের একজনকে শত-খানেক টাকা ধরিয়ে দিলেই তোমার আশি বছর পরমায়ুর গ্যারাণ্টি পেতে পারতে। চাও তো কালকেই নিয়ে যেতে পারি, তোমার যার উপর আস্থা, তার কাছে।"

আর্যকুমার বুঝলেন সবই, কিন্তু তাঁর মন মানল না। গণৎকারের উক্তির একমাত্র ব্যাখ্যাই ঠিক। আর সব বেঠিক। কিন্তু স্ত্রীকে বোঝানো শক্ত। আরেক ব্যাটা জ্যোতিষীর কাছে গেলে সেও তাই বলবে। মনটা আরো খারাপ হয়ে যাবে। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়? তিনি বেঁকে বসলেন। বললেন, "কাজ কি কেঁচো খুঁড়ে?"

এবার মনীষার চাপান। "তা হলে চল কাল তোমাকে পি জি'তে দিয়ে আসি। সেখানে তোমার একটা থরো চেক-আপ হয়ে যাক। আর যদি হাসপাতালে থাকতে না চাও বল, বাড়িতেই ব্যবস্থা করি। তোমার স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো, তবু যখন কথাটা উঠেছে তখন তোমার মনোবল অটুট রাখার জন্যে একটা ভালোরকম পরীক্ষা দরকার। রোগের জড় ধরা পড়লে এখন থেকেই সাবধান হওয়া যাবে। সাবধানের মার নেই। ক্ষতিটা কী?"

আর্যকুমারের উত্তোর। "লাভটাই বা কী? ডাক্তার বলবে সাবধান হতে। হব সাবধান। কিন্তু তুমি কি ঠিক জান, সাবধানের মার নেই? যেমন সাবধানের মার নেই তেমনি মারেরও সাবধান নেই। কথাটা আমার নয়। তোমাদেরই গুরুদেবের।"

মনীষা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। এককালে কলাকুশলা ছিলেন। সুদর্শনা তো এখনো রয়েছেন। তাঁর মুখ বন্ধ করে দিতে হলে গুরুদেবের কোটেশনই যথেষ্ট।

তিনি তর্ক করলেন, "গুরুদেবের নয়। তাঁর দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের।"

"তা হলে তো আরো গুরুতর।"

এর পর মনীষা দেবী বললেন, "দেখ, তোমার ওটা একটা ফিকসেশন। মানসিক চিকিৎসা না করলে সারবে না। কিন্তু তাতেও তোমার আপত্তি হবে। আমি এখন তোমাকে নিয়ে করি কী? তোমাকে যদি ওই সব করতে দিই তা হলে যেই ওসব সারা হয়ে যাবে অমনি তুমি নিষ্কর্মা হবে।

২

একদিন আপিস থেকে ফিরে আর্যকুমার দেখলেন, মনীষা বাড়ি নেই। কেউ বলতে পারল না, তিনি কোথায় গেছেন ও কখন ফিরবেন। একা একা চা খেলেন। তারপর একে একে টেলিফোন করলেন। "মা? না, মা তো এদিকে আসেননি।" উত্তর পেলেন একে একে। তারপর আরো কয়েক জায়গায় টেলিফোন করলেন। "মিসেস নন্দী? না, মিসেস নন্দী তো এখানে নেই।" হন্দ হলেন আর্যবাবু। হাল ছেড়ে দিয়ে ডাইভানে গড়িয়ে পড়লেন।

সেদিন সিনেমায় শোপ্যার জীবনচরিত। অভিনয় করবেন পল মুনি। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত হবে। কথা ছিল দু'জনে একসঙ্গে বেরোবেন। একসঙ্গে বসে ছবি দেখবেন। বাজনা শুনবেন। নয়ন ও শ্রবণ পরিতৃপ্ত হলে রসনার পরিতৃপ্তির জন্যে হোটেলে যাবেন। আগে থেকেই রিজার্ভ করা হয়েছে সিনেমার বক্স, হোটেলের টেবিল। কন্যা ও জামাতারাও যোগ দেবে।

একা একা যাওয়া যায় না। অস্থির হয়ে উঠলেন আর্যকুমার। গোসল করে ড্রেস করতে গেলেন এই ভেবে যে, ইতিমধ্যে মনীষা

এসে তাড়াহুড়ো বাধিয়ে দেবেন ঠিক। ও-রকম আগেও হয়েছে। মনীষার ধারণা, তৈরি হতে পুরুষরাই বেশী সময় নেয়। নেহাত ভুল নয়। দাড়ি কামানোর বালাই তো মেয়েদের নেই। তারপর ইংরেজী মতে ড্রেস-শার্ট পরতে যে কসরৎটা করতে হতো সেটা ইদানীং চুড়িদার পায়জামা চড়াতে গিয়ে হয়। বেয়ারার সাহায্য তাতে অপরিহার্য ছিল না, এতে অপরিহার্য। কী কল বানিয়েছে জবাহর কোম্পানি! খামোকা এই গরমে কালো শেরোয়ানী চাপিয়ে নিজের গলা টিপে নিজেকে মারতে হবে। না পরলে নয়। নন্দী হলেন জাতীয়তাবাদী বণিক।

না। মনীষার ফেরবার লক্ষণ নেই। তিনি কি তবে সরাসরি সিনেমায় গেছেন? সেইখানে দেখা হবে। হতে পারে। অসম্ভব নয়। কিন্তু এমন যদি হয় যে, আর্যকুমার সিনেমায় গেলেন আর তার পরেই মনীষা বাড়ি ফিরলেন, তখন? কী সমস্যা, বলুন দেখি! এর কী সমাধান আছে খুঁজে পাওয়া দায়: টিকিটগুলো আর্যকুমারের কাছে। সেগুলো তিনি গাড়ি করে ড্রাইভারের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, "মেমসাহেব যদি পৌঁছে থাকেন আমাকে এসে নিয়ে যেও। আর নয়তো এমনি ফিরে এসো খবর নিয়ে।"

মনীষা সে রাত্রে বাড়ি ফিরলেন না। সিনেমাতেও তাঁকে পাওয়া গেল না। কখনো এ রকমটি হয়নি। তবে কি তিনি রাগ করে বাপের বাড়ি গেছেন? টেলিফোনে উত্তর এলো, "কই, না?" পুলিস কমিশনার ছিলেন নন্দীর বন্ধু। তাঁকে রিং করতে হলো। তিনি বললেন, "অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে থাকলে এতক্ষণে আমরাই আপনাকে জানাতুম। আর কোনো থিয়োরি আপনার পক্ষে সম্মানের নয়। সুতরাং ধৈর্য ধরুন। শুতে যান।"

দুর্দিনের রাত পোহাতে চায় না। রাত-ভর অনিদ্রা। সকালে নিজের লোক পাঠিয়ে চার পাঁচখানা খবরের কাগজ আনিয়ে নিলেন। কাগজ হয়করার জন্যে সবুর সইল না। তন্ন তন্ন করে পড়লেন। কোথাও মনীষার বা সে রকম কারো উল্লেখ নেই। আশ্বস্ত হলেন। তা হলে দুর্ঘটনা নয়। অন্তত একটা থিয়োরি বর্জিত হলো। কলকাতা শহরে ও আশে-পাশে যতগুলো মেন্টাল হোম ছিল প্রত্যেকটাতেই গোপনে গোপনে সন্ধান করলেন তিনি। কোনো ফল হলো না। তা হলে আরেকটা থিয়োরি বর্জন করতে হয়।

মানুষটা তা হলে গেল কোথায়? শূন্যে মিলিয়ে গেল? আর্যবাবু এর রহস্যভেদ করতে পারলেন না। অসহায় বোধ করতে লাগলেন। আবার পুলিস কমিশনারকে ফোন করলেন। কেউ বে-আইনীভাবে আটক করে রাখেনি তো? আমেরিকার মতো নিষ্ক্রয় চার। পুলিস কমিশনার বললেন, "এ দেশে ওরকম হয় না। আপনি ধৈর্য ধরুন। আপিসে যান।" এখন বাড়ির চাকরদের তিনি বোঝাবেন কী? মিছে কথা বলতে হয়। মেমসাহেব গড়পারে তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন। দাদার অসুখ। কবে ফিরবেন কিছু ঠিক নেই।

কিন্তু মেয়েরা যখন টেলিফোনে খবর নেয় তখন মিছে কথা বলতে পারেন না। গলাটা কেঁপে যায়। ওরাও উৎকণ্ঠিত। দুর্বা তো সশরীরে এসে উপস্থিত হলো বাড়িময় বেশ করে খুঁজে দেখতে। কে জানে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছেন কি না। বড় বড় আলমারি খুলে ঝোলানো কোটে টান দেয়, খাটের তলায় উঁকি মারে। স্নানের ঘর তো এমনিতেই খোলা পড়ে আছে। বক্স রুম তো বাইরে থেকে তালাবন্ধ। তবু সে-সব ঘরও তল্লাস করা হয়। চাকরদের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। সব জানাজানি হয়ে যায়। বড় মেয়ে পুষ্প এসে অনর্থ বাধায়। চাকরদের ধমকায়। আবার বকশিসের লোভও দেখায়। একই মুখে নরম গরম। চাকররাও একজন আরেকজনকে শাসায়। আবার খোসামোদও করে।

খবরটা আরো ছড়ায়। পড়শীদের কানে পৌঁছয়। আর্যবাবুর লজ্জার পরিসীমা রইল না। প্রতিবেশিনীরা এসে উদ্বেগ জানিয়ে যান। প্রতিবেশীরা কৌতূহল। ইলোপমেন্টের মতো শোনায় না। বয়স যে চল্লিশের ভুল দিকে। তা সত্ত্বেও কারো কারো চোখে সন্দিগ্ধ চাউনি। আর্যবাবুর মর্মে বেঁধে। তিনি লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন। মদ। মদ ছাড়া মানুষের বন্ধু কে আছে!

এই পরিস্থিতিতে যা কিছু করা সঙ্গত ও সম্ভব সমস্তই করা হলো। কিন্তু নিরুদ্দিষ্টার সন্ধান মিলল না। সকলেই ধরে নিল যে, তিনি কলকাতায় নেই, পশ্চিমে বা দক্ষিণে চলে গেছেন। সর্বত্র চিঠি লেখা হলো, দূত পাঠানো হলো। তবে কাগজে ছবি ছাপানো হলো না, বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো না। আত্মহত্যার থিয়োরি ধরেও নদীনালা অন্বেষণ করা হলো। তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

বাড়ির সরকারমশায়—নেপালবাবু তাঁর নাম—একদিন সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "স্যার, সবই তো একে একে করা গেল। কোনো ফল হলো কি?"

"না। সব নিষ্ফল।" নিষ্প্রাণভাবে সাড়া দিলেন আর্য।

"স্যার, আপনি তো কিছু মানবেন না। আপনাকে ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?"

"নির্ভয়ে বলুন।"

তখন নেপালবাবু প্রস্তাব করলেন, "এবার নখদর্পণ করলে কেমন হয়?"

"নখদর্পণ!" বিস্মিত হলেন নন্দী। "সে আবার কী!"

সে যে কী জিনিস তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ময়মনসিং জেলা থেকে এক মুসলমান এলো, তার সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে। বয়স আট-দশ হবে। কলকাতা শহর সে এর আগে দেখেনি, যেটুকু পথে পড়ে সেইটুকুই তার দেখা। হাওড়ার পোল, হাওড়া স্টেশনের দালান, খড়্গপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, পুরীর মন্দির, পুরীর সমুদ্রতীর, সিংহাচলমের পাহাড়, এসব কোনো দিনই তার চোখে পড়েনি, পড়ার কথা নয়। তার মাথায় আসতে পারে না, তার কল্পনার অতীত। এক হতে পারে, তার বাপের হিপনোটিক ক্ষমতা তার উপর ভর করেছিল। বাপের মনের কথাই তার মুখে ফুটছিল।

"কী দেখতে পাচ্ছ?" প্রশ্ন করলেন আর্যবাবু।

মেয়েটি তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখের উপর দৃষ্টি রেখে উত্তর দিল, "একটা মেয়েলোক।"

"কী রকম দেখতে?" জেরা করলেন তিনি।

"খুব সুন্দর দেখতে।" মেয়েটি একটু বর্ণনাও করল।

"কত বয়স? বিশ একুশ বছর?"

"না। আরো বেশী।"

"ত্রিশ বত্রিশ?"

"আরো বেশী।"

"চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ?"

"হবে। একটা বাস গাড়ি।" মেয়েটি যেন দেখতে পাচ্ছিল সামনে।

"বাস গাড়ি? ট্রামগাড়ি নয়?" আবার তেমনি জেরা।

"না। এঁকে-বেঁকে চলে। একটা পোল। দুদিকে নদী।" বর্ণনা দিল মেয়েটি।

এইভাবে চলল অনেকক্ষণ। আর্যবাবুর প্রশ্ন আর মেয়েটির উত্তর। মেয়েটির উত্তর যে সরকারমশায়ের শেখানো নয় কিংবা এ বাড়ির আর কারো, সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন আর্য। কিন্তু একটা তথ্য তিনি লক্ষ করলেন। মেয়েটি প্রত্যেকবার উত্তর দেবার আগে বাপের দিকে তাকায়। যেন মনে মনে শুধায়, এবার কী জবাব দেব, বাপজান? অথচ বাপের চোখে মুখে কোনো রকম ইশারা বা ইঙ্গিত নেই। লোকটি সমুনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে।

পাহাড়ের বর্ণনার পর মেয়েটি হাল ছেড়ে দিল। বাপ বলল, "হুজুর, ও আজ কিছু খায়নি। আর পারছে না। ওকে ছুটি দিতে মেহেরবানী হোক।"

"আচ্ছা, পরে আবার হবে", বলে সেদিন-কার মতো নন্দী সাহেব উঠলেন।

পরের দিন তাঁর অভিপ্রায় ছিল লোকটাকে অন্যত্র সরাবেন। তারপর মেয়েটিকে প্রশ্ন

নৈবেদ্য
প্রার্থিত কোনো বিষয়ে সফলতা লাভ করলে, ব্যষ্টিগতভাবেই হোক আর গোষ্ঠীগতভাবেই হোক, আমরা সকলেই চাই অর্ঘ্য-নিবেদনের মধ্য দিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। পশ্চিমবঙ্গের নানা অভাব। সে অভাব দূর করতে পশ্চিমবঙ্গবাসী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সাহস ও আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে একটি একটি করে বাধা অতিক্রম করে,—কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, পরিবহন এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই তাঁরা এনেছেন বিশেষ সাফল্য।
পশ্চিমবঙ্গবাসী এই দিয়েই সাজিয়েছেন তাঁদের অর্ঘ্যের ডালি। দ্বিগুণ কর্মশক্তি লাভ করে যাতে আরো কঠিন কাজ করতে পারেন—সেই হলো তাঁদের প্রার্থনা।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
WBF-1-59.

করবেন। নতুন সব গোপনীয় প্রশ্ন। যথা, আর কেউ ছিল কি? আর কোনো মেয়েলোক? আর কোনো মরদলোক? কেমন দেখতে? কত বয়স?

কিন্তু সরকারমশায় এসে খবর দিলেন যে, মেয়েটি মা'কে ছেড়ে থাকতে পারছিল না। বড় কান্নাকাটি করছিল। তার বাপ তাকে নিয়ে কাল রাত্রেই দেশে ফিরে গেছে।

আপদ গেছে। জীবনে কোনো দিন যা বিশ্বাস করেননি সেই জ্যোতিষী-গণনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একে তো এই বিপত্তি। এখন নখদর্পণের প্রভাবে হয়তো স্ত্রীকে সন্দেহ করতে শুরু করবেন। যা জীবনে কোনো দিন করেননি।

আর্যকুমার কিন্তু অকস্মাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। তিনি তাঁর নিরুদ্দিষ্টা পত্নীর অনুসরণ করবেন। মেয়েদের ডেকে বললেন, "আমি নিজেই খোঁজ করতে চললুম। খোঁজ না পাওয়া অবধি ফিরব না। এ বাড়ির ভার রইল তোমাদের উপরে। আপিসের ভার ম্যানেজারের উপরে।"

বাড়ি থেকে কখন যে তিনি বেরিয়ে গেলেন কেউ দেখতে পেলো না। দুপুরের পরে তখন চাকরবাকর আউটহাউসে শুয়ে বিশ্রাম করছে। গেটে অবশ্য দারোয়ান ছিল। কিন্তু তাকে তিনি সিগারেট কিনতে পাঠিয়েছিলেন। ড্রাইভার গাড়িবারান্দায় গাড়ির ভিতরে শোবার জায়গা করে নিয়েছিল। সাহেবকে সে টিফিনের পর আপিসে ফের নিয়ে যাবে। কেন যে তার দেরি হচ্ছিল সে বুঝতে পারছিল না। ঝিমচ্ছিল।

"সর্দার ভাই!" দারোয়ান বলল বড় বেয়ারাকে। "সাহেবকে তো ডেকে সাড়া পাচ্ছিনে।"

বেয়ারা তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ি দিয়ে ছুটল। ড্রাইভার বলল, "আমিও তো ডেকে সাড়া পাচ্ছিনে।"

না। সাহেব কোথাও নেই। সর্দার অতি পুরাতন ভৃত্য। সে সব দেখেশুনে বলল, "সাহেব তো কিছুই নিয়ে যাননি। খালি হাতে গেছেন। তাঁর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি আর কাবুলী জুতো, কোথাও বেড়াতে গেছেন। একটু বাদে ফিরবেন।"

আহা, সেই ময়মনসিংহের মেয়েটি সেখানে ছিল না। থাকলে তার নখদর্পণে দেখতে পেতো—একটা লোক। না, মেয়েলোক না, মরদ লোক। দেখতে ডাগর। দোহারা। বয়স? না, বিশ একুশ না। ত্রিশ বত্রিশ না। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ না। আরো বেশী। একটা বাস গাড়ি। না ট্রামগাড়ি না। এঁকে বেঁকে চলে। একটা পোল। মস্ত বড় পোল। দুধারে নদী। না, মস্ত বড় নদী না। নদীতে ইস্টিমার। ঢের ঢের ইস্টিমার। একটা দালান। খুব বড় দালান। খুব বড় ঘড়ি। একটা রেলগাড়ি। আরেকটা রেলগাড়ি। আরো একটা রেলগাড়ি। রেলগাড়ি চিকরাচ্ছে। হুস্ হুস্। হুস্ হুস্। অনেক লোক। অনেক, অনেক লোক। রেলগাড়ি চলছে। চলছে, চলছে। অন্ধকার। বেবাক অন্ধকার। রেলগাড়ি চলছে। মানুষ ঢুলছে। অন্ধকার। ফরসা। পদ্মা। পদ্মা। বাঁ দিকে পদ্মা। বেবাক পানি। ডান দিকে পাহাড়। পাহাড়। ঢের ঢের পাহাড়। ইস্টিশন। রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে।

সিংহাচলমে গিয়ে আর্যকুমার মনীষার সন্ধান করলেন। যা ভেবেছিলেন তাই। বর্ণনা শুনে পাণ্ডারা বলল, "হাঁ, হাঁ, সেই রকম একজনকে দেখেছিলুম বটে।" কিন্তু কবে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ। কেউ বলে, এক মাস আগে। কেউ বলে, এক সপ্তাহ আগে। তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাচলম ত্যাগ করলেন।

মাদ্রাজ গিয়ে প্রথমে পার্থসারথি মন্দির। তারপর কপালেশ্বর মন্দির। যা মনে করেছিলেন তাই। বর্ণনা শুনে পাণ্ডারা বলল, "হাঁ, হাঁ, সেই রকম একজন এসেছিলেন বটে।" কিন্তু কবে ঠিক বলতে পারল না। কালবিলম্ব না করে আর্যবাবু পক্ষিতীর্থ অভিমুখে ছুটলেন। সেখানে দুটি সাদা চিলের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর অন্তর্ধান ঘটল। কারণ সেই একই। তারপর পণ্ডিচেরী তিরুবান্নামালাই, তিরুপতি, কাঞ্চীপুরম, তাঞ্জোর, তিরুচিরাপল্লী, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, রামেশ্বর, ধনুষ্কোটি, কুমারিকা—যেখানেই যান সেখানেই খবর পান, হাঁ, হাঁ, সেই রকম একজনকে দেখা গেছে বটে, কিন্তু কবে তা ঠিক মনে নেই।

এতগুলো লোক যা বলছে তা কি বিলকুল মিথ্যা? নিশ্চয় এসেছিলেন মনীষা। যিনি এসেছিলেন তিনি আর কোনো বাঙালীর মেয়ে নন। আর কারও বর্ণনা তাঁর সঙ্গে মেলে না। বাংলাদেশে আর কোন্ মহিলা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও তন্বী, ক্ষীণমধ্যা, ঘনকুন্তলা? খোঁপায় ফুলের মালা জড়াতে আজকাল অনেক বাঙালীর মেয়েকেই দেখা যায়, কিন্তু মাথায় তেল দেয় না এমন একজনও নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম মনীষা। সেইজন্যে তাঁর চুল অমন কটা। আর চুল অমন কটা বলেই তো পাণ্ডাদের কাছে ধরা পড়ে গেলেন। আর পাণ্ডারা ধরিয়ে দিল আর্যকুমারের কাছে। এখন হাতে-নাতে ধরতে পারলে হয়।

অত বড় একটা ম্যারাথন দৌড়ের পর আর্যবাবুর শ্রান্ত হবার কথা। কিন্তু জীবনে তিনি কোনো দিন শ্রান্তি মানেননি। তাঁর জীবনটাই একটানা একটা ম্যারাথন। লক্ষ্মীর পশ্চাতে। এবার তিনি ধাবমান গৃহলক্ষ্মীর পশ্চাতে। তিনি দম নিতে বসলে মনীষা কি আরো এগিয়ে যাবেন না? একেবারে হাতছাড়া হবেন না? তা হলেই হয়েছে!

কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন করবেন যে, দক্ষিণ মুখে না উত্তর মুখে? দক্ষিণ দিকে সিংহল। উত্তর দিকে কেরল। কে জানে মনীষা কোন দিকে গেছেন! যদি উত্তরে গিয়ে থাকেন তবে দক্ষিণে যাওয়া বৃথা। আর যদি দক্ষিণেই গিয়ে থাকেন তবে উত্তরে যাওয়া নিরর্থক। আর্যকুমার জনে জনে শুধালেন কেউ তাঁকে দিশা দিতে পারল না। তিনিও মনঃস্থির করতে পারলেন না। দিনের পর দিন ভারতের শেষ স্থলবিন্দুটিতে গিয়ে পদচারণ করলেন। পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর। তিন দিক থেকে তিন সাগরের ঢেউ এসে একই স্থানে ভেঙে পড়ছে। অথচ মিশে যাচ্ছে না। অপূর্ব! অপূর্ব!

সমুদ্রের বক্ষে অগণিত শৈল। তার একটিতে বসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে কত লোক যায়। আর্যবাবুও যান। বঙ্গোপসাগরে সূর্যোদয়। আরব সাগরে সূর্যাস্ত। অপরূপ! অপরূপ! যতবার দেখেন ততবার দেখতে সাধ যায়। আর্যকুমার তো জগৎজোড়া সৌন্দর্যের দিকে কখনো ভুলেও দৃষ্টিপাত করেননি। এখন সে যেন তার প্রতিশোধ নিল। অপ্রতিরোধ্য সে আকর্ষণ। আগেই তিনি দিশাহারা হয়েছিলেন মনীষাকে না পেয়ে। নতুন করে দিশাহারা হলেন তিন সাগরের রঙ্গ দেখে। এক সাগরে উদয়লীলা অন্য সাগরে অস্তলীলা দেখে।

পিছুটান তাঁর এর মধ্যেই ঢিলে হয়ে এসেছিল। কলকাতার কথা মনে পড়ে বইকি, কিন্তু ফিরে যেতে রুচি হয় না। বাড়ি বানানোর হুকুম দিয়ে এসেছিলেন। হুকুম তামিল হচ্ছে কিনা জানতে আগ্রহ নেই। কার জন্যে বাড়ি? তাঁর নিজের জন্যে তো নয়। যার জন্যে সে কোথায়! বিজনেস কেমন চলছে খবর নিতেও তাঁর কৌতূহল ছিল না। ফেল করার মতো কারবার নয়। চালু থাকবেই। নেহাত চুরি-চামারি না হলেই হলো। ইউরোপীয়ান ম্যানেজার ও-জিনিস করবে না।

কন্যাকুমারীর মূর্তি অবলোকন করাও নিত্য কর্ম হয়েছিল। একদিন সেই মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখের উপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, এই নারীতেই আছে সেই নারী।

এর পরের ইতিহাস লালাবাবুর অনুরূপ। দেশ থেকে লোকজন এলো তাঁকে নিতে।

"কর্তা, আপনি বাড়ি ফিরে যাবেন না?"

"না। এখানে আমি আনন্দে আছি। সেখানে গেলে দুঃখ পাব।"

তাঁর মেয়েরা এলো তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে। তিনি ধরা দিলেন না। বললেন, "ফেরাটা আসল কথা নয়।

পাওয়াটাই আসল। এখানে পাচ্ছি। ওখানে পাব না। কাজেই যাব না। যদি পাই, যাব।"

ভিতরে ভিতরে তাঁর আশংকা ছিল যে, সময় বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। গণৎ-কারের উক্তি মিথ্যা নয়। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর ভয়ডর চলে গেছে। তখন গণৎকারের কথা বিশ্বাস করেছিলেন ভেবে তাঁর হাসি পেলো। পাঁচ-জন আলাপীকে নিয়ে তাঁর সময় কেটে যায় কে জানে কোনখান দিয়ে। সময়ের হিসাব রাখতেও তাঁর সময় নেই। জানবেন কী করে সময় বেশী না সময় কম?

মনীষার অন্বেষণ কি তিনি ছেড়ে দিলেন? না, অন্বেষণ চলছিল অবিরাম; কিন্তু মানচিত্র ধরে মাটির উপর নয়। ঘড়ি ধরে সময়ের ভিতরে নয়। কেন, তাড়া কিসের? তিনি কি দু'মাস পরেই মরছেন যে তাঁকে মরি কি পড়ি করে ছুটতে হবে? যারা সময়ের সুমারি রাখে, ঘড়ি ধরে পথ চলে, তারা অন্বেষণের কী জানে!

শান্তিতে ছিলেন আর্যকুমার। কোথাও যাবার তাড়া নেই। কিছু একটা করবার তাগিদ নেই। সারা জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের ছুটি। দেশ থেকে চিঠি আসে। কেউ তাঁর জন্যে বসে নেই। কিছুই তাঁর জন্যে বসে নেই। এর চেয়ে সুখবর আর কী হতে পারে! আগে যে মনে হতো, তাঁর অবর্তমানে সবাই উচ্ছন্ন যাবে, সব বরবাদ হবে, এ কথা ভেবেও তাঁর হাসি পায়।

মেয়েরা জোর করে একটি চাকর পাঠিয়ে-ছিল তাঁর কাছে থাকতে ও তাঁর সেবা করতে। বিপিন তার নাম। সে একদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "বাবু! টেলিগ্রাম।"

টেলিগ্রামখানা অশুভসূচক নয় তো? খুলতে গিয়ে আর্যবাবুর হাত কাঁপছিল। খুলেই তিনি বিপিনকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন। নইলে পড়ে যেতেন।

মনীষার টেলিগ্রাম। উনি মঙ্গলবার পৌঁছবেন।

বার বার পড়ে তৃপ্তি হলো না। মুখস্থ হয়ে গেল পাঠাবার তারিখ, ঘণ্টা, মিনিট, ডাকঘরের নাম। হিসাব করে দেখা গেল, মঙ্গলবার পৌঁছতে হলে কলকাতা থেকে রেলপথে নয়, আকাশপথে আসতে হবে মাদ্রাজ। তারপর রেলপথে। বাকীটুকু মোটরে। আর্যবাবুর আর তর সইছিল না। তিনি এক ভদ্রলোকের অনুগ্রহে তাঁর মোটরে লিফ্‌ট্ পেয়ে নিকটতম রেলস্টেশনে চললেন। পঞ্চাশ মাইল দূরে।

মনীষা তাঁর স্বামীকে পথ ফুরোবার আগে তিরুনেলবেলি স্টেশনে প্রত্যাশা করেননি। প্রথম চমকটা তাঁরই।

দুজনেই নির্বাক। সাশ্রুনেত্র। উদ্বেল-হৃদয়। মন্থরচরণ। অন্যমনস্ক।

প্রাণ খুলে কথা বলার অবসর যখন হলো তখন দুজনে দুজনকে শোনালেন গত সাত মাসের বৃত্তান্ত। সাতটা মাস তো নয়, সাতটা বছর। না শতাব্দী?

মনীষা কলকাতা শহরেই ছিলেন গা ঢাকা দিয়ে। এক গুজরাতী পরিবারে গভর্নেস হয়ে। তাঁদের কাছে তিনি পাটনার সাবিত্রী সিন্‌হা।

"এত নাম থাকতে সাবিত্রী কেন?"

"কেন?" মনীষা বলবেন কি বলবেন না করতে করতে বলে ফেললেন, "আমি যে সাবিত্রীর মতো প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তোমাকে যমের অধিকার থেকে ফিরিয়ে আনব। এ-কালের সাবিত্রীর পদ্ধতি সেকালের সাবিত্রীর মতো নয়। তোমাকে অত বড় একটা শক না দিলে তোমার মরণপ্রস্তুতি বাধা পেতো না। তোমাকে অমন ক'রে না ঘোরালে তোমার অন্য দিকে মতি যেতো না।"

"ঘোরানোর মূলে তো নখদর্পণ?"

"নখদর্পণের মূলে আমি। সরকারমশায় আমারই লোক।"

নন্দী অবাক হলেন। "বল কী! নেপাল-বাবু সমস্ত জানতেন, অথচ আমাকে জানান নি? এমন নেমকহারাম কি দুটি আছে!"

"না। অমন পরম বান্ধব দুটি নেই। কাউকেই তিনি জানতে দেননি। মেয়েদেরও না। জামাইদেরও না। প্রতি সপ্তাহেই আমাকে তোমার খবর পাঠাতেন গোপনে।"

"প্রতি সপ্তাহেই!" বিশ্বাস করলেন না আর্য। "সিংহাচলম, মহাবলিপুরম, এসব জায়গার খবর তিনি কার কাছে পাবেন যে তোমাকে পাঠাবেন?"

"কেন, তুমিই তো আপিসে টাকার জন্যে টেলিগ্রাম করতে। একসঙ্গে বেশী টাকা চাইতে না। কিন্তু চাইতে নতুন নতুন জায়গা থেকে। আমি তো ভেবেছিলুম কুমারিকায় তুমি তিন চার দিনের বেশী থাকবে না। হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস থাকলে দেখে ভাবনায় পড়ে গেলুম। অসুখ-বিসুখ নয় তো? লোকজন পাঠালুম তোমাকে ঘরে ফেরাতে।"

আর্যকুমার তখন বললেন তাঁর অন্তরঙ্গ উপলব্ধির কথা। এই নারীতে আছে সেই নারী।

"ওমা, তাই নাকি! আঁ! বল কী! সেইজন্যে কন্যাকুমারীকে ছাড়তে চাওনি? আমি নিজে না গেলে দেখছি তোমাকে নড়ানো যেতো না?" মনীষা শিউরে উঠলেন।

"আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে তোমাকে ধরতে না পেলে ফিরব না, নড়ব না। অমনি করে পেয়ে গেলুম তোমার সন্ধান। যে-তুমি বিশুদ্ধ নারীসত্তা। এস, নতুন করে বাঁচি।"

ও'রা দুই তরুণ-তরুণী কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন নতুন করে বাঁচতে। সময় ও'দের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
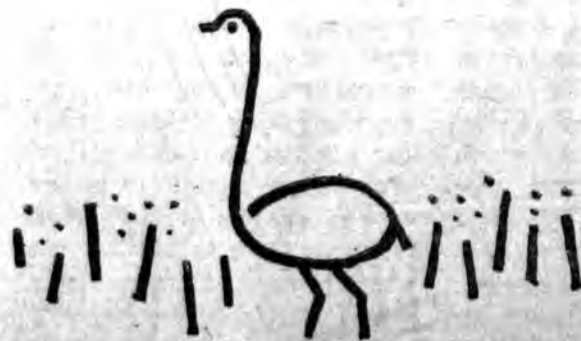
কোন্ মুলুকে চরে জানো,
ভস্মলোচন হায়না?
মড়া চিবোয়, আধমরাদের;
জ্যান্ত, ভয়ে খায় না!

জ্যান্ত এবং মরায় যেথায়
তফাৎ নাই,
হায়না হাসে সেই শ্মশানে
শুনতে পাই।

ও মড়া তুই জাগ্‌বি নে?
থাকবি গাদা ডাস্টবিনে!
নিজের খুলি খুলে ধরে'
পরম কারণ চাখ্‌বিনে?
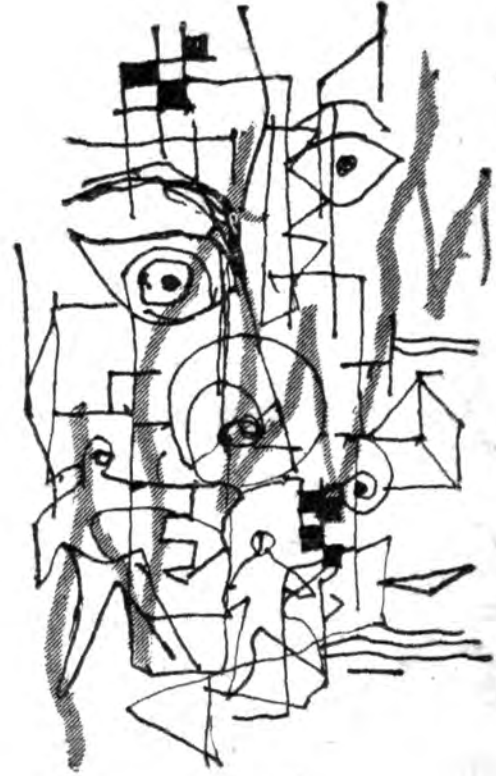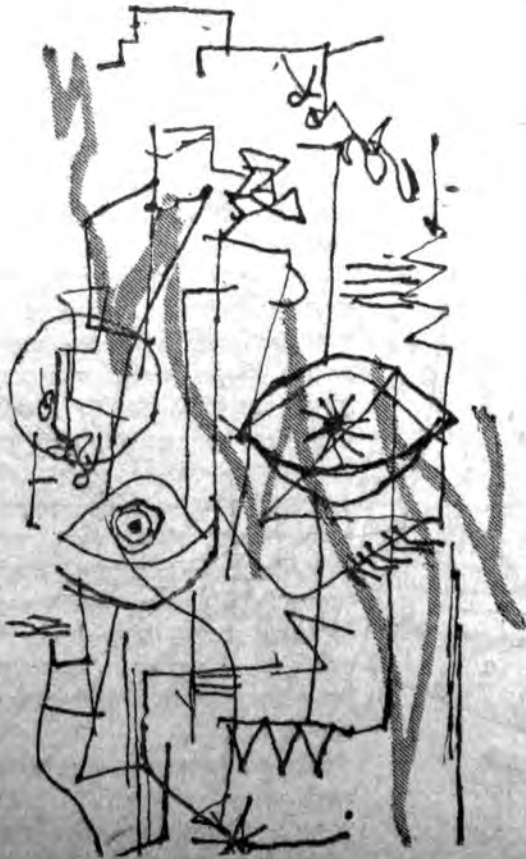
ভস্মলোচন হায়না
সব মুলুকেই স্যায়না!
লক্‌লকে জিভ্ বুলিয়ে বেড়ায়,
যেথায় তাকায় সব-ই পোড়ায়,
নিজের মুখে চায় না।

ও মড়া তুই জ্যান্ত হ,
আন দেখি সেই আয়না,
নিজের চোখে-ই নিপাত ডাকুক
ভস্মলোচন হায়না।

শব জাগানো মন্ত্র দেবে
কোন কাপালিক ভৈরবী?
অরণ্যে সার করুণ রোদন
ছড়া কেটেই যায় কবি।

সায়ন্তনী

সুবোধ ঘোষ

ক সন্ধ্যায় ফুটেছিল যে মল্লিকা; আর-এক সন্ধ্যায় ফুটে উঠলো সেই মল্লিকার বিয়ের ফুল।

অনেক আলো জ্বলছে, শানাই বাজছে, আঙিনায় আলপনা আঁকা হয়েছে, লোক-জনের ব্যস্ততা হৈ-হৈ করছে; কলকাতার ননীকাকা এসেছেন। বর্ধমানের চারুমামাও এই কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছেন। চারুমামার বড় মেয়ে পারুলদি, যাঁকে জীবনে কোনদিন দেখেনি মল্লিকা, তিনিও এসেছেন। রঙীন বেনারসী জড়িয়ে আর কপালে চন্দনের লবঙ্গ-তিলক এঁকে একটা শাঁখ-বাজানো সঙ্কেতের অপেক্ষায় ঘরের ভিতরে মেঝের উপর একটা আসনের উপর বসে আছে মল্লিকা। কাজল দেওয়া চোখের কোলে লজ্জাঘন ভীরুতা, কিন্তু মুখটা হাসি ঝরাচ্ছে। এইরকম একটা উৎসবের রূপ ফুটে উঠলেই ত বিয়ের ফুল ফুটে যায়।

সেই জ্যেঠামশাই আজ আর নেই, এই মল্লিকা নামটাই যাঁর দেওয়া নাম। আজ তিনি থাকলে নিজেরই চোখে দেখতে পেতেন, তাঁর একটা ভবিষ্যদ্বাণী কত সার্থক হয়েছে। সেই সন্ধ্যার সেই ফুটফুটে আর ধবধবে সাদা এইটুকু একটা মল্লিকা আজ সন্ধ্যায় সত্যিই যেন শত রঙে রঙীন একটি নতুন রূপের মল্লিকা হয়ে গিয়েছে। বলেছিলেন জ্যেঠামশাই, আমি এখনই বলে দিচ্ছি, এ মেয়ে হলো রূপচোরা মেয়ে; এখন দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না, কিন্তু বুঝবে তখন, যখন বড়টি হবে এই মেয়ে। রূপ তখন এমন রঙ খুলবে যে, দেখনেওয়ালার চোখের পলক পড়বে না।

একটু অদ্ভুত মানুষ ছিলেন সেই জ্যেঠা-মশাই। এই আমতলা হাটেরই স্টেশনের কাছে একটা চালের আড়তে কাজ করতেন। মাথাভরা টাক আর মুখভরা দাড়ি, রোগাটে চেহারার ছোটখাট মানুষটি। আড়তের খাটুনি থেকে একটু ছুটিছাটা পেলেই সারা-দিন কালিদাস পড়তেন।

বাড়ির পিছনে ডোবার মত দেখতে ঐ পুকুরটারই পাশে নিজের হাতে ফুলের বাগান করেছিলেন জ্যেঠামশাই। রাত্রিবেলা বাগানের শিউলিগুলোর দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে বলতেন—আহা! রজনীহাসিনী শেফালিকা! সকালবেলায় শালুকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন—প্রভাতকিরণবন্দিতা নলিনী।

আরও কত কি বলতেন; বসন্তানিলপ্রিয়া মাধবী, সায়ন্তনী মল্লিকা!

হ্যাঁ, জ্যেঠামশাইয়ের বাগানের মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাতেই ফুটত। কাজেই, চালের

আড়তের কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরেই যখন শুনলেন যে, যোগেশের একটি মেয়ে হয়েছে, তখন একেবারে আঁতুড়ঘরের দরজার কাছে এসে আর সদ্যোজাতা ভাইঝিকে দেখে তখনই নাম দিয়ে দিলেন—সায়ন্তনী মল্লিকা।

জেঠামশাই নিজে অবশ্য মল্লিকাকে সায়ন্তনী বলেই ডাকতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার সায়ন্তনী নামটাও চলে গিয়েছে। থেকে গিয়েছে শুধু মল্লিকা।

বলেছিলেন জেঠামশাই, মেয়েটা যদি রাত্রিবেলা জন্ম নিত, তবে নাম দিতাম শেফালিকা। সকালবেলায় হলে, নলিনী। বসন্তকালে হলে, মাধবী। বর্ষাকালে হলে, কেতকী। আর...।

শালুর কাপড়ে বাঁধানো কালিদাসের পাতা ওলটাতে থাকেন জেঠামশাই।

মল্লিকার বয়স যখন প্রায় পনর, তখনও বেঁচে ছিলেন জেঠামশাই। কিন্তু সে মল্লিকার চেহারার রকম দেখে মল্লিকার মা মাঝে মাঝে দুঃখ করতে গিয়ে হেসেই ফেলতেন।

—এত কাব্যি করে বড়দা কী যে বললেন, আর কী যে হলো! সিঁটকে সিড়িঙ্গে আর গাল-ভাঙ্গা, বড় হয়ে শ্রীমতীর রূপ ত এই দাঁড়িয়েছে।

মন্তব্যটা একদিন শুনতে পেয়েছিলেন জেঠামশাই। শালুর কাপড়ে বাঁধানো কালিদাস হাতে নিয়ে প্রায় তেড়ে এসে বলেছিলেন —তুমি খুব ভুল বুঝেছ বউমা। সায়ন্তনী বড় হতে না হতেই তুমি এসব কথা কেন বলছো?

—আর বড় হবে কবে?

—না, এখনও বড় হয়নি সায়ন্তনী। এই বয়সটাকে বড়-হওয়া বয়স বলে না। এর ডবল বয়স হওয়া চাই।

—তার মানে তিরিশ?

—নিশ্চয়।

জেঠামশাইয়ের একটা সাধের কল্পনা, কিংবা কল্পনার সাধ। কিন্তু তাও যে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। মল্লিকার বয়সটা তিরিশই হয়েছে, আর রূপটাও যে সত্যিই একটা রঙীন ফুল্লতা, দেখনেওয়ালার দুই চোখ অপলক করে দেবারই মত। কে বলবে এই চেহারা একদিন একটা সাদা সিঁটকে সিড়িঙ্গে চেহারা ছিল? বয়সটা যে তিরিশ হয়েছে, তাই বা বলবার সাধ্য আছে কার?

কিন্তু শাঁখ বেজে উঠবার পরেই এত মুখর বিয়েবাড়িটা এত নীরব হয়ে গেল কেন? বর আর বরযাত্রীরা এসে যাবার পরেই যদি বিয়েবাড়ির উৎসবের প্রাণ এত স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে তো সেই ভয়ানক সন্দেহটাই করতে হয়, ফোটা ফুল বোধ হয় ঝরে গেল।

মল্লিকাও যে তাই সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে। তা না হলে, এতক্ষণের মধ্যে একটা মানুষও মল্লিকার কাছে ছুটে আসে না কেন? যারা এতক্ষণ কাছে ছিল আর এত হাসছিল, তারা বর দেখবার জন্য সেই যে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল, যেন চলেই গেল; কেউ আর ফিরে আসে না কেন? কোথায় গেল ওরা, যাঁরা আর ধরা? বাসরঘরে হৈ-চৈ করবে বলে আগে থেকেই কোমরে আঁচল বেঁধে তৈরী হয়েছিল যারা দুজন? মা কোথায় চুপ করে লুকিয়ে রইলেন, যিনি এতক্ষণ ধরে এত কাজের চাপের মধ্যেও একটা আনমনা ব্যাকুলতার মত বার বার এসে শুধু মেয়ের মুখটি দেখেই যেন ধন্য হয়ে আবার চলে যাচ্ছিলেন? সেই পারুলদিই বা কোথায় সরে রইলেন, আর্টিস্ট পারুলদি, যিনি বলেছিলেন, বর এসে পড়লেই কেউ যেন তাঁকে জাগিয়ে দেয়। তিনি এসে নিজের হাতে মল্লিকার খোঁপাটাকে জুঁই-এর কুঁড়ির মালা দিয়ে নতুন ছাঁদে বেঁধে দেবেন। কেউ কি এখনও পারুলদিকে জাগিয়ে দেয়নি? বর তো এসে গিয়েছে।

তবে কি নতুন কোন দাবি তুলেছে বরপক্ষ? সত্যিই কি বরপণ হিসাবে নগদ কয়েকশো টাকা ওরা পেতে চায়? কিংবা এসেই খোঁজ নিয়েছে, দানসামগ্রী হিসাবে যা দেবার কথা ছিল তা সত্যিই দেওয়া হচ্ছে কি না?

এরকম একটা কাণ্ড যে বাধতে পারে, সেটা একটু আগেই আঁচ করেছিলেন চারু-মামা। বাবাকে স্পষ্ট করে শুধিয়েছিলেন—ওরা যা বলেছে, সেটা স্পষ্ট করে বলুন যোগেশদা। পণ চাই না একথা কি সত্যিই ওরা বলেছে?

যোগেশবাবু বলেছিলেন—পণ চাই, এমন কথাও তো ওরা বলেনি।

—তার মানে এ নয় যে, ওরা পণ চায় না।

—আমি তা মনে করি না।

—বরপক্ষের মনস্তত্ত্ব আপনি কিছুই জানেন না, তাই এরকমটি মনে করে বসে আছেন। দেখবেন, ঠিক সময় বুঝে পণ দাবি করে ওরা চেপে ধরবে, আর আপনারই মত যুক্তি দেখাবে: পণ চাই না, এমন কথা তো আমরা বলিনি।

—একথা বললে কী লাভ হবে ওদের? আমাকে কেটে ফেললেও তো টাকা বের হবে না।

—সেই জন্যেই ত বলছি যোগেশদা, ব্যাপারটা ওদের সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা করে একটু খোলসা করে নেওয়াই ভাল ছিল। শেষে বিয়ে নিয়েই একটা গণ্ডগোল না বাধে।

মল্লিকার দুশ্চিন্তার প্রশ্নগুলি ভীরু মনের বাতাসে যেন গুনগুন করে; বরপণের দাবি না হয় ওরা ছেড়েই দিল, কিন্তু দানসামগ্রীর চেহারাটা যদি ওরা আগেই দেখতে চায়, তবে কেমন করে পার পাবেন যোগেশবাবু? দানসামগ্রী বলতে ত এই; দুটো থালা, দুটো গেলাস আর দুটো বাটি। আর; একটা তোষক, একটা চাদর ও দুটো বালিশ।

মল্লিকা জানে, দান-সামগ্রীর ব্যাপারেও ওদের কোন দাবি ছিল না। বরের বাড়ির পিসির শুধু একটা অনুরোধ ছিল—দেখতে ভাল দেখাত যদি মেহগনির একটা পালঙ্ক দেওয়া হত।

—অবশ্যই দেব। চিঠি লিখে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় এই প্রতিশ্রুতির কথা যে বরপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বাবা, তাও মল্লিকার অজানা নয়।

মা অবশ্য বার বার বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, কথা দিয়েও জিনিসটা না দেওয়া একটুও উচিত হচ্ছে না। যেমন করে পার, ধারের জন্য অনাদিবাবুর কাছে যদি আর-একবার হাত পাততে হয়, তাও ভাল।

বাবা বলেছিলেন—ধার পাওয়া যায় না।

মা রাগ করেছিলেন—তবে ওদের কথা দিয়েছিলে কেন?

বাবা একটুও রাগ না করে মার রাগটাকেই তুচ্ছ করলেন—ওটা একটা কথার কথা।

মা—কিন্তু শেষে যদি এ নিয়ে কোন কথা ওঠে আর কোন গণ্ডগোল হয়, তা হলে আমি কিন্তু...!

বাবা বলেন—হ্যাঁ, তা হলে আমাকে ফাঁসি দিয়ো তুমি।

এ ছাড়া আর এমন কি কারণ থাকতে পারে যার জন্যে বরপক্ষ এত বিরূপ হতে পারে? ভাল করে অভ্যর্থনা করা হয়নি? আসা মাত্র চা দেওয়া হয়নি?

তাই বা কি করে হবে? বরপক্ষকে অভ্যর্থনা করবার আর খাইয়ে-দাইয়ে সব রকমে তুষ্ট করবার দায় নিয়েছেন যিনি, তিনি হলেন ননীকাকা। শোনা যায়, এই জীবনে তিনি এযাবত পঞ্চাশেরও বেশি বিয়েতে বর, বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে তুষ্ট করবার কাজে খেটেছেন। ননীকাকা নিজেও গর্ব করে বলেন, আমার হাতে পড়ে আজ পর্যন্ত কোন বর, কোন বরপক্ষ আর কোন বরযাত্রী অতুষ্ট থাকতে পারেনি। গোখরো সাপের মত মেজাজ, কত বরকর্তার হৃদয় গলিয়ে দিলাম!

বর, বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করতে সে ননীকাকার কাজে কথায় ও ব্যবহারে কোন ত্রুটি ঘটেছে, এটা যে কল্পনা করা যায় না। নিতান্ত অসম্ভব।

তবে আর কি কারণ থাকতে পারে? তবে বর আর বরপক্ষ কি এমন কোন সত্য জেনে ফেলেছে, যেটা গোপন রাখা হয়েছিল? তাই কি হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে বর মানুষটার আশা আর বরপক্ষের বিশ্বাস? তাই কি ওরা রাগ করে যোগেশ দত্তের বাড়ির প্রথম উৎসবের আলো একেবারে নিভিয়ে দিতেই চায়?

মল্লিকার কাজল-দেওয়া চোখের কোণের লজ্জাটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। শিউরে ওঠে চোখ দুটো। আয়নার দিকে তাকাতে আর ইচ্ছা হয় না।

ঠিকই ত, একটা সত্য গোপন রাখা হয়েছে। এর জন্য কিন্তু বাবাকে দায়ী করা যায় না। দায়ী হলেন মা আর জেঠিমা। বিয়ের কথা যখন চলছিল, মা আর জেঠিমাই বাবাকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—ওরা মেয়ের বিষয় যা কিছু জিজ্ঞেস করবে, সবই ঠিক-ঠিক বলে দেবে; কিন্তু বয়সটা বলে দিও না।

—তার মানে?

বাবার বুদ্ধির উপর মা আর জেঠিমা, দুজনের কারও কোন আস্থা কোনদিন ছিল না। দুজনেই বলে দিলেন—তার মানে একটু কম করে বলে দেবে।

—পনর?

—না; আঠার বললেই চলবে।

আগে নিশ্চয় ওরা জানতে পারেনি; তা হলে আগেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। এখানে এসে, মানুষের জীবনের একটা আশার শঙ্খকে বেজে উঠবার সুযোগ দিয়ে, তারপর মানুষকে অপমান করবার এমন একটা নিষ্ঠুর কাণ্ড ওরাও করতো না।

বুঝুন এখন মা আর জেঠিমা, তাঁদের বুদ্ধির মিথ্যেটা কত মিথ্যে হয়ে গেল। বিয়ে করতে এসে, বিয়ের লগ্ন যখন আসন্ন, তখন এক ভদ্রলোক কত সহজে তাঁদেরই আদুরে মেয়ের বয়সটাকে কত সহজে অপমান করে দিল?

কিন্তু জ্যেঠামশাইয়ের একটা ভবিষ্যদ্বাণীও যে মিথ্যে হয়ে গেল।

জ্যেঠামশাই বলতেন : কোন্ রাজপুত্তুর না সায়ন্তনীকে বিয়ে করতে চাইবে? কিন্তু তাই বলে আমাদের সায়ন্তনী কি তাকে বিয়ে করে ফেলবে? সেটি হবে না, কখখনো না। তোমাদের কারও পছন্দে নয়, নিজে পছন্দ করবে, তবে বিয়ে করবে সায়ন্তনী।

পছন্দ ত করেওছিল মল্লিকা। ওঘরে বসে আর বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে, মল্লিকাকে শোনাবারই জন্যে, পাত্রের পরিচয় বর্ণনা করেছিলেন মল্লিকার বাবা যোগেশ দত্ত। সরকারী চাকরি করে পাত্র, বেহালাতে নিজের বাড়ি আছে, নামটা হল অনিরুদ্ধ রায়। বেশ দেখতে, বেশ স্বাস্থ্য, বেশ হাসি-খুশি মুখটি, এক কথায় বলা যায়...।

মা'ও বেশ খুশি হয়ে হাসেন। —একটু স্পষ্ট করেই শুনিয়ে দাও না, যা বলা যায়?

চেঁচিয়ে ওঠেন বাবা। —এক কথায় বলা যায়, বেশ মানুষটি।

বাবার চেঁচিয়ে-বলা এই সত্যের মধ্যে তবু কেমন-যেন একটা অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে। তাই ঘরের ভিতরে চুপ করে দাঁড়িয়ে-থাকা মল্লিকার একলা মূর্তির মুখটা তবু হেসে উঠতে পারেনি। আরও একটা সত্য, যেটা জানবার জন্যে মল্লিকার আশার মনটা উৎকর্ণ হয়ে আছে, সেটাই যে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন না বাবা।

জেঠিমারও মনে বোধ হয় একটা খটকা লেগেছিল। তাই জিজ্ঞেসা করলেন—বেশ মানুষটি মানে কী?

—মানে, অনিরুদ্ধ ছেলেটি চমৎকার মানুষ।

হেসে ফেলেছিল মল্লিকা। সেই ভয়ের ছায়াটা সরে গেল। মল্লিকার আশাও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

অনিরুদ্ধকে জীবনে কোনদিন দেখেনি মল্লিকা। অনিরুদ্ধর কোন ফটোও বাবা নিয়ে আসেন নি। কিন্তু মল্লিকার বিহ্বল চোখ দুটো যেন অনিরুদ্ধর হাসি-খুশি মুখটাকে দেখতে পেয়েছে।

কত সম্বন্ধ এসেছে আর চলে গিয়েছে। যেন যোগেশ দত্তের দারিদ্রতার ভয়ানক চেহারাটাকে দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল যত ঘট-কালির উল্লাস। যোগেশ দত্তের মেয়ের চেহারাটাকে দেখেও ত কোন সম্বন্ধের করুণা হয়নি। লেখাপড়া বলতে কিছুই জানে না বলা চলে, শুধু একটা সুন্দর চেহারা, তাকে ঘরের বউ করে নিয়ে যাবার জন্য পৃথিবীর ভাল-ভাল ঘরগুলির কেউই রাজি নয়। এমন কি কলতার বসুবাড়ি, যাদের সেকেলে বড়-মানুষিপনার দালানটা জীর্ণ হয়ে প্রায় ভেঙে পড়েছে, সে বসুবাড়ির ইচ্ছাটা অনেক দূর এগিয়ে এসেও শেষে পিছিয়ে গেল। যোগেশ দত্তর মত এত দরিদ্র একটা কুটুম্ব পেতে বসুবাড়ির ভাঙা দালানটাও রাজি নয়।

অনেক বিয়ের প্রস্তাব যে ফিরিয়ে দেওয়াও হয়েছে। যেমন টালিগঞ্জের ভরতবাবুর ছেলের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ের প্রস্তাবটা। ছেলে একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। মা আর জেঠিমা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—তা হয় না। এর চেয়ে মেয়েকে সন্ন্যাসিনী করে একটা মঠে রেখে দিয়ে এলেই ত হয়।

মল্লিকার মনটাও ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছিল—ছিঃ, এমন বিয়ের আগে মরে যাওয়াই ভাল।

আশা আশাভঙ্গ ভয় আর আপত্তি: এই নিয়েই বছরের পর বছর পার করে দিতে দিতে মল্লিকার বয়সটা তিরিশে এসে ঠেকেছে। মল্লিকার জীবনটা একটু হতাশ হয়ে পড়লেও ভাগ্যটা যে একটুও হতাশ হয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ বেহালার অনিরুদ্ধ, যে আজ আমতলা হাটের সবচেয়ে গরিবের একটা দুশ্চিন্তিত সংসারের আঙিনায় সুন্দর একটি উৎসব জাগিয়ে দিয়ে মল্লিকার হাত ধরতে এসেছে।

কিন্তু এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, আর কোন সন্দেহ নেই, মল্লিকার ভাগ্যটাকে ঠাট্টা করবারই জন্য এসেছে অনিরুদ্ধ নামে একটা শখের বিদ্রোহ। বিয়ে হবে না। এই বেনারসী ছাড়তে হবে। চন্দনের লবঙ্গ-তিলক মুছে ফেলতে হবে। আর্টিস্ট পারুলদিকে জাগিয়ে তোলার আর কোন দরকার নেই।

এইবার শুনতেও পেল মল্লিকা; চেঁচিয়ে উঠেছেন চারুমামা। —না, এ বিয়ে হবে না।

তার পরেই বাড়ির আঙিনায়, এঘরে-ওঘরে আর দাওয়ার আনাচে কানাচে নীরব মানুষের এক একটা জটলার বুক থেকে একটা গম্ভীর আক্ষেপের সোরগোল যেন উথলে ওঠে। —না, এ বিয়ে হতে পারে না।

—কখখনো না।

—হওয়া উচিত নয়।

—হতেই দেওয়া হবে না।

চমকে ওঠে মল্লিকার বেনারসী জড়ানো মূর্তিটা। সোরগোলের ভাষাটা যে অদ্ভুত একটা রহস্যের ভাষা। অনিরুদ্ধ নয়, উৎসবেরই বাড়িটা যেন ইচ্ছে করে বিয়েটা ভেঙে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এইবার ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে, মল্লিকার একলা মূর্তিটার বিমূঢ়তা চমকে দিয়ে চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—একটা কাণ্ডই করেছেন যোগেশদা। ছিঃ।

—কী ব্যাপার মামা? ভয়ার্ত চোখ দুটো অপলক করে বিড়বিড় করে মল্লিকা।

—লোকটার বয়স পঞ্চাশের কম নয়।

মা আর জেঠিমাও ছুটে এসে ফোঁপাতে থাকেন। —আমরা ত কখনো এমন সন্দেহ করতেই পারিনি যে...।

চারুমামা ধমক দিয়ে বলেন—কেন পারেন নি?

মা বলেন—ওর কথা থেকে ধারণা হয়েছিল......।

—ধন্যি আপনাদের ধারণা। আর ধন্যি যোগেশদার কথা!

—তা ত হলো; কিন্তু এখন কি উপায় হবে চারু?

মল্লিকাই চেঁচিয়ে ওঠে। —না, কোন উপায় হবে না। বিয়ে হবে না। তোমরা সবাই দয়া করে এখন একটু চুপ কর।

তোয়ালেটা হাতে তুলে নিয়ে যেন চন্দনের লবঙ্গ-তিলক দিয়ে আঁকা একটা অভিশাপের ঠাট্টাকে এই মুহূর্তে মুছে দিয়ে কপালের জ্বালা জুড়িয়ে দেবার জন্য তোয়ালেটাকে হাতে তুলে নেয় মল্লিকা। চারুমামা বাধা দিয়ে মল্লিকার হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলেন। চারুমামার চোখ দুটোও ছলছল করে। —থাম মল্লিকা।

—কেন?

—একটু ধৈর্য ধর।

—কেন?

—একটু অপেক্ষা কর।

—কি ছাই বলছেন মামা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—আমার বিশ্বাস, বিয়ে হয়ে যাবে।

—তার মানে?

—তার মানে, বেহালার ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে নয়। অন্য কারও সঙ্গে।

—না; যাকে-তাকে ধরে নিয়ে এসে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দেবেন, আর আমি বেহায়ার মত...।

—না না, যাকে-তাকে ধরে এনে বসাবো কেন? একজন সৎপাত্রকেই নিয়ে এসে বসাবো।

—না, তা হয় না, হবে না। ওসব কাণ্ড থিয়েটারেতেই সম্ভব হয়। আপনি মিছে চেষ্টা করবেন না।

—আপত্তি করিস না মল্লিকা। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—দশ বছর ধরে ত কত চেষ্টা করলেন আপনারা। চেষ্টার ফলও ত দেখলাম। আর কেন? এখন একটু লজ্জা পেয়ে চেষ্টাটা ছেড়েই দিন।

—ছিঃ, এত রাগ করতে নেই মল্লিকা। এখনও পর পর তিনটে লগ্ন আছে। রাত দেড়টায় সময় শেষ লগ্ন। একটু চেষ্টা করবার সময় আছে মল্লিকা।

মীরা আর ধরা পুকুরপাড়ের নন্দীবাড়ির দুই মেয়ে, দুজনেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখ দুটো ছলছল করছে। জেঠিমা ইশারায় মীরাকে আর ধরাকে কী যেন বলেন। মীরা আর ধরা তখনি এসে মল্লিকার দুই হাত চেপে ধরে। —তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, তুমি চুপটি করে শুধু বসে থাক। মামা যখন বলছেন যে...।

হেসে ফেলে মল্লিকা, আর হাসতে গিয়ে চোখ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে।

চারুমামা উৎসাহিতভাবে বলেন। —আমি কথা দিচ্ছি মল্লিকা। তোর পছন্দ হবে না, এমন কাউকে বিয়ে করবার জন্য তোকে কেউ পীড়াপীড়ি করবে না।

চলে যান চারুমামা। তার পরেই আঙিনার দিক থেকে চারুমামার গম্ভীর প্রতিজ্ঞার আর-একটা আওয়াজ শোনা যায়—মল্লিকার বিয়ে হবে। কিন্তু সাবধান, যোগেশদা যেন ঘরের ভিতর থেকে এক পা'ও বাইরে না দেন।

ঘরের বাইরে এক-পা বাড়িয়ে দেবার আর ইচ্ছা নেই, শক্তিও নেই যোগেশবাবুর। শুধু চারুমামা নন, রামবাবু, বিজয় আর রত্নেশ্বর; পাড়ার মানুষের মধ্যে যারা তিনজন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে আজকের উৎসবের কাজে এতক্ষণ ধরে খাটছিল, তারাও যোগেশবাবুকে গঞ্জনা দিতে ছাড়েনি। —না হয় মেয়ের বিয়ে না-ই হত; আপনি এরকম একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে মল্লিকার মত বয়সের মেয়েকে গছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন কেন? কোন প্রাণে? কী দেখে?

কোন উত্তর দেন নি, দিতে পারেন নি যোগেশবাবু।

রামবাবু, বিজয় আর রত্নেশ্বরের সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করেন চারুমামা। তার পর চারজনেই একসঙ্গে যেন বাইরে কোথাও যাবার জন্য একসঙ্গে চলতে থাকেন।

কিন্তু যাবার আগে আর-একবার চেঁচিয়ে হাঁক দেন চারুমামা। —শানাই বাজতে থাকুক। থামলে কেন, এই শানাইওয়ালা?

দাওয়ার উপর পাড়ার মহিলাদের ভীরু-ভীরু আর কুণ্ঠিত একটা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চারু মামা বলেন—আপনারা ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না ছোড়দি।

ছেলেপিলেদের হতাশ ভিড়টার দিকে তাকিয়ে বলেন।—তোরা একটু দৌড়দৌড়ি কর না কেন?

উৎসবের ফোটা ফুল আর ঝরে পড়তে পারলো না। আলো জ্বলে, শানাই বাজে, ছেলেপিলেরা ছুটোছুটি করে। সাজানো বরণডালার চারদিকে ঘিরে বসে বসে গল্প করেন মহিলারা।—তবে কার সঙ্গে বিয়ে হবে মেয়েটার?

মল্লিকার মা করুণভাবে হাসেন—ভগবান জানেন। চারু তো জোর গলা করে বলে গেল, ভাল ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হবে।

ননীকাকা কোথায়? পঞ্চাশেরও বেশি বিয়েতে বর বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করবার অভিজ্ঞতা যাঁর আছে, তিনি এখন কি করছেন? তাঁর আর করবারই বা কি আছে?

ননীকাকার অভিজ্ঞতার গর্বটা এমন বিপন্ন হয়নি কোনদিন। অভ্যর্থনা করবার ডিউটি নয়, তুচ্ছ করে সরিয়ে আর ফিরিয়ে দেবার ডিউটি। এ বিয়ে হবে না, পাত্রকে দেখে কেউ পছন্দ করতে পারেনি, এ বয়সের মানুষের সঙ্গে ওবয়েসের মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত নয়, হতে পারে না। বর বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে কথাগুলি স্পষ্ট করে শুনিয়ে দেবার ভার পড়েছে ননীকাকার উপর। ননীকাকাও স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিতে একটুও দেরি করেনি।

ঐ তো, সবশুদ্ধ মাত্র সাতজন। অনিরুদ্ধ রায়, তিনজন নিতান্ত অল্পবয়সের খুড়তুতো ভাই, দশ বছর বয়সের একটি খুকী ভাইঝি, এক বৃদ্ধ পুরুত ঠাকুর আর একটা চাকর।

উৎসবের এই বাড়ি থেকে একটু দূরে রামবাবুর বাড়ির বৈঠকখানায় ওদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখনও সেখানে বসেই আছে ওরা। আর ননীকাকা এখনও সেখানেই আছেন।

শানাই বেজে বেজে দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল; তার মধ্যে রাত সাড়ে আটটার লগ্নটাও পার হয়ে গেল।

মীরা আর ধরা যতই পীড়াপীড়ি করুক, বসে বসে আর গল্প করতে পারে না মল্লিকা। অনেক চেষ্টা করেও মল্লিকাকে ওরা আর হাসাতে পারেনি। মেঝের মাদুরের উপর শুয়ে পড়েছে মল্লিকা। ঘুমিয়েই পড়েছে বোধ হয়। ধরাচুড়া পরে এভাবে অপেক্ষা করবার লজ্জাটা যে ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণটাকে কাঁটার মত বিঁধে বিঁধে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই শান্তি। মীরা আর ধরা চুপ করে বসে আর মুখ কালো করে মল্লিকার মাথায় পাখার বাতাস দিতে থাকে।

বরণডালা সাজাবার দায় মহিলাদের কাছে সঁপে দিয়ে মা আর জেঠিমা দুজনেই উঠে এসেছেন। এই ঘরের দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে আঙিনার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভগবান জানেন, কোথায় গিয়েছে চারু। দুর্ভাগ্যের অন্ধকার হাতড়ে কোথা থেকে যে সৌভাগ্যের খবর নিয়ে আসবে, কখনই বা আসবে, কে জানে! মিছিমিছি মেয়েটাকে মিথ্যে আশা দিয়ে শান্ত করবার দরকার ছিল না। এর পরও

যদি মেয়েটার আশার অপমান হয়, তবে বে...।

চারুই যে আসছে মনে হচ্ছে।

জেঠিমা বলেন—হ্যাঁ, রামবাবুও তো আসছেন। রত্নেশ্বরও আসছে, বিজয় কিন্তু ওদিকে চলে গেল!

একঘেয়ে শানাই-বাজা উৎসবের প্রাণটা এতক্ষণের অপেক্ষার ক্লান্তি ঠেলে দিয়ে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। চারুমামা ব্যস্ত-ভাবে হেঁটে এসে একেবারে মল্লিকারই ঘরের দরজার কাছে এসে থামেন ও হাঁপ ছাড়েন। —কোন চিন্তা নেই; ভাল খবর।

আমতলা হাটের যেখানে বড় বড় বাড়ি আর ভাল-ভাল রাস্তা নিয়ে একটা সৌখীন শহুরে উপনিবেশের রূপ গড়ে উঠেছে, সেখানে গিয়েছিলেন চারুমামা।

আজই যে ছেলেটি চারুমামার সঙ্গে কলকাতা থেকে একই ট্রেনের একই কামরায় আমতলা হাটে এসেছে, তারই সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে আর কথা নিয়ে ফিরে এসেছেন চারুমামা।

চারুমামারই ছাত্র মিহির। আমতলা হাটের মিত্রভবন হলো মিহিরেরই মামা-বাড়ি। আইন পাশ করে এক সাহেব কোম্পানির মাইনে করা উপদেষ্টা হয়েছে মিহির।

—কিন্তু ছেলে কত মাইনে পায়? জিজ্ঞেস করেন জেঠিমা।

—আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না, কত পায়? সাড়ে সাতশো টাকা।

চারুমামার আনন্দটা একটা মাত্রাছাড়া রকমের আনন্দ হয়ে গিয়েছে; তাই সে আনন্দের গর্বটা জেঠিমাকে শুনিয়ে দিতে গিয়ে চারুমামার কথাগুলিও মাত্রাছাড়া রকমের কঠোর হয়ে যায়।

মল্লিকার মা একটু ভয়ে-ভয়ে বিড়বিড় করেন।—বয়স কত?

—বয়স বত্রিশ। আমার হাবুলের চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। দেখলে মনে হবে পঁচিশ।

রামবাবুর স্ত্রী বলেন—ছেলের বাপ-মা কিছুই জানতে পেলেন না, অথচ ছেলে এদিকে হঠাৎ একটা বিয়ে করে...।

—সে সমস্যা নেই। ছেলের বাপ-মা বেঁচে নেই। আপনার জন বলতে আছেন ঐ মিত্রভবনের মামা নরেশবাবু। আমি তাঁরও সম্মতি নিয়ে এসেছি।

মা আর জেঠিমা, মীরা আর ধরা, রামবাবুর স্ত্রী আর পাড়ার আর-সব মহিলার বিস্মিত বিচলিত ও হর্ষোৎফুল্ল মুখগুলির দিকে তাকিয়ে চারুমামা যেন এই গরিব বাড়ির আশার অতিরিক্ত একটা প্রাপ্তির বার্তা নিবেদন করতে থাকেন।

—যোগেশদার ভুলের কথা বলেছি; শুনে রাগ করেছে মিহির। যোগেশদার অবস্থার কথা বলেছি, শুনে মিহিরের মুখটা করুণ হয়ে গিয়েছে। মল্লিকার কথাও সব বলে দিয়েছি, একটুও বাড়িয়ে বলিনি, একটুও কমিয়ে বলিনি। মেয়ে লেখা-পড়া ভাল জানে না, বয়সটাও ত্রিশ, আর দেখতে বেশ সুন্দর; ভাল-মন্দ সবই বলে দিয়েছি। শুনে লজ্জা পেয়েছে, হেসেও ফেলেছে মিহির। মিহিরের কথা হলো, যদি আমাদের মল্লিকার আপত্তি না থাকে, তবে তারও আপত্তি নেই।

ধরা আর মীরার চোখ দুটো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মল্লিকার কানের কাছে ফিসফিস করে দুজনে—উঠে বসো মল্লিকাদি।

চারুমামাও তাড়া দিয়ে বলেন—উঠে বস মল্লিকা।

ধরা আর মীরার দিকে তাকিয়ে বলেন—মিহির তোদের বাবার চেয়েও ফরসা। কী সুন্দর সুশ্রী চেহারা। তা ছাড়া, রেকর্ডে তোদের ওস্তাদ বাবার গলার গানও তো শুনেছি; মিহিরের গলার গান তার চেয়েও ভাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আর মল্লিকার শুয়ে পড়ে থাকা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থেকে চারুমামার চোখের আনন্দটা ছলছল করে ওঠে।—নির্বন্ধ কেউ খণ্ডাতে পারে না।

উঠে বসে মল্লিকা। চারুমামার মুখের দিকে আস্তে আস্তে তাকায়, আর তাকাতে গিয়ে চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়।

মল্লিকার চোখে যেন একটা বিস্ময়ের স্নেহ চিকচিক করছে। এ কী অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন চারুমামা? যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মল্লিকা, রূপে গুণে চমৎকার এত বড় একটা করুণা আজকের অভিশাপের অন্ধকারটার এত কাছে লুকিয়ে ছিল? এ কি সম্ভব! মল্লিকা নামে একটা অচেনা জীবনের উৎসবটা বিপন্ন হয়েছে, ব্যথিত আশা আর্তনাদ করে উঠেছে, শুনতে পেয়েই ছুটে আসতে চেয়েছে মিহির নামে একটি উদার প্রাণ।

যেন শানাই-বাজা রাত্রিটার মায়ারাগিনীর একটা গমক এতক্ষণে মল্লিকার কানের কাছে এসে পৌঁছেছে। দুঃসহ অভিমানে স্তব্ধ হয়ে ছিল মল্লিকার যে ঠোঁট দুটি, সেই ঠোঁট দুটিরই ফাঁকে ঝিরঝির করছে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির হাসি।

চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—হ্যাঁ, এবার কেউ গিয়ে পারুলকে জাগিয়ে দিয়ে ডেকে নিয়ে আসুক। মল্লিকাকে একটু ভাল করে সাজিয়ে দিক। আর দেরি করা চলে না। আর...।

আঙিনার দিকে তাকিয়ে চারুমামা আরও ব্যস্তভাবে বলেন—এইবার বিজয় আর রত্নেশ্বর চলে যাক। মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসুক ওরা। রাত এগারটার লগ্ন যেন আবার পার না হয়ে যায়। হ্যাঁ...।

একটু থেমে গিয়ে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে চারুমামা বলেন—হ্যাঁ, তার আগে একবার স্পষ্ট করে জেনে নিই। তোর কোন অপছন্দ নেই তো মল্লিকা? স্পষ্ট করে বল।

উত্তর দেবারই জন্য মুখ তুলে চারুমামার দিকে তাকায় মল্লিকা। একটা বিস্মিত সুস্মিত মুখ। চন্দনের লবঙ্গ-তিলক জ্বলজ্বল করছে। চারুমামা যদি এখনও স্পষ্ট করে কিছু না বুঝে থাকেন, তবে স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই ভাল। স্পষ্ট করে বলে দেবার জন্য মল্লিকার ঠোঁট দুটো সব মিথ্যা কুণ্ঠার বাধা জয় করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে।

কিন্তু বলা আর হলো না। ঘরে ঢুকলেন ননীকাকা।

চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—এতক্ষণে তোমার দেখা পাওয়া গেল? কোথায় ডুব দিয়েছিলে তুমি?

ননীকাকা হাসেন—আমি আমার ডিউটি করছিলাম।

—তার মানে? ওরা কি এখনও চলে যায়নি?

—না।

—কেন?

—বললে, রাত করে এখন আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। স্টেশনে একটা শেডও নেই। তা ছাড়া স্টেশনটাও তো কম দূরে নয়। সকাল হলেই চলে যাবে।

—এ কিন্তু বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে ননী। ওরা কি এখনো শোনেনি যে, অন্য একটি ছেলের সঙ্গে এ বাড়ির মেয়ের বিয়ে আজই হয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, বিজয় গিয়ে সে কথাও বলে দিয়েছে।

—তারপর?

—ওরা বলছে, ধরুন না, আমরা কন্যাপক্ষেরই লোক; আমরাও না হয় বিয়ে দেখবো; তাতে দোষ কি?

—ছোকরাগুলো বলেছে বোধ হয়?

—না। বলতে গিয়ে ননীকাকা হেসে ফেলেন।—অনিরুদ্ধবাবু বললেন।

—অনিরুদ্ধও কি বিয়ে দেখতে চায়?

—হ্যাঁ; যদি আমাদের আপত্তি না থাকে, তবে অনিরুদ্ধবাবুরও আপত্তি নেই।

—বাঃ, এ তো বড় মজার উপদ্রব?

—সত্যি কথা বলতে গেলে, কোন উপদ্রবই ওরা করেনি। ওরাই ভয় পেয়েছে আর হতভম্ব হয়ে গিয়েছে; অনিরুদ্ধবাবু অবশ্য বেশ ঠিক আছেন। অদ্ভুত!

—আশীর্বাদটা ফেরত দেওয়া হয়েছে?

—ফেরত দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফেরত নিতে রাজি হচ্ছে না।

—তার মানে? তিনভরির সোনার গয়নাটা ফেরত নেবে না?

—তাই তো বলছেন; আশীর্বাদ ফেরত নেওয়া নাকি উচিত নয়। তবে আমরা যদি নেহাতই ফেরত দিই, তাহলে ফেরত নেবে।

—ওদের চা-টা খাবার-টাবার কিছু দেওয়া হয়েছে তো?

—ওসব কর্তব্য কি আমাকে শেখাবার দরকার হয়? সবই সেধেছিলাম, কিন্তু কেউ খেতে রাজি হলো না।

ননীকাকা যেন একটা অদ্ভুত আশ্চর্য-দেশের গল্প শোনাচ্ছেন, যেখানে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। অনিরুদ্ধের সঙ্গে যারা এসেছে, তারা কেউ চা-খাবার খেতে রাজি হয়নি, এমন কি চাকরটাও না। চা খেয়েছেন শুধু একজন, অনিরুদ্ধবাবু। বেশ হেসে-হেসে আর ননীকাকার সঙ্গে গল্প করে করে চা খেয়েছেন।

এ-বাড়ির মানুষ এ-বিয়েতে রাজি নয়, বিয়ে হবে না; খবরটা শুনে শুধু এক মিনিট মাত্র গম্ভীর হয়ে ছিলেন অনিরুদ্ধবাবু। তারপরেই হেসে হেসে বললেন—আমরা কি তাহলে এখনই চলে যাব?

ননীকাকা—আপনারা বুঝে দেখুন। যদি মনে করেন যে, অসুবিধে হচ্ছে, তবে...।

অনিরুদ্ধ—আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। ভয় হচ্ছে, আপনাদের অসুবিধে হতে পারে।

ননীকাকা—আমাদের আর কি এমন অসুবিধে হবে, দুটি ডাল-ভাত খাবেন আর...।

অনিরুদ্ধ—না না; আপনাদের ওপর ওসব কোন উপদ্রব আমরা করবো না। শুধু আজকের রাতটুকুর মত থেকে যেতে চাই। বুঝছেনই তো, সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে, এতটা পথ ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টের ব্যাপার হবে। তা ছাড়া, বুড়ো মানুষ পুরুত মশাইও বড় ক্লান্ত।

ননীকাকা—অগত্যা...তাহলে কি...।

ননীকাকা একেবারে স্পষ্ট করে আপত্তির কথাটা বলতে পারছেন না। বললে যেন একটু বেশি কঠোরতা করা হবে। তা ছাড়া, এত ভয় পেয়েছে আর হতভম্ব হয়ে গিয়েছে যারা, তাদের উপর বেশি কড়াকড়ি করবার কোন দরকারও হয় না।

—অগত্যা, আমি তবে বাড়ির লোকের কাছ থেকে একটু স্পষ্ট করে জেনে আসি। তার আগে আমি তো আপনাদের কোন কথা দিতে পারছি না। ননীকাকা একটু কুণ্ঠিতভাবে কথা বলেন।

অনিরুদ্ধ কিন্তু খুশি হয়ে বলেন—হ্যাঁ, তাই উচিত। ওঁদের যদি কোন অসুবিধে হয়, তবে আমরা এখনই চলে যাব।

উঠেই আসছিলেন ননীকাকা, কিন্তু হঠাৎ কি-ভেবে একটু থমকে গিয়ে প্রশ্ন করে ফেললেন—আচ্ছা, একটা কথা বলবেন?

—বলুন, কি বলবো?

—এই বয়সে আপনার বিয়ে করবার ইচ্ছে কেন হলো?

—ইচ্ছে হলো, এই মাত্র বলতে পারি।

ননীকাকা চোখ কুঁচকে নিয়ে বলেন, জিজ্ঞেস করছি; কেন ইচ্ছে হলো?

অনিরুদ্ধ রায় চোখ বড় করে হাসল—যেজন্য ইচ্ছে হয়, সেইজন্য ইচ্ছে হলো।

—কিন্তু যোগেশদার মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছে কেন? অন্য আরও কত মেয়ে তো আছে।

—যোগেশবাবুর মেয়ের চেয়ে সুন্দর মেয়ে আছে কি? আমার তো মনে হয় না।

—কিন্তু আপনার এ সন্দেহ হয়নি কেন যে, মেয়ে আপনাকে অপছন্দ করতে পারে?

—সন্দেহ হয়েছিল বইকি।

—তবে।

—ভেবেছিলাম, বিয়ের পর ক্ষমা চাইলেই চলে যাবে।

—তার মানে?

—তার মানে আপনাদের মেয়ে আমাকে ক্ষমা করে পছন্দ করে নেবে।

—এসব কথা আমার কাছেও বলতে কি আপনার...।

—না, কোন লজ্জা নেই। আপনি যখন জিজ্ঞেস করতে কোন লজ্জা বোধ করলেন না, তখন আমিই বা কেন...। তেমনি শান্ত অবিচল ও নির্বিকার একটা মনের খুশির আবেগে হেসে হেসে কথা বলে অনিরুদ্ধ।

—যাক গে, এসব তর্কের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। আপনি কি সত্যিই মল্লিকার বিয়েটা দেখবেন?

—বলেছি তো, আপনারা যদি আপত্তি না করেন, তবে আমার কোন আপত্তি নেই।

—আপনার একটুও অস্বস্তি হবে না?

—একটুও না।

—কেন?

—একজন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে যোগেশবাবুর মেয়ের বিয়ে হবে, এতে আমার তো অস্বস্তি বোধ করবার কিছু নেই।

—কোন দুঃখ?

—আপনাদের মেয়ে যদি ক্ষুণ্ণ না হয়, আর যদি সত্যিই বিশ্বাস করে যে, আমি খুশি হয়েই তার বিয়ে দেখছি; তবে আমার কোন দুঃখ নেই।

—যদি মেয়ে সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়?

—তাহলে বড় ভুল করবে আপনাদের মেয়ে। আমরা কাউকে ঠাট্টা করতে পারি না; আমরা সত্যিই খুশি হয়েছি ননীবাবু, আপনাদের মেয়েকে একটা অপছন্দ বিয়ের দুঃখ সহ্য করতে হলো না।

—কিন্তু মনে হচ্ছে, এরা খুব দুঃখিত হয়েছে।

—কারা?

—এই সব ছেলেরা, ঐ মেয়েটি আর এই সব যারা আপনার সঙ্গে এসেছে।

—এদের দুঃখ আমার বিয়েটা হলো না বলে। আপনাদের মেয়ের বিয়ে হবে শুনে এরা দুঃখিত নয়।

—কিন্তু এরা খেলো না কেন?

—সে জন্যে দুঃখ করবেন না।

—খুকিটির তো এতক্ষণে খুব খিদে পাওয়ার কথা।

—খিদে পেয়েছে হয়তো।

—তবু খেতে রাজি হবে কি?

—রাজি হবে না। যেতে দিন ওসব সাধাসাধির ঝঞ্ঝাট।

—কিন্তু...।

—কি?

—সব দোষ তো আপনার উপর চাপাতে পারছি না অনিরুদ্ধবাবু।

—কেন? হো হো ক'রে হেসে ওঠে অনিরুদ্ধ।

—যোগেশদা তো সব জেনে শুনেই এই বিয়ে ঠিক করেছিলেন। প্রথম দোষ আর আসল দোষ তো যোগেশদার।

—আঃ, কি যে বলেন ননীবাবু। একবার বুঝে দেখুন, সামান্য অবস্থার এক ভদ্রলোক, যার পক্ষে সংসারের সামান্য দাবী মেটানও কত কষ্টসাধ্য, সে ভদ্রলোক মেয়েকে ভাল পাত্রের হাতে দেবার মত এক গাদা টাকা কোথা থেকে পাবেন? ভাল-মন্দ পাত্র বাছাবাছি করতে পারেন, যোগেশবাবুর মনের অবস্থাটাও তো এমন নয়।

—যাই হোক, উনিই তো আপনাকে পছন্দ করেছিলেন।

—ঠিক কথা। আর সত্যি কথা, আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম, কি দেখে উনি আমাকে পছন্দ করলেন?

—আপনি একথা যোগেশদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কি বললেন যোগেশদা?

—বললেন, আমি নাকি চমৎকার মানুষ। বলতে বলতে অনিরুদ্ধ রায়ের দু' চোখ থেকে অদ্ভুত একটা হাসির আভা ঠিকরে পড়ে; যেন আগুন-লাগা লজ্জার আভা।

কিন্তু মুখটাকে তেমনই একটা শান্ত-সরল খুশির আবেগে হাসিয়ে দিয়ে বলেন—বলিহারি যোগেশবাবুর ধারণা।

কত স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে কথা বলছেন ভদ্রলোক, বেহালার এই অনিরুদ্ধবাবু? যেন একটা বৈঠকী আসরে অন্য কোন মানুষের জীবনের গল্প বলে যাচ্ছেন। সে গল্পের সঙ্গে এই অনিরুদ্ধবাবুর জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

ননীকাকা অপ্রস্তুত আনমনার মত বিড়-বিড় করেন—তবু ভাবতে একটু দুঃখ হচ্ছে যে...।

—ছি ছি; আপনারা একটুও দুঃখ করবেন না, ননীবাবু। বলতে গিয়ে ননীকাকার হাত ধরে ফেলেন অনিরুদ্ধ রায়।

এখানে যে-ঘরের ভিতরে একটা নীরব কৌতূহলের আসরে, যেখানে ননীকাকা এতক্ষণ ধরে গল্প বলে যাচ্ছেন, সে ঘরের সঙ্গেও অনিরুদ্ধ রায়ের এখন আর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু গল্প-বলা অনিরুদ্ধ রায়ের হাসিটার সঙ্গে যেন একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। নীরব ঘরের মনে কেমন-যেন একটা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে হাসির এই নীরব শব্দটা। তা না হলে, নিতান্ত একটা হাসির গল্প শুনে এত গম্ভীর হয়ে যাবেন কেন মা আর জেঠিমা; এমন-কি চারুমামাও?

দেখতে আরও অদ্ভুত, মল্লিকার কপালে চন্দনের জলজলে লবঙ্গগাতিলকও কেমন যেন থমথমে হয়ে গিয়েছে।

ননীকাকার মুখটাও কেমন যেন, বেশ একটু বিষণ্ণ। ননীকাকার কৃতিত্বের পুরনো রেকর্ডটাই বোধ হয় বিষণ্ণ হয়েছে। জীবনে এই প্রথম, বর বরপক্ষ আর বর-যাত্রীকে আদর-আপ্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। বরং অনাদর-করা বরপক্ষই খুশি হয়েছে। এটা যে গর্বহারা অকৃতিত্বেরই প্রথম রেকর্ড।

জোরে একবার কেশে, গলার ভিতরের একটা বোবা গুমোট জোর করে পরিষ্কার করে নিয়ে চারুমামা এইবার চেঁচিয়ে ওঠেন।—তুমি কিন্তু মিছিমিছি ওখানে বসে এতটা সময় নষ্ট করলে ননী।

ননীকাকা হাসেন।—তা তো করেছি। যাই হোক, এখন শুধু ওদের...।

চারুমামা—না, এখন ওখানে তোমার আর কোন কাজ নেই। এখন শুধু এদিকে...।

ননীকাকা—ওখানে একটা কাজ এখনও আছে বলেই তো বলছি।

—কি কাজ?

—আপনারা বলুন, ওরা এখন ওখানে থাকবে, না চলে যাবে? থাকলে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না তো? সেটাই ওরা জানতে চায়।

—যদি বলি অসুবিধে হবে?

—তবে ওরা চলে যাবে।

—তবে বলে দাও, অসুবিধে আছে।

—মামা! চারুমামার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে, আর অদ্ভুত রকমের একটা আর্তনাদের মত স্বরে ডাক দিয়ে ফেলেছে মল্লিকা।

চারুমামা অপ্রস্তুতের মত কুণ্ঠিতভাবে বলেন।—হ্যাঁ...মিছিমিছি কথায় কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। মিহিরকে আনবার জন্যে বিজয়কে এখনই রওনা করিয়ে দিই।

মল্লিকা—না।

—রাত্রি বারটা তিরিশেও একটা লগ্ন আছে।

—না।

—না মানে কি? মিহিরকে কেউ ডাকতে যাবে না?

—না।

—তার মানে মিহিরকেও পছন্দ হয় না?

—না।

—আশ্চর্য; তাহলে বিয়ে হবে না?

—হবে।

—কার সঙ্গে হবে?

—যে এসেছে তারই সঙ্গে হবে।

—কেন?

ননীকাকাই হঠাৎ চিৎকার করে হেসে উঠে চারুমামার বিস্মিত কেন'র একটা উত্তর দিয়ে দেন।—অনিরুদ্ধবাবু চমৎকার মানুষ।

—আর মিহির বুঝি একটা...।

কথাটা শেষ না ক'রে মল্লিকারই মুখের দিকে তাকিয়ে চারুমামা একটা রুষ্ট ও বিরক্ত ভ্রূভঙ্গী হানেন—কি রে, তুই কি বুঝলি বল? মিহির বুঝি একটা বাজে...।

মুখ ফিরিয়ে, দেয়ালের গায়ে কপাল ঠেকিয়ে দিয়ে আর ছটফট করে ফুঁপিয়ে ওঠে মল্লিকা—না মামা, মিহিরবাবু নিশ্চয় একজন চমৎকার রূপ গুণ আর দয়া, কোন সন্দেহ নেই...কিন্তু।

—যাক, বুঝেছি, আর কিন্তু-কিন্তু করতে হবে না। চারুমামা যেন শ্রান্ত স্বরে একটা ধমক দিয়ে তাঁর শেষ আক্ষেপের প্রাণটাকেই দমিয়ে দিলেন।—যাও বিজয়, আমার হয়ে মিহিরকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বলে দিয়ে এস...মল্লিকা যা বলেছে তাই বলে দিয়ে চলে এস।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ননীকাকা। এতক্ষণে যেন কৃতিত্বের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবার চান্স পেয়ে গিয়েছেন। ননীকাকারই চিৎকারের হাসিতে উৎসবটা এইবার উতলা হয়ে উঠতে থাকে।—তাহলে আমি এবার আমার ডিউটিতে লেগে যাই, ছোট বউদি।

রামবাবুর স্ত্রীও আর চুপ করে থাকতে না পেরে উলু দিতে শুরু করে দিয়েছেন।

আর, ওঘরের ভিতর থেকে, এতক্ষণের বোবা ও বধিরদশার একটা বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আঙিনার উপর এসে যোগেশবাবু বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন—আমি তো-এই কথাই বলেছিলাম, অনিরুদ্ধ চমৎকার মানুষ। মিথ্যে বলেছিলাম কি?

জেঠিমা হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন—সে মানুষটাও তো মিথ্যে বলে যায়নি। মল্লি যাকে পছন্দ করবে, তারই সঙ্গে বিয়ে হবে। তাই তো হলো।

চারুমামার গম্ভীর মুখটাও হঠাৎ হেসে ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে।—বেশ হলো।... এবার তোরা কেউ একজন গিয়ে পারুলকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে তোল। মেয়েটার বিশ্রী খোঁপাটাকে জুঁই-এর কুঁড়ির মালা দিয়ে বেশ করে......।

সারা রাত
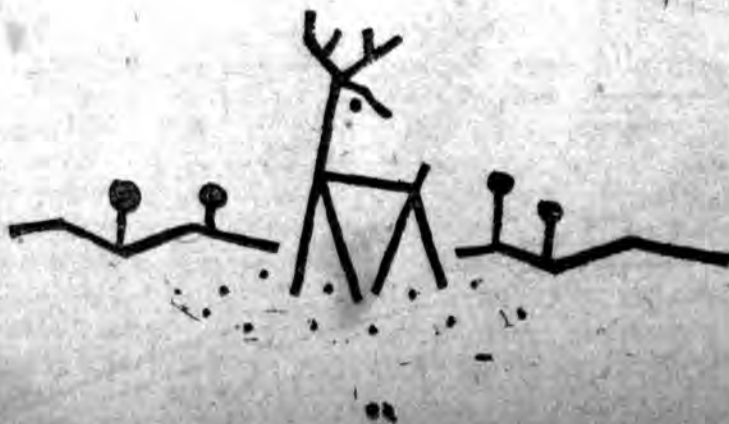
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছেলেটা মানুষ হল না। অথচ এই ছেলেটাকে মানুষ করবার জন্যই তার কলকাতায় আসা।

পাড়া প্রতিবেশী হিতৈষী যে দু-চারজন ছিল, সবাই বলেছিল সেই এক কথা। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও ত শহরে যাও। তাই সে তার পাঁচ বছরের ছেলে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল শহরের সেরা শহর—কলকাতায়।

আজ সেই ছেলে তার পঁচিশ বছরের যুবক।

এই কুড়িটি বছর ধরে কীই-না সে করেছে ছেলের জন্যে?

বিমলা ব্রাহ্মণের বিধবা। প্রথম যখন সে কলকাতায় এসেছিল, দেহে স্বাস্থ্য ছিল, সৌন্দর্য ছিল। বড় লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ জুটিয়ে নিতে তার দেরি হয়নি।

নিজে রান্নার কাজ করেছে, আর ছেলেকে দিয়েছে ইস্কুলে।

বাবুদের বাড়ির ছেলের সঙ্গে শঙ্কর লেখাপড়া শিখছে। গর্বে আনন্দে মায়ের বুক দশহাত হয়ে গিয়েছে। ছেলেকে কোলের কাছে টেনে এনে রাত্রে শুয়ে শুয়ে কত কথা শিখিয়েছে তাকে। বলেছে, "তুমি লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, তার পর যাবে তোমার গ্রামে। বর্ধমান জেলার ময়নাবুনি গ্রামে তোমার সব আছে। বাড়ি আছে, জমি আছে, পুকুর আছে, বাগান আছে, তোমার অভাব কিছু নেই। কিন্তু সে-সব তোমাকে উদ্ধার করতে হবে।"

শঙ্কর তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। জিজ্ঞাসা করেছে, "উদ্ধার কী মা?"

বিমলা বিপদে পড়েছে। উদ্ধার কথাটার মানে নিজেও সে ঠিকমত বোঝাতে পারেনি। বলেছে, "তোমার এক কাকা আছে সেখানে। ভারী বজ্জাত। তোমার বাবার জিনিস, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে নানারকম কৌশল করে নিজে নিয়ে নিয়েছে। তোমার সেই কাকাকে জব্দ করতে হবে। তোমার নিজের জিনিস—আবার তোমাকে কেড়ে নিতে হবে।"

এতক্ষণ পরে শঙ্কর উৎসাহিত হয়েছে। বলেছে, "ঠিক কেড়ে নেব, তুমি দেখ। মেরে কেড়ে নেব।"

বিমলা ম্লান একটু হেসেছে শুধু।

ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া হয়েছে। শঙ্কর কাঁদতে কাঁদতে এসে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়েছে মায়ের কোলের উপর।

বিমলা কিছুতেই তাকে থামাতে পারে না! "চুপ কর্ বাবা, ছি, কাঁদতে নেই। কী হয়েছে বল্ না।"

শঙ্কর বলে না কিছুতেই। শুধু ফুলে ফুলে কাঁদে।

ওদিকে উনোনে দুধ চড়ানো রয়েছে। এক্ষুনি দিয়ে আসতে হবে গিন্নি-মার কাছে। ছেলেকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

বিমলা বাধ্য হয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে উনোনের কাছে এগিয়ে গিয়েছে।

শঙ্কর এতক্ষণে কথা বলেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, "আমাকে রাঁধুনী-বামুনীর ছেলে কেন বলবে?"

দুধটা নামাতে নামাতে বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কে বলেছে?"

শঙ্কর বললে, "রনা।"

"ও রে চুপ্ চুপ্, রনা বলিসনি, রণেন বলবি। ও যে বড়বাবুর ছেলে।"

শঙ্কর বললে, "না, বলবে না! আমি বলেছিলাম আমি তোদেরই মত বড়লোকের ছেলে। রনা আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে দিয়ে বললে, 'যাঃ, রাঁধুনী-বামুনীর ছেলে—বলে কিনা বড়লোকের ছেলে!'"

"ওরা কেমন করে জানবে বাবা? বস, আমি দুধটা দিয়ে আসি।"

বাঁহাতের উপর কাপড় দিয়ে বসানো গরম দুধের বাটি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে খালি খালি চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে বিমলার। ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে গিয়ে সে আবার আর-এক বিপদ! গরম দুধ হাতের উপর ছলকে পড়ে আর-কি!

কথাটা তাকে না বললেই হত! কিন্তু না বলেই বা থাকে কেমন করে? এই সংকল্প নিয়েই যে সে বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে!

এমনি সব ছোট-খাটো কত কথা মনে হয় বিমলার।

কত চেষ্টা করেছে সে ছেলেটাকে ভাল করে পড়াবার। বইয়ের অভাবে পাছে তার পড়ার ক্ষতি হয়, তাই প্রত্যেকটি বই সে কিনে দিয়েছে। গিন্নীমার কাছে কেঁদেকেটে বইএর দাম আদায় করেছে। হেডমাস্টারের কাছে নিজে গিয়েছে। ইস্কুলের সেক্রেটারির পা-দুটো জড়িয়ে ধরেছে। গরিবের ছেলে বলে মাইনে পর্যন্ত দিতে হয়নি।

ছেলে কিন্তু নিজেকে গরিব বলে কোনদিনই ভাবতে পারলে না।

তিন চারটে বাড়ি বদল করে বাগবাজারের ঘোষালদের বাড়িতে তখন সে চাকরি করে। মস্ত বড়লোক অরিন্দম ঘোষাল। ঘোষাল-গিন্নী বিমলাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। নাতিদের জামা কাপড় একটু পুরনো হয়ে গেলেই বিমলার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, নাও, তোমার ছেলেকে দিও। একটু সেলাই করে নিলেই হবে।

শঙ্কর কিন্তু সেলাই-করা পুরনো জামা-কাপড় পরবে না কিছুতেই। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

বিমলা বসে বসে কাঁদে।

শুধু জামা-কাপড় নয়, ইস্কুলও পছন্দ হয় না শঙ্করের। এ-ইস্কুলটা ভাল নয়, ওখানকার মাস্টারগুলো বজ্জাত, এখানকার ছেলেগুলো ছোটলোকের ছেলে, এমনি করে করে ক্রমাগত ইস্কুল বদলায় সে।

ইস্কুল বদলায় আর বন্ধু বদলায়।

বিমলা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "এত নতুন নতুন বন্ধু কোথায় পাচ্ছিস রে?"

শঙ্কর বলেছিল, "জোটাতে হয়।"

কম বয়সেই বেশ লায়েক হয়ে উঠল শঙ্কর।

শঙ্কর যখন ক্লাস এইটের ছাত্র, তখন হঠাৎ একদিন সে তার মাকে এসে বললে, "কাল থেকে খুব ভোরে উঠে আমি বেরিয়ে যাব। তুমি আমার জন্যে একমুঠো ছোলা ভিজিয়ে রেখ।"

বিমলা বললে, "রাখব।"

"ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে যখন আসব, তখন যদি এক'গ্লাস মিছরির শরবত দিতে পার ত খুব ভাল হয়। পারবে দিতে?"

বিমলা বললে, "খুব পারব। কিন্তু কেন বল্ দেখি? চা খাবি না?"

"না, চা আমি ছেড়ে দিলাম। কাল থেকে একটা জিমনাসিয়ামে যাব।"

বিমলা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। বলে, "সে আবার কী?"

শঙ্কর বলে, "সে-সব তুমি বুঝবে না মা।"

মার কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না।

দু-চার মাস যেতে না যেতেই দেখা যায়, শঙ্কর যেন ফন-ফন করে বেড়ে উঠছে। বুকের ছাতিটা হয়েছে চওড়া, মুখখানা হয়েছে ভরাট, গাল দুটো লাল।

বছর ফিরতে-না-ফিরতেই শঙ্করের চেহারাটা হয়ে উঠল দেখবার মত।

বিমলা তার দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর বলে, "হ্যাঁ, এমনিটি আমি চেয়েছিলাম।"

পাইকপাড়া থেকে কোন্ এক বড়লোকের ছেলে—তাকে ডাকতে আসে। ছেলেটির নাম বিমল।

শঙ্কর তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বলে, "আমি ক্লাবে যাচ্ছি।"

শঙ্কর মার কাছে এসে গল্প করে। বলে, "আমি সাইকেল চালাতে শিখলাম মা। এবার একটা সাইকেল কিনতে হবে।"

বিমলা বলে, "সে-যে অনেক টাকা দাম বাবা। কোথায় পাবি অত টাকা?"

"পাব যেখানে হক। কলকাতা শহরে টাকার ভাবনা!"

বিমলা ভাবে তার বড়লোক বন্ধু জুটেছে অনেক। তারাই দেবে হয়ত কিনে।

শেষে একদিন সত্যিই দেখা গেল, শঙ্কর একটা বাইকে চড়ে বাড়ি এল। বাইকটা তুলে রাখলে ঘরের ভিতর।

তারপর প্রায়ই দেখা যায়, সে বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সময়ে খেতে পর্যন্ত আসে না। মা তার খাবার নিয়ে বসে থাকে। বাড়ি ফেরে হয়ত সন্ধ্যের পর। মা জিজ্ঞাসা করে, "সারাটা দিন কোথায় ছিলি বাবা? খেতে পর্যন্ত এলি না, আমি এদিকে ভেবে ভেবে সারা।"

শঙ্কর বলে, "তুমি ভারী বোকা, তাই ভেবে মর। বারোটার ভেতর আমি যদি না ফিরি, নিশ্চয় জানবে আমি কোথাও খেয়ে নিয়েছি। আজকাল রাইফেল প্র্যাক্‌টিস্ করছি কিনা, তাই একটু দূরে চলে যেতে হয় বন্দুক নিয়ে। খাবার সময় অত দূর থেকে ফিরে আসা অসম্ভব।"

রোজই তার রাইফেল প্র্যাক্‌টিস্ চলতে লাগল।

রাইফেল প্র্যাক্‌টিসের পর, কী প্র্যাক্‌টিস্ সে করতে লাগল কে জানে, মা শুধু তার চেহারা দেখেই মুশ্‌গুল!

এমন দিনে বিশ্রী একটা অঘটন ঘটে গেল।

শঙ্করের বয়সী একটি নাদুসনুদুস ছেলে একদিন সকালে এসে ডাকলে, "শঙ্কর!"

বিমলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বললে, "সে ত বাড়িতে নেই বাবা।"

ছেলেটির সাজ-পোশাক দেখে মনে হল বড়লোকের ছেলে। বিমলা বললে, "একটু বস বাবা, এক্ষুনি আসবে।"

ছেলেটি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, বসবার জন্যে এগিয়েও এল না, কথাটার জবাবও দিলে না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী নাম তোমার?"

ছেলেটি বললে, "বিজন।"

বলতে বলতেই সাইকেলের ঘণ্টার আওয়াজ শুনে বিজন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে শঙ্কর আসছে।

বিমলা আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, দোরের কাছে বিস্তর লোক জড় হয়েছে। চিৎকারে গোলমালে কী হয়েছে কিছুই ভাল বুঝতে পারা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে, শঙ্কর দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সাইকেলটা আর সবাই মিলে তার উপর ঝুঁকে পড়েছে সাইকেলটা কেড়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু তারা না পারছে শঙ্করকে সেখান থেকে সরাতে, না পারছে সাইকেলটা কেড়ে নিতে।

শঙ্কর শুধু বলছে, "সরে যাও—ছেড়ে দাও তোমরা। ছেড়ে দাও বলছি!"

চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে।

বিমলা আর চুপ করে থাকতে পারলে না। মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বেরিয়ে এল দোরের কাছে। বললে, "কী হয়েছে তোমাদের?"

প্রথমে যে-ছেলেটি এসেছিল শঙ্করকে ডাকতে, সেই বিজন ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, "তোমার ছেলে আমার সাইকেল দিচ্ছে না।"

শঙ্কর বলে উঠল, "মিথ্যেবাদী! সাইকেল আমি দেব না। তুই কী করবি কর্!"

বিমলা বললে, "ছি! শঙ্কর!"

কিন্তু তার কথা ডুবিয়ে দিয়ে লোকগুলো আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। ভিড়ের ভিতর থেকে একটা লোকের গলা বেশ স্পষ্ট শোনা গেল, "রাঁধুনী-বামনীর ব্যাটার শখ দ্যাখো? সাইকেল চড়বে! দিয়ে দে ব্যাটা, সাইকেল দিয়ে দে!"

শঙ্কর এবার রুখে উঠল। বললে, "কী বললি? বাপের ব্যাটা হলে এগিয়ে আয়। এইখানে এসে বল, আমি তোর বাপের নাম যদি ভুলিয়ে দিতে না পারি ত"—

আবার চিৎকার! আবার গোলমাল!

শঙ্করের কাছে দাঁড়িয়ে কে একজন একটা অভদ্র মন্তব্য করে বসল। তাই না শুনে শঙ্কর তার পা দিয়ে তার পেটে এমন এক লাথি মারলে যে, লোকটা 'ওরে বাপ্!' বলে চিৎকার করে উলটে পড়ে গেল।

বিমলা চিৎকার করে উঠল, "শঙ্কর!"

শঙ্কর তার মার দিকে ফিরে তাকাতেই মা বললে, "ওর সাইকেল ফিরিয়ে দাও।"

শঙ্কর বললে, "তার আগে বলুক ও কেন এই এতগুলো লোক জড় করেছে।"

বিজন বললে, "ওরা যে বললে আমাদের পাঁচটা টাকা দাও, আমরা তোমার সাইকেল আদায় করে দিচ্ছি!"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "টাকা দিয়েছিস?"

বিজন তখন কেঁদে ফেলেছে।

কাঁদতে কাঁদতে বললে, "হ্যাঁ দিয়েছি।"

"কাকে দিয়েছিস?"

শঙ্কর জনতার দিকে তাকিয়ে দেখলে, লোকজন তখন পাতলা হয়ে গেছে।

বিজনও সে-লোকটিকে খুঁজে পেলে না, যে তার কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিয়েছিল।

শঙ্কর বললে, "এই নে তোর গাড়ি। ভাগ!"

বিজন তার বাইকে চড়ে চলে গেল।

তেতলার বারান্দার উপর ঝুঁকে পড়ে বাড়ির মালিক বৃদ্ধ অরিন্দম ঘোষাল আগাগোড়া দেখলেন ব্যাপারটা। দেখে তার চাকরকে ডেকে বললেন, "শঙ্করের মাকে ডেকে আন!"

শঙ্করের মা তখন শঙ্করকে নিয়ে পড়েছে। বলছে, "কই তোকে ত আর বই নিয়ে বসতে দেখি না। ইস্কুলে যাস্ কিনা তাও জানি না। পড়াশোনা কি ছেড়ে দিলি?"

চট করে কথাটার জবাব দিতে পারলে না শঙ্কর।

বাইকটা বিজনকে ফিরিয়ে দিয়ে এসে অবধি কেমন যেন মনমরা হয়ে সে বসেছিল মাথা হেঁট করে।

কথাটার জবাব দিলে না।

বিমলা বললে, "কতদিন জিজ্ঞাসা করব করব করেও আর জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। বলতে নেই—তোর চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলে গেছি।"

এমন সময় চাকর এসে খবর দিতেই বিমলা 'আসছি' বলে উপরে উঠে গেল।

উপরে যেতেই বাড়ির কর্তা বললেন, "দ্যাখো শঙ্করের মা, তোমাকে একটা কথা আজ বলা আমি দরকার মনে করছি।"

বিমলা বললে, "আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি আমার বাবা। বলুন।"

অরিন্দম বললেন, "ছেলেটির দিকে একটু নজর দাও।"

মাথা হেঁট করে রইল বিমলা। কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

অরিন্দম বললেন, "আজ যা দেখলাম, তাই দেখে আমার মনে হল, ছেলেটা বোধহয় তার শরীরের দিকেই নজর দিয়েছে একটু বেশী।"

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন, "তা দিক। শরীরটাও অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু একটু লেখাপড়া না শিখলে মনটা যে তার উপবাসী রয়ে যাবে মা।"

কারও সঙ্গে যখন তিনি কথা বলেন, তখন তার মুখের দিকে তাকাতে পারেন না, এই তাঁর স্বভাব। কথাটা শেষ করে যেই তিনি বিমলার দিকে তাকিয়েছেন, দেখলেন, বিমলা কাঁদছে।

দোরের পাশে কপাটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমলা, আর তার দু-চোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে। এইটে যে তারও মনের কথা!

অরিন্দম বললেন, "কাঁদছ কেন মা? ছেলের ত এখনও বয়েস হয়নি।"

এতক্ষণ পরে বিমলা কথা বললে। "কী করব বাবা আপনি বলে দিন!"

অরিন্দম বললেন, "কী আর করবে, একটু শাসন কর।"

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন পাশের দরজা দিয়ে।

কারও কান্না তিনি সহ্য করতে পারেন না।

নীচে নামবার সময় বিমলা একবার ঘোষাল-গিন্নীর ঘরের দিকে তাকালে। ঘরের মেঝেয় বসে বসে তিনি পান সাজছিলেন। একটা কথাও তিনি বললেন না।

বিমলা সিঁড়ির ওপর থমকে থামল। চোখ দুটো বেশ ভাল করে মুছে শঙ্করকে কী বলবে একবার ভেবে নিলে। রান্নাঘরের পাশে নিজের সেই ছোট ঘরটিতে এসে দেখলে, শঙ্কর তার গায়ের সার্টটা খুলে খাটের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে।

বিমলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। হাতকাটা সাদা গেঞ্জিটা চমৎকার মানিয়েছে শঙ্করকে। জিজ্ঞাসা করলে, "ঘুমুলি নাকি?"

তেমনি চোখ বুজেই শঙ্কর বললে, "না।"

"ইস্কুল যাওয়া কি তুই ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?"

শঙ্কর জবাব দিলে না।

বিমলা আবার ডাকলে, "শঙ্কর!"

"কী?"

"তুই কি মুখখু হয়ে থাকতে চাস্?"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

"আজকালকার দিনে লেখাপড়া শিখবি না, মুখখু হয়ে থাকবি—লোকে যে তোর সঙ্গে কথা বলবে না রে!"

শঙ্কর তেমনি শুয়ে শুয়েই বলে উঠল, "তুমি সব জান!"

বিমলা বললে, "জানি।"

শঙ্কর বললে, "বেশ বাবা বেশ, জান ত জান। চুপ কর।"

বিমলা বললে, "তাহলে তুই লেখাপড়া শিখবিনে?"

"এই কথা ওই বুড়ো বুঝি তোমাকে শিখিয়ে দিলে?"

বিমলা ছুটে তার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, "ওরে চুপ চুপ, হতভাগা এ কী হল তোর? এ কী বলছিস? ছি!"

শঙ্কর উঠে বসল। বললে, "ঠিক বলছি।"

বিমলা বললে, "আমাকে শেখাতে হবে কেন? আমি দেখতে পাচ্ছি যে! বইএর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ নেই, ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করেছিস, এমনি টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে কোনদিন মানুষ হতে পারবি, না এক পয়সা রোজগার করতে পারবি? মুখখু ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। শার্টটা গায়ে দিতে দিতে বললে, "তাহলে তাই জেন।"

"কী জানব?"

বিমলা তার কাছে এগিয়ে গেল।

"জেন যে তোমার ছেলে নেই।"

কথাটা ধক করে গিয়ে বাজল মায়ের বুকে। ডাকলে, "শঙ্কর!"

শঙ্কর তখন চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা তার পিছু পিছু এল ঘর থেকে বেরিয়ে। উঠোন পেরিয়ে খানিকটা এগিয়েও গেল, কিন্তু তাকে ফেরাতে পারলে না।

বিমলা যেই পিছন ফিরেছে, দেখলে বাড়ির বড় বউ দাঁড়িয়ে তার জানলার কাছে। আড়ি পেতে দাঁড়ানো তার স্বভাব।

তাকে কিছু বলবার ইচ্ছা বিমলার ছিল না, তবু মায়ের মন না বলে থাকতে পারলে না। বললে, "দেখলে বউমা, জোর করে দুটো কথা বলতে গেলাম ত রাগ করে পালিয়ে গেল।"

বড় বউয়ের মুখটা কেমন যেন একরকম হয়ে গেল। বললে, "খাওয়াও আরও চুরি করে করে লুকিয়ে লুকিয়ে দুধ ঘি মাছ—"

এ বলে কী? বিমলা যেন আকাশ থেকে পড়ল। এতদিন সে কাজ করছে এ-বাড়িতে, চুরি করার অপবাদ কেউ তাকে কখনও দেয়নি।

মায়ের মন, হয়ত-বা এক-আধদিন এক-আধ টুকরো বেশী মাছ, একটু ভাল খাবার ছেলেকে সে দিতে গিয়েছে, কিন্তু ছেলে তার হাঁ হাঁ করে নিষেধ করেছে। বলেছে, "তুমি কি ভেবেছ, না খেয়েই শরীরটে আমার এমনি হয়েছে! বাইরে আমি প্রচুর খাই। বন্ধুরা খাওয়ায়।"

সেদিন মাংস রান্না হয়েছিল। শঙ্করের জন্য একবাটি মাংস বিমলা তুলে রেখেছিল। কিন্তু খাবার সময় মাংসের বাটি সে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "তোমাদের এই 'রিচ্' রান্না আমি খেতে পারি না মা। মাংস যদি শুধু নুন দিয়ে সেদ্ধ করে দিতে পার ত আমি খেতে পারি।"

বিমলা বলেছিল, "সবই কি তোর আশ্চায্যি বাবা?"

শঙ্কর বলেছিল, "হাতি দেখেছ মা? বড় বড় ষাঁড়, বড় বড় বাঁদর? তারা মাছ-মাংস খায় না, তবু তাদের গায়ে কীরকম জোর। শুধু শাক আর ভাত আমি যদি ভাল করে হজম করতে পারি ত আমার আর কিছু দরকার হবে না।"

সেই শঙ্করের নামে এই দুর্নাম?

বিমলা বললে, "না বউমা, শঙ্কর আমার সেরকম ছেলেই নয়। মাছ-মাংস সে খেতেই চায় না।"

বড় বউ বললে, "থাম! কার কাছে কী কথা বলছ? ছেলে তোমার কিছু খায় না! না খেয়ে খেয়েই অমনি কুঁদো বাঘের মত ফুলছে দিন-দিন।"

ছেড়ে চলে গেল রাগ করে। মনের অবস্থা ভাল ছিল না বিমলার। বলে বসল, "বেশ, তাহলে চুরি-চামারি যে করে না, সেইরকম একজন ভাল লোক তোমরা দেখে নাও, আমি চলে যাই।"

বড় বউ বললে, "সেই কথাই ভাবছি। নইলে তোমার ওই ছেলেটি এ-বাড়িতে থাকলে আমার ছেলেরা যাবে খারাপ হয়ে।"

কথা বলতে ইচ্ছেও করে না, অথচ এই কথা শুনে কোন্ মা চুপ করে থাকতে পারে? বিমলা বললে, "আমার ছেলে ত তোমার ছেলেদের সঙ্গে মেশে না বউমা।"

বড় বউ বললে, "মেশবার দরকার হয় না। আজ যখন তোমার ছেলে সাইকেল চুরি করে ধরা পড়ল, সদর দরজায় গোলমাল শুনে

আমার ছেলেরা ছুটে যাচ্ছিল সেইখানে। আমি তাদের ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিলাম।

"আমার ছেলে চুরি করেনি বউমা।"

"না, চুরি করেনি! নিজের ছেলেটি খুব ভাল। তোমার ছেলে একটি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা।"

কথায় কথায় কথা বেড়ে গেল। বড় বউ বলতে কিছু বাকী রাখলে না। বিমলাও বললে।

বিমলা ভেবেছিল, গিন্নীমা এসে থামিয়ে দেবেন। কিন্তু থামিয়ে দেওয়া দূরের কথা, সন্ধের আগে দেখা গেল, রাঁধুনী একজন বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।

এতদিন ধরে বিমলা রয়েছে এখানে। কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে সবার উপর। এ-আশ্রয় তার নিরাপদ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু সব-কিছু গোলমাল হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

রাত্রের রান্না সকাল-সকাল করতে হয়। ছেলেরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই সেদিনও সে ঠিক সময়েই রান্না চড়ালে। ঝি চাকর যেমন সাহায্য করে তেমনি করতে লাগল। বিমলা ভাবলে, তাহলে বুঝি এটা কিছুই নয়। ওরা জবাব তাকে নিশ্চয়ই দেবে না।

বড় বউ তার ছেলেদের খাবার নিজে এসে নিয়ে যায়। সেদিন কিন্তু সে এল না। তার বদলে এল ছোট বউ। ছোট বউ গরিবের মেয়ে। সংসারের কাজকর্ম তাকেই বেশী করতে হয়। সেজন্য তার কোনও দুঃখ নেই। মুখে যেন হাসি তার লেগেই আছে।

রান্নাঘরে ঢুকেই সে হাসতে হাসতে বললে, "কই গো বামুন-মা, দিদির ছেলেদের খাবার আজ আমি নিয়ে যাব। আমার ওপর হুকুম হল।"

বিমলা বললে, "নিজেই দেখেশুনে নাও মা, আমার কিছু ভাল লাগছে না।"

ছোট বউ আবার হাসলে। বললে, "কেন বামুনমা, ভাল লাগছে না কেন বলছ? তুমি বুঝি ভাবছ তোমাকে তাড়িয়ে দেবে? তা আর দিতে হয় না! যে ঠাকুরটা এসেছিল সে মাইনে চাইলে তিরিশ টাকা, তার ওপর ডিম ছোঁবে না। কাপড় দিতে হবে বছরে চারখানা, গামছা চারখানা, চুল কাটার পয়সা মাসে ছ আনা, ধোপা চার আনা, আর পানদোক্তার জন্যে রোজ দু আনা। এই না শুনে বাবা কী বললে জান? বললে, 'ব্যাটা দুদিন বাদে একটি বউ চেয়ে বসবে। তাড়াও ওকে। তার চেয়ে শঙ্করের মা আমাদের ভালই আছে।'"

এই বলে আবার সে ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল।

বিমলার মনটা এতক্ষণ পরে যেন খানিকটা হালকা হল। জিজ্ঞাসা করলে, "কত্তাবাবু এইকথা বললেন? তুমি শুনলে?"

ছোট বউ বললে, "এই দ্যাখো, আমি মিছে কথা বলি? তুমি ত বাবার খাবার দিতে যাবে, তখন না-হয় জিজ্ঞাসা কর।"

ছোট বউ ঠিকই বলেছিল।

বড়কর্তা কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "দূর পাগলী! কে তোকে যেতে বলেছে এখান থেকে?"

বিমলার চোখ দিয়ে আবার জল এসেছিল। কথাটার জবাব দিতে পারেনি।

কিন্তু নীচে নেমে এসেই দেখে, এক বিপরীত কাণ্ড।

শঙ্কর এসেছে। এসেই জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। "ও কী রে, ওগুলো বাঁধছিস কেন?"

শঙ্কর বললে, "এক্ষুনি আমরা চলে যাব এখান থেকে।"

বিমলা বললে, "কেন রে? ওরা ত আমাকে যেতে বলেনি!"

শঙ্কর মায়ের কাছে এগিয়ে এল। বললে, "আচ্ছা মা, তোমার কি লজ্জা-ঘেন্না কিছু নেই? রনার মা তোমাকে কী বলেছে আমি শুনেছি। তুমি চোর? তুমি চুরি করে আমাকে খাওয়াও? এর পরেও বলতে চাও—তোমাকে আমি এইখানে রাখব? না, আমি এখানে থাব?"

ছেলের এই গর্বোদ্ধত আত্মসম্মানবোধ বিমলাকে যেন সব-কিছু ভুলিয়ে দিলে। বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু যাবি কোথায় বাবা?"

শঙ্কর বললে, "সেকথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে এসেছি।"

"কী ঠিক করে এসেছিস? থাকবার জায়গা?"

শঙ্কর বললে, "আবার কী ঠিক করব?"

বিমলা বললে, "খাবি কী? আমার কাজ ঠিক করেছিস?"

শঙ্কর বললে, "সে এখন দেখা যাবে। তুমি চল ত!"

বিমলা আবার জিজ্ঞাসা করলে "খাবি না?"

"আবার খাবার কথা বলছ আমাকে? আমার এক কথা। আমি এ-বাড়িতে একগ্লাস জল পর্যন্ত খাব না। তুমি খাবে ত খেয়ে নিতে পার। আমি খেয়ে এসেছি।"

বিমলা বললে, "গিন্নীমার কাছে যাই তাহলে একবার। বলে আসি।"

"হ্যাঁ তুমি যাও, আমি ততক্ষণ গাড়ি ডেকে আনি।"

এই বলে শঙ্কর বেরিয়ে গেল।

বিমলা বললে গিয়ে গিন্নিমাকে। "কী করব মা, আমার ছেলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।"

কথাটা শুনে গিন্নীমা তার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "ছেলে তোমার এরই মধ্যে এমন লায়েক হয়েছে নাকি?"

বিমলা চুপ করে রইল। অনেক দিন এ-বাড়ির অন্ন খেয়েছে বিমলা। ছেলেটা একরকম এই বাড়ি থেকেই মানুষ হয়েছে। যেতে তার কষ্টও হচ্ছে। অথচ না-গেলেও নয়।

গিন্নীমা ডাকলেন কর্তাকে।

বিমলা বললে, "ডাকতে হবে না মা, আমিই যাচ্ছি। বাবাকে প্রণাম করে আসি।"

বিমলা কর্তার ঘরে ঢুকল তাঁকে প্রণাম করবার জন্যে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললে, "আমি তাহলে আসি বাবা। আপনাদের দয়া আমি জীবনে ভুলব না।"

কর্তা অরিন্দম ঘোষাল বহুদর্শী মানুষ। বললেন, "তোমার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিয়েছ?"

বিমলা বললে, "আমার আর পাওনা কী বাবা, আপনার অনেক খেয়েছি, অনেক পেয়েছি।"

"না না তাই কি হয় কখনও? তোমার ছেলেই হয়ত লোকজনের কাছে বলে বেড়াবে—ঘোষালবাড়িতে মা আমার কাজ করত, মায়ের পাওনাটা মেরে দিলে। না তা হয় না।"

বলে তিনি তাঁর মোটা ডায়েরি বইটা খুলে বললেন, "তোমার ছেলের পৈতের সময় কালীঘাটে যাবার দিন নিয়েছিলে পঞ্চাশ টাকা। তার আগের দেনা পাওনা বিশেষ কিছু ছিল না। তারপর তিন টাকা, দু টাকা, এক টাকা, আবার পাঁচ টাকা—দাঁড়াও আমার সব লেখা আছে, আমি সব হিসেব করে দিচ্ছি।"

পেন্সিল নিয়ে তৎক্ষণাৎ হিসেব করে দিলেন তিনি। বললেন, "তোমার পাওনা হয়েছে তিরিশ টাকা সাত আনা। এই নাও।"

হাতবাক্সটি খুলে তিরিশ টাকা সাত আনা বিমলার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "কাজটা ভাল করলে বলে মনে হচ্ছে না বিমলা। ছেলে তোমার দেখতেই এইরকম বড় হয়েছে, কিন্তু বয়েস ত বেশী নয়। সেই তোমাকেই কারও বাড়িতে কাজ করে ওকে খাওয়াতে হবে। যাচ্ছ, যাও।"

টাকাকটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে বিমলা আবার একটি প্রণাম করলে কর্তাকে। তারপর গিন্নীকে প্রণাম করে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, দেখলে বড় বউ দাঁড়িয়ে আছে দোরের কাছে।

আজই দুপুরে তাকে বলতে কিছু বাকী রাখেনি এই মেয়েটি। বিমলা তবু একবার যাবার সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "চললাম বউমা।"

বড় বউ বললে, "যাও।"

বিমলা দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চট্ করে আবার তাকে থামতে হল। পিছনে শুনলে বড়বউ বলছে, "নিমকহারাম যারা, তারা এমনি করেই যায়।"

নিমকহারাম অপবাদটা বিমলার সহ্য হল না। সেও কিছু কম করেনি এদের জন্যে। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কী বললে বউমা? নিমকহারাম?"

বড়বউ কিন্তু কথাটাকে চাপা দিয়ে দিলে। বললে, "কেন যাচ্ছ তা কি জানি না? কাল সকাল থেকে তুমি আমাকে হাঁড়ি ধরাতে চাও।"

বিমলা বললে, "ছোটবৌ থাকতে তুমি আবার কখন্ হাঁড়ি ধরেছ বউমা?"

সংসারের কাজকর্ম করে ছোটবউ শাশুড়ীর মন নিয়েছে। তাই বড়বউয়ের দুচক্ষের বিষ এই ছোটবউ। অথচ তারই নাম করে বিমলা তাকে খোঁটা দিচ্ছে ভেবে বড়বউ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। শাশুড়ী সামনে যদি বসে না থাকত, ছোটবউয়ের আজ নিস্তার ছিল না। ছোট-বউকে কিছু বলতে না পেয়ে বিমলাকেই সে মোক্ষম আঘাত দিয়ে বসল। বললে, "হাঁড়ি ছোটবউ ধরবে না আমি ধরব তোমাকে সেসব দেখতে হবে না। তুমি তোমার গুণ্ডা ছেলেটিকে নিয়ে যেখানে যাচ্ছ যাও। শুধু দেখ, যেন বাসন-কোসন কিছু সরিও না।"

বিমলা গিন্নীমার দিকে তাকিয়ে বললে, "মা! শুনলেন?"

বড়বউ বললে, "রাজ্যের বাসন হেঁসেলে পড়ে রয়েছে, আমি সেইজন্যে বলছি।"

গিন্নীমা বললেন, "বড়বৌমা!"

বড়বউ থামবার মেয়ে নয়। বললে, "ওর ছেলের জন্যে একটা থালা, একটি বাটি একটা গেলাস ত ও কিনেছে। বলি যাবার সময় সেগুলো ত ও নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আরও দু-চারটে থালা গেলাস চলে যেতে পারে ত?"

বিমলা কেঁদে ফেললে। গিন্নীমার পায়ের কাছে বসে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "এতদিন আছি মা আমি তোমার বাড়িতে, তুমি জান আর ভগবান জানেন, তোমার জিনিস আমি আমার বুকে দিয়ে আগলেছি কিনা! আমার ছেলের থালা বাটি আমি এখনও তুলিনি মা, তুমি এস, তোমাকে কষ্ট করে একটিবার আসতেই হবে আমার সঙ্গে। তোমার বাড়ির একটা ছুঁচ যদি আমি নিয়ে যাই ত আমি আমার ছেলের মাথা খাই! আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়!"

এই বলে বিমলা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

গিন্নীমা বললেন, "কাঁদে না বিমলা। ছি! ওঠ্, যা!"

বিমলা ধরে বসল, "না মা, তোমাকে একটিবার আসতেই হবে। তোমার চোখের সামনে আমি বেরিয়ে যাব।"

গিন্নীমা এবার তাঁর বড়বউয়ের দিকে ফিরে বললেন, "ছি বউমা, বিমলাকে ও-কথা বলা তোমার উচিত হয়নি। আর যাই হক, ও চোর-ছ্যাঁচড় নয়।"

বড়বউ বললে, "হতেই বা কতক্ষণ মা! ছেলে যার সাইকেল চুরি করে বাড়ির সামনে কেলেঙ্কারি করতে পারে, তার মা দুটো বাসন চুরি করবে তাতে আর আশ্চর্য্যি কী?"

ঠিক এমনি সময়ে শঙ্কর এসে দাঁড়াল। বললে, "মা, নীচে যাও।"

সে যে ঠিক এই সময় এসে দাঁড়াবে কেউ তা ভাবতে পারেনি। দোরের কাছে রিক্শা দাঁড় করিয়ে সে উপরে উঠে এসেছিল কর্তা গিন্নীকে প্রণাম করবার জন্যে। মার কান্না শুনে সিঁড়ির আড়ালে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর বড়বউয়ের মন্তব্য শুনে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। রাগে তার আপাদ-মস্তক রিরি করছিল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শঙ্কর ঢিপ করে মাটিতে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম করলে গিন্নীমাকে।

গিন্নীমা বললেন, "বেঁচে থাক! মানুষ হও!"

ছেলেকে দেখে বিমলা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

শঙ্কর বড়কর্তার ঘরে ঢুকল প্রণাম করবার জন্যে। ঘোষাল-মশাই ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দেখতে পাননি শঙ্করকে। পায়ে হাত ঠেকতেই চমকে তাকালেন কাগজটা নামিয়ে। বললেন, "চললে? কোথায় যাচ্ছ?"

"গাছতলায়।"

বলেই শঙ্কর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বিমলা তখনও গিন্নীমার কাছে দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা, চল।"

বিমলা গিন্নীমাকে ডাকলে, "মা, এস।"

গিন্নীমা বললেন, "কী যা-তা বলছিস, যা।"

শঙ্কর বললে, "বড় মামীমা বড়লোক, আমরা গরিব। উনি আমাদের চোর, ডাকাত, যা খুশিই বলতে চান বলুন। তুমি এস।"

বড়বউ বললে, "শুনলে মা? ছেলেটার কথা শুনলে? আমরা বড়লোক।"

কথাটার জবাব দিলেন না গিন্নীমা। তাইতে আরও রাগ হল বড়বউয়ের। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "চোরকে চোর বলব না তো কী বলব রে ছোঁড়া?"

শঙ্কর তার মাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল বারান্দার উপর দিয়ে। বড়বউ-এর কথাটা শুনে শঙ্কর থমকে থামল। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, "মা, অনেকক্ষণ থেকে শুনছি উনি বলছেন আমরা নাকি ওঁদের বাসন চুরি করে নিয়ে যাব। তুমি এক কাজ কর মা, আমাদের বাসন বলতে ত আমার একখানা থালা, বাটি আর গ্লাস, আর তোমার একটা ঘটি। ওগুলো তুমি এইখানে রেখে যাও। বড়মামীর অনেকগুলো ছেলে, ওঁর কাজে লাগবে।"

"কী বললি?"

রেগে টং হয়ে বড়বউ চিৎকার করে এগিয়ে যাচ্ছিল শঙ্করের দিকে। কিন্তু যেতে তাকে হল না। শঙ্কর যে-ঘরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই ঘরটাই বড়বউয়ের ঘর। ঘরের দরজাটা ছিল বন্ধ। হঠাৎ সেই বন্ধ দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলো বড়বউ-এর স্বামী—অরিন্দম ঘোষালের বড়ছেলে নিবারণ ঘোষাল। খালি গা, পরনের ধুতিটা লুঙ্গির মত করে পরা, খেয়ে দেয়ে বোধকরি শুয়ে পড়েছিল সে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই সে কিন্তু এমন একটা কাজ করে বসলো—যার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই সে শঙ্করের গলাটা চেপে ধরে দেয়ালের গায়ে ঠাই করে তার মাথাটা ঠুকে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আর বলবি? যা বললি আর বলবি?"

শঙ্করও রুখে দাঁড়িয়েছিল এর জবাব দেবার জন্যে, কিন্তু যে-লোকটির সুমুখে জীবনে সে কোনদিন মুখ তুলে তাকায়নি, তাকে আঘাত সে দেবে কেমন করে?

কিছুই সে বলতে পারলে না, চোখ দিয়ে শুধু দর দর করে জল গড়িয়ে এল, আর নিবারণ তার লোহার মত সরু সরু হাত-দুটো দিয়ে বীরবিক্রমে নিরীহ সেই ছেলেটার উপর সমানে তার শক্তি পরীক্ষা করতে লাগল।

বিমলা গিন্নীমার কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "ছাড়িয়ে দিন মা, বড়বাবুকে বারণ করুন!"

বুড়ো বাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন খবরের কাগজটা

ঠিক এমনি সময়ে শঙ্কর এসে দাঁড়াল। বললে, "মা, নীচে যাও।"

হাতে নিয়ে। ছেলেকে বলতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না, তবু বললেন, "নিবারণ, ছেড়ে দে!"

নিবারণ বললে, "তুমি থাম। ওর এত বড় আস্পর্ধা—"

বলেই সে দুম করে তার একটা পা চালিয়ে দিলে শঙ্করের পিঠের উপর।

'মা' বলে যন্ত্রণায় চিৎকার করে শঙ্কর একেবারে দুমড়ে গিয়ে পড়ল ছোটবাবুর দরজার কাছে। পেটে হাত দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে, ঘরের চৌকাঠটা ধরে সে সামলে নিলে।

কিন্তু ধন্য নিবারণের রাগ! হাত দুটো বোধহয় তার ভেঙে গিয়েছিল। তাই সে আবার পা বাড়িয়ে তাকে মারতে গেল। কিন্তু লাথিটা গিয়ে পড়ল আর-একজনের পিঠে। ছোটবউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুহাত বাড়িয়ে শঙ্করকে তখন জড়িয়ে ধরেছে।

নিবারণ চেঁচিয়ে উঠল, "ছেড়ে দাও ছোটবউ।"

ছোটবউ ছাড়লেও না, জবাবও দিলে না, শঙ্করকে জড়িয়ে ধরে ভাসুরের কাছ থেকে আড়াল করে হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল, "খুব লেগেছে?"

শঙ্করের সমস্ত যন্ত্রণা যেন নিমেষেই জল হয়ে গেল। ছোট-বউয়ের মুখের দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যে-মুখে হাসি ছাড়া আর-কিছু সে কোনদিন দেখেনি, আজ দেখলে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি সহানুভূতিতে কেমন যেন করুণ হয়ে উঠেছে, আর টানা টানা বড় বড় চোখ দুটি তার জলে ছলছল করছে।

"চল।" বলে শঙ্করকে ধরে ধরে ছোটবউ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বিমলাও তাদের পিছু ধরলে।

বড়বউ বললে, "এই ছোটবউ আমাদের মুখ যদি না পুড়িয়ে দেয় ত কী বলেছি!"

কথাটা সে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছিল। ছোটবউও কথাটা শুনলে। ভেবেছিল জবাব দেবে না, কিন্তু জবাব না দিয়ে পারলে না। সিঁড়ির মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "না দিদি, অত সাহস আমার নেই। আমি গরিবের মেয়ে।"

বড় বউ দুম-দুম করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তার স্বামী তখন এক হাতে দোরের চৌকাঠ ধরে আর এক হাত কোমরে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছিল। বড়বউ বললে, "যা বলে-ছিলাম, সত্যি কিনা দ্যাখো।"

বলেই সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘোষাল-বাড়ি ছেড়ে চলে এল শঙ্কর তার মাকে নিয়ে। আসবার সময় নিজের বাসন কখানি সত্যিই সে রেখে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু ছোটবউ রাখতে দেয়নি। নিজের হাতে তাদের কাপড়ের পুঁটলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

পরিচ্ছন্ন একটি বস্তির এক টেরে ছোট্ট একখানি ঘর। ঘরের পাশেই একটু রান্নার জায়গা। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ।

নতুন একটি লণ্ঠন পর্যন্ত কিনে রেখে গিয়েছে শঙ্কর। ঘরের ভিতর দুটো চৌকি পাতা। মাটির একটি নতুন কলসীতে জল পর্যন্ত তোলা রয়েছে।

"ওমা, এযে বেশ ঘর। কত ভাড়া? এত পয়সা তুই পেলি কোথায়?"

শঙ্কর এসেই একটা চৌকির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। মার কথার কোনও জবাবই দিলে না। বিমলাও আর ভরসা করলে না তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে। একটি একটি করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল।

চৌকির উপর বিছানাটা পেতে দিয়ে বিমলা ডাকলে "শঙ্কর,

তুই এখানে এসে শো। আমি ততক্ষণে তোর বিছানাটা পেতে দিই।"

শঙ্কর উঠে গেল আরএকটা চৌকিতে। ঘোষাল-বাড়ির অপ্রীতিকর স্মৃতিটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আর ভুলতে পারছে না তাদের সেই ছোটবউকে। বড়বাবু কী মারটাই না তাকে মারলে! সে মারের জবাব সে দিতে পারত। সে শক্তি ছিল তার শরীরে। কিন্তু জবাব দেওয়া দূরে থাক, একটি কথাও সে বলেনি।

বড়বাবু চিৎকার করে বলেছে, ছোটবউ ছেড়ে দাও ওকে! ছোটবউ সেকথা গ্রাহ্য করেনি। আরও জোরে সে তাকে চেপে ধরেছে। তারপর চোখের জল মুছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, তার লেগেছে কিনা।

অনাত্মীয়া এই হাস্যধারার করুণাঘন যে মাতৃমূর্তি সেদিন সে দেখেছে তেমনটি আর দেখেনি কোনদিন। তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, বিহ্বল করে দিয়েছে।

তাই সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

ভুলতে পারছে না—রিকশায় চড়ে তারা চলে আসছে, মা ও ছেলে। যতবার সে পিছনে ফিরে তাকিয়েছে, দেখেছে, ছোট বউ দাঁড়িয়ে আছে সদর দরজার কাছে।

এই নিয়ে তাকে অপবাদ দিয়েছে বাড়ির বড় বউ। চরিত্রে কলঙ্কের ইঙ্গিত করেছে। ছোট বউ তার জবাব দিয়েছে, "অত সাহস আমার নেই দিদি। আমি গরিবের মেয়ে।"

সে নিজেও এক গরিব রাঁধুনী-বামনীর ছেলে।

তাহলে তার এই অনুকম্পা সে গরিবের ছেলে বলে।

বিমলা বললে, "তোর জন্যে চারটি রান্না করে দেব শঙ্কর?"

শঙ্কর বললে, "আমি খেয়েছি মা। তুমি বিশ্বাস কর—আমি খেয়েছি।"

সারারাত মা অর ছেলে পাশাপাশি দুটো চৌকির ওপর শুয়ে। বিমলার চোখে ঘুম নেই। কতবার সে ভেবেছে—শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করে তাদের চলবে কেমন করে?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয়নি।

শেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে হৈ-হৈ করে ছেলের দল এসেছে শঙ্করকে ডাকতে।

শঙ্কর একটা কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসেছিল সংসারে কী কী আনতে হবে তার হিসেব করতে। মা তাকে বলে বলে দিচ্ছিল।

ছেলেরা আসতেই শঙ্কর কাগজ পেন্সিল নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলেদের ভিতর একজনকে ডাকলে, "ভবেশ!"

ভবেশ এসে দাঁড়াতেই শঙ্কর হুকুম করলে, "মাকে জিজ্ঞাসা করে কী কী আনতে হবে লিখে নিয়ে তুই বাজার চলে যা।"

এই বলে দশ টাকার একটা নোট তার হাতে দিয়ে শঙ্কর বললে, "আমি আসছি মা।"

"কখন আসবি?"

"এসে খাব।"

শঙ্কর বেরিয়ে যেতেই ভবেশ বললে, "বলুন মা, কী কী আনতে হবে।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কী কর ভবেশ?"

ভবেশ বললে, "আমরা কাজ করি মা।"

"কী কাজ বাবা?"

ভবেশ বললে, "ক্লাবের কাজ।"

"সে আবার কী রকম কাজ?"

ভবেশ বললে, "জিমনাসিয়াম্ কাকে বলে জানেন?"

বিমলা বললে, "না বাবা।"

"তাহলেই ত বেগড়বাই। শঙ্করদাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে ঠিক বুঝিয়ে দেবে। আপনি বলুন কী কী আনতে হবে।"

কিন্তু ভবেশ কী করে, সেকথা জানবার জন্যে বিমলা ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এই সূত্রে বিমলা জানতে চায় তার শঙ্কর কী করে। তাই বাজারের ফর্দ করবার আগে বিমলা জিজ্ঞাসা করে বসল, "শঙ্করও কি ওই একই কাজ করে নাকি?"

ভবেশ অবাক্ হয়ে গেল কথাটা শুনে। বিমলার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "বা বা বা, আপনি দেখছি ঠিক আমার মায়ের মতন। শঙ্করদাই ত আমাদের সব। আমাদের বোসবাগান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।"

এই বলে সে আর সময় নষ্ট করতে চাইলে না।

ফর্দ নিয়ে বাজার করতে চলে গেল।

বোসবাগান ক্লাব বেশীদিনের ক্লাব নয়। এর একটু ইতিহাস আছে।

এই পাড়াতেই বহুকালের পুরনো একটা প্রকাণ্ড বাড়ি—অনেকদিন থেকে পোড়ো বাড়ির মতন পড়ে ছিল। ঘরগুলো জরাজীর্ণ। দরজা জানলা একটিও নেই। আগাছার জঙ্গল আর ইঁটের গাদা। লোকজন সেখানে বাস করা দূরে থাক্, দিনের বেলাতেও সাপের ভয়ে কেউ ওপথ দিয়ে হাঁটত না। তারই একটা নীচের ঘর পরিষ্কার করে নিয়ে পাড়ার কতকগুলো ছেলে ছেঁড়া চট আর চাটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে গুলতানি করত। সবাইকে বলত, আমরা ক্লাব করেছি ওখানে। ক্লাবের নাম পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল, "উত্তর কলিকাতা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ।"

পাড়ার মুরুব্বি-মাতব্বরেরা বলতেন, "সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ না ছাই, ওর নাম দেওয়া উচিত উচ্ছন্ন সঙ্ঘ।"

নিজের বাড়ির ছেলেদের বারণ করতেন, "যাসনে বাবা ওখানে। কোনদিন সাপে কামড়ে দেবে। ওই পোড়ো বাড়িটায় অন্তত শতখানেক্ গোখরো সাপ বাস করে।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

সেবছর চারিদিকের জঙ্গল সাফ করে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে ছেলেরা সেখানে সরস্বতী প্রতিমা এনে পুজো পর্যন্ত করে ফেললে। পুজোর দিন বিকেলে বুড়ো-গোছের একজন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করে এনে একটা সাহিত্য-সভা করবার মতলব তাদের ছিল, কিন্তু সভাটা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। গজা ছিল পুজো-কমিটির ক্যাসিয়ার। চাঁদার টাকাটা থাকত তারই হেফাজতে। পুজোটা কোনোরকমে চুকে যাবার পরেই সে বলে দিলে, "মনিব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে।"

গজার কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। কত কষ্টে আদায় করা চাঁদার দরুন নগদ ষাট টাকা বারো আনা ছিল তার কাছে। সবাই ভেবেছিল, পুজোর পরদিন ভাল করে একটা 'ফিস্ট' করবে। গজা দিলে সব মাটি করে।

দুটো দল হয়ে গেল। গজার একটা, হরার একটা। হরার দল বললে, "টাকাটা গজা মেরে দিয়েছে।" আর গজার দল বললে, "হরাই চুরি করেছে মনিব্যাগটা।"

প্রথমে কথা কাটাকাটি। তারপর মারামারি।

হরা সবাইকার সামনে গজাকে একটা চাঁটি মেরেছিল। গজা তার প্রতিশোধ নিলে সবার অসাক্ষাতে।

হরা একদিন গিয়েছিল বেলঘরিয়া—তার বোনের বাড়ি। ফিরতে রাত্রি হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পথের মাঝে কে যে তাকে এমন করে মেরে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে গেল কেউ বলতে পারলে না। বাড়িতে খোঁজাখুঁজি, কান্নাকাটি পড়ে গেল। দুদিন পরে খবর এল, হরা হাসপাতালে।

দশদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে হরা বললে, পিছন থেকে কে যে তার মাথায় বাড়ি মেরে ছিল সে বুঝতে পারেনি। তবে সে যে গজা ছাড়া আর কেউ নয়—তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই।

সবাই বললে, "গজার নামে নালিশ করে দে আদালতে। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালেই তোকে বলতে হত—গজাকে তুই দেখেছিস।"

হরা শুধু হেসেছিল একটুখানি।

তারপর একদিন দেখা গেল, হরাদের বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে শোনা গেল তারা নাকি কালীঘাটে বাড়ি ভাড়া করেছে।

সে আজ অনেকদিনের কথা। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি।

সেই থেকে উত্তর কলিকাতা সংস্কৃতি সঙ্ঘের নাম আর কেউ শুনতে পায়নি। পোড়ো বাড়িটার চারদিকে আবার আগাছার

জঙ্গল উঠেছিল, আর ছেলেদের সেই আড্ডা-ঘরখানা দখল করেছিল একটা ধর্মের ষাঁড়।

কিছুদিন পরেই বোসবাগানের জমিদার বৃদ্ধ গণপতি সরকার লোকজন নিয়ে একটা রিক্‌শা চড়ে এসে দাঁড়ালেন সেই পোড়ো বাড়িটার সম্মুখে। হুকুম হয়ে গেল বাড়িটা ভেঙে একেবারে সমতল করে দিয়ে ভাড়া দেবার জন্যে ছোট ছোট খুপরি করে দেওয়া হক।

কথাটা গজার কানে গেল।

গজা তখন গজেনবাবু। দশটার সময় খেয়েদেয়ে কোথায় কোন্ আপিসে বেরোয়, ফিরে আসে সন্ধ্যায়। কিন্তু সেদিনটা ছিল রবিবার। গজা তার বাড়ির রকে বসে বিড়ি টানছিল, পাড়ার একটা ছেলে এসে খবর দিলে, তাদের ক্লাব-ঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

ক্লাব-ঘরের অস্তিত্ব তার অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবু চাঁদা আদায় করে ক্লাব চালানোর মহিমা এখনও সে ভুলতে পারেনি। চট্ করে বিড়িটা ফেলে দিয়ে হাতকাটা শার্টটা গায়ে চড়িয়ে চটি পরে গজা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল বুড়ো গণপতি সরকারের কাছে। হাত দুটো তুলে চট করে একটা নমস্কার করে গজা বললে, "বাড়িটা ভেঙে ফেলছেন স্যার?"

গণপতি বললেন, "হ্যাঁ বাবা, এইখানে একটা নতুন বাড়ি হবে।"

গজা বললে "ভালই হবে। আমাদের উত্তর কলিকাতা সংস্কৃতি সঙ্ঘের জন্যে একখানা ঘর কিন্তু দিয়ে দেবেন। এখন থেকে বলে রাখছি।"

মুখটা কাঁচুমাচু করে গণপতি বললেন, "সংস্কৃত টোল? কত ভাড়া দিতে পারবে?"

গজা বললে, "ভাড়া কী বলছেন? এই ভাঙা ঘরে আমরা পাঁচ বছর ক্লাব চালিয়েছি, সরস্বতী পুজো করেছি—"

গণপতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। বললেন, "ও। কেলাব্ করবে?"

গজা বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

গণপতি বললেন, "না বাবা। এখানে কেলাব-ফেলাব হলে আমার ভাড়াটে থাকবে না। আমি ভাড়া দেবার জন্যে বাড়ি তৈরি করছি।"

গজা বললে, "বেশ ত, ভাড়া আপনি আমাদের কাছ থেকেও নেবেন।"

গণপতি বললেন, "না, বাবা, কেলাবে তোমরা নাচানাচি দাপাদাপি করবে, আমার ভাড়াটেরা থাকতে চাইবে না। ও-সব হবে না, যাও।"

গজা বেশী কথা বলবার লোক নয়। বললে, "তাহলে দেবেন না আপনি?"

"না।"

বলেই তিনি রিক্‌শায় ওঠবার জন্যে পা বাড়ালেন।

গজা বললে, "টাকাগুলো আপনার জলে ফেলবেন স্যার। নতুন বাড়িও আপনার অমনি পোড়ো বাড়ি হয়ে থাকবে।"

গণপতি রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, "কেন?"

গজা বললে, "পরে বুঝতে পারবেন।"

"ভয় দেখাচ্ছ?"

গজা বললে, "কী যে বলেন স্যার, আপনাকে ভয় দেখাতে পারি কখনও? সারা জীবন ধরে চড়া সুদে বন্ধকী কারবার করেছেন আপনি, লোকজন ত আপনার ভয়েই অস্থির, আপনাকে ভয় দেখাবে কি?"

গণপতি তাড়াতাড়ি রিক্‌শায় চড়ে বসলেন। বললেন, "চালাও।"

রিকশা চলবার আগে একবার মুখ ফিরিয়ে বলে গেলেন, "এটা মগের মুল্লুক নয়। ইংরেজের রাজত্ব।"

গজা সবিনয়ে একটি নমস্কার করে বললে, "আজ্ঞে হাঁ, জানি।"

সেই গণপতি সরকারের বাড়ি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন একদিন তিনি বাড়ি ফিরলেন ট্যাক্সি করে। রোজ সন্ধ্যায় তিনি স্বাস্থ্যলাভ করবার জন্য গঙ্গায় যান। লাঠি হাতে নিয়ে খানিকটা পায়চারি করেন। জেটির উপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন।

ট্যাক্সি থেকে নেমে সেদিন কিন্তু তিনি নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দোতলায় উঠতে পারলেন না। চাকর এসে তাঁকে ধরে ধরে ওপরে নিয়ে গেল। গিয়েই শয্যা গ্রহণ করলেন। হাঁটুতে তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা।

একমাত্র পুত্র সুরপতি সরকার তখন তার বন্ধুদের নিয়ে রাজনীতি চর্চা করছিল। চাকর এসে খবর দিলে, "বাবা ডাকছেন।"

সুরপতি বললে, "আমি এখন যেতে পারব না। কী দরকার জিজ্ঞাসা করে এস।"

চাকর আবার এসে বললে, "বাবুর খুব অসুখ। আপনি একবার আসুন।"

সুরপতি খুব বিরক্ত হল। বললে, "অসুখ না ছাই! কোনও বন্ধকী বাড়ি হয়ত হাতছাড়া হয়ে গেল।"

বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠল। তাদেরই ভিতর কে একজন বললে, "এই বন্ধকী করে করেই ত লাখ-পঞ্চাশেক রেখে যাবে তোমার জন্যে।"

সুরপতি গিয়ে দেখলে, একজন ঝি তার বাবার পায়ে গরম চুনহলুদ লাগাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে, "কী হল?"

যন্ত্রণায় কথা কইতে পারছিলেন না তিনি। অতিকষ্টে বললেন, "পড়ে গেলাম।"

"পড়ে গেলেন ত চুন-হলুদ কেন, একটা ডাক্তার ডাকলেই ত পারতেন!"

গণপতি বললেন "তোমাদের সেই এক কথা! ডাক্তার! ডাক্তার! ব্যাটারা টাকা খাবার যম। ডেকেছ কি, আট টাকা, তার চেয়ে বড় হলে ষোল টাকা। তার ওপর ওষুধ আর ইনজেক্‌সানের ঠেলায় অস্থির।"

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, "ডেকেছিলেন কী জন্যে?"

গণপতি বললেন, "বলছিলাম কি, বোস-বাগানে যে-বাড়িটা তৈরি হল, ওর একখানা ঘর ওই পাড়ার ছেলেগুলোকে দিও। ভাড়া নিও না। ছোঁড়াগুলো ভারী বজ্জাত।"

গণপতি সরকারের সেই শয্যাই হয়েছিল অন্তিমশয্যা। হাঁটুতে চুনহলুদ-লেপা অবস্থাতেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। জ্ঞান যতক্ষণ ছিল, ডাক্তার ততক্ষণ তিনি আসতে দেননি।

শেষ পর্যন্ত সুরপতি টেলিফোন করে একজন ডাক্তারকে আনিয়েছিল। ষোলো টাকা ফিও তিনি নিয়েছিলেন, দামী দামী কয়েকটা ইন্‌জেকশনও দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আর কিছুতেই কিছু হয়নি। টিটে-নাসেই তিনি মারা গেলেন।

পিতার শেষ আদেশ সুরপতি কিন্তু পালন করেছিল।

বোসবাগানে গিয়ে নতুন বাড়ির একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে ছেলেদের বলেছিল, "এই ঘরে তোমরা ক্লাব করবে।" আর খানিকটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, "এইখানে হবে প্যারালেল বার, জিমনাস্টিক আর কুস্তির আখড়া। কিন্তু মনে থাকে যেন, শরীরচর্চা করতে হবে সবাইকে। নইলে শুধু নাচ-গান আর থিয়েটার করবার জন্যে আমি ক্লাব-ঘর দেব না।"

গজা আপিস থেকে ফিরেই শুনলে এই সুসংবাদ। মনে মনেই একটু হাসলে। বললে, "ভেবেছিলুম, মিছেই লেঙ্গি মারলাম বুড়োকে। যাক, কাজ হয়েছে।"

বলেই সে ছুটল সুরপতির বাড়িতে। সুরপতির সঙ্গে দেখা করে বললে, "কালই আমি জিমনেসিয়াম খুলে দিচ্ছি স্যার। আপনার যখন যা দরকার হবে আমাদের বলবেন। আমরা করে দেব।"

এই নর্থ ক্যালকাটা জিমনাসিয়ামের প্রথম ছাত্র শঙ্কর।

ছাত্র অবশ্য জুটেছিল অনেকগুলি। কিন্তু মাসে চার আনার বেশী চাঁদা দেবার ক্ষমতা কারও নেই। কাজেই অন্য জিমনাসিয়াম থেকে উপদেষ্টা হয়ে যিনি এলেন তাঁর মাইনে দেওয়াই মুশকিল হয়ে উঠল।

গজা সুরপতির কাছে গিয়ে হাত পাতলে। দু'-চার মাস সুরপতি দিলে কিছু কিছু। [illegible] তার কিছুটা রাখলে নিজে কিছুটা দিলে জিমনাসিয়ামে। তারপর সুরপতি

একদিন জবাব দিয়ে দিলে। বললে, "আমি দিতে পারব না। ক্লাব আমার নয়। তোমাদের।"

গজার কিন্তু মতলব ছিল অন্যরকম। মাসে মাসে চাঁদা আদায় হবে দু'শ চারশ, বড়লোকের ছেলেরা মেম্বার হবে, মুক্ত হস্তে দান করবে, মেয়েদের নাচ হবে, গান হবে, থিয়েটার হবে। মাসে একটা দুটো ফাংশান করবে, টিকিট বিক্রি হবে হাজার দেড় হাজার টাকার, তবে ত ক্লাব চালিয়ে সুখ! তা না, ছেলেরা কুস্তি লড়ে পালোয়ান হবে, দেশ উদ্ধার করবে, আর আমি ব্যাটা টাকার ভাবনায় পাগলের মত ছুটে বেড়াব?—গজা একদিন শঙ্করকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "এর মধ্যে আমি নেই। পারিস ত তুই চালা।"

শঙ্কর বললে, "আমি কি পারব চালাতে?"

গজা বললে, "দ্যাখ না চেষ্টা করে। না পারিস না পারবি।"

"কী করব তখন?"

গজা বললে, "যার ঘর তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে বলবি—এই রইল তোমার ঘর। আমি চললাম।"

চলে অবশ্য শঙ্কর গেল না। গেল গজা। আপিসের কাজে তাকে বোম্বাই চলে যেতে হল।

যাবার সময় বলে গেল শঙ্করকে, "মেয়েছেলে রইল বাড়িতে, দেখিস। দরকার হলে দু-দশ টাকা দিস।"

শঙ্কর সায় দিয়েছিল তার মাথাটি ঈষৎ কাত করে।

এক দিকে ক্লাব চালাবার দায়িত্ব, আর একদিকে গজার সংসার। টাকা অবশ্য সে পাঠাবে বোম্বাই থেকে, কিন্তু হয়ত-বা তা যৎসামান্য।

কী করে কী করবে, শঙ্কর ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। তখন তার বয়সই-বা কত!

গজা যাবার আগে বলেছিল, "মাথাটা কাত করিস না কোথাও, আর ভয় করিস না কাউকে।"

ঠিকই বলেছিল গজা, কিন্তু একটা কথা বলতে ভুলেছিল।

নির্ভয় হতে হলে সত্যাশ্রয়ী হতে হয়। সত্যকে ছুঁয়ে থাকলে ভয় তার পাশ ঘেঁষতে পারে না।

কিশোর বালক শঙ্কর। কুড়ির কাছাকাছি বয়স, সুন্দর সুগঠিত দেহ, নিষ্পাপ নিষ্কলুষ মুখচ্ছবি, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের এই প্রথম সংগ্রামে। ইস্কুল যাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেল। আর কাছে থায় দায় আর দিবারাত্রি ঘুরে বেড়ায়। যেমন করে হক, ক্লাবটিকে তার বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে ভাব করে শঙ্কর ক্লাবে ডেকে আনে তাদের, টাকা-পয়সা আদায় করে, কোন রকমে ক্লাবের খরচ চালায়।

ওদিকে গজার বাড়িতে গিয়ে দেখে, বাচ্চা ছেলেটার অসুখ, টাকা যা এসেছিল খরচ হয়ে গিয়েছে, ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই। পকেটে যা থাকে, শঙ্কর উজাড় করে ঢেলে দিয়ে আসে সেইখানে।

ক্লাবে তখন ছেলেরা বসে আছে হাত গুটিয়ে। জিমনাস্টিকের মাস্টারের পনেরটি টাকা বাকী। টাকা না পেলে তিনি কাজ করবেন না।

শঙ্কর আসতেই মাস্টার বললে, "টাকা দাও।"

শঙ্কর বললে, "আজ দিতে পারব না।"

"আজই ত দেব বলেছিলে।"

"বলেছিলাম। কিন্তু খরচ হয়ে গেছে। টাকা নেই।"

"নেই বললে আমি শুনব না। টাকা আমার চাই-ই!"

শঙ্কর বললে, "মিছে কথা আমি বলি না। আমি বলছি টাকা নেই।"

মাস্টার শুনবে না কিছুতেই। ভদ্রলোক সেই এক জিদ ধরে রইল।

শঙ্করের অসহ্য হয়ে উঠল। মুখ তুলে বললে, "কী করতে চান আপনি?"

লোকটা ধাঁ করে একটা চড় মেরে বসল শঙ্করের মাথায়। —"কী করতে চান আপনি? আমাকে চোখ রাঙানো হচ্ছে? এচোঁড়ে পাকা ছেলে!"

শঙ্কর থর থর করে কাঁপছে। "বলা শেষ হয়েছে?"

"আবার?" বলেই লোকটি শঙ্করের গালের উপর মারলে আর-এক চড়!

শঙ্কর এবার আর চুপ করে থাকতে পারলে না। প্রাণপণে একটি ঘুঁষি চালিয়ে দিলে ভদ্রলোকের মুখে। মেরেই ঠিক বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। এলোপাথাড়ি ঘুঁষি চালাতে চালাতে শঙ্কর তাকে যখন ঘরের বাইরে বের করে দিলে, দেখা গেল, লোকটির মুখ দিয়ে কাঁচা রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছে, আর সেই রক্তে তার সাদা জামাটা লাল হয়ে গিয়েছে!

ভদ্রলোক হেঁটমুখে বসে পড়ল বাইরে গিয়ে। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। একটা দাঁত বোধহয় ভেঙে গিয়েছে।

একটা ছেলেকে কাছে ডেকে শঙ্কর বললে, "এক মগ জল এনে দে।"

বলেই সে তার গায়ের জামাটা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, "চলে এস তোমরা। আজ থেকে আমি তোমাদের শেখাব।"

জল দিয়ে ভাল করে মুখ ধুয়ে লোকটি সেই যে সেখান থেকে উঠে চলে গেল, আর কোনদিন সে এ-পথ মাড়াল না।

সকাল বিকেল শঙ্কর নিজেই শেখাতে লাগল সবাইকে। অনেকেই শঙ্করের চেয়ে বয়সে বড়, তাতে বিশেষ ক্ষতি হল না। বিপদ হল শুধু বড়লোকের ছেলেদের নিয়ে। মুগুর, ডাম্বেল, স্প্রিং, ওয়েট সবই তাদের কাছে ভারী বলে মনে হয়, কেউ কেউ গায়ের জামা খুলতে চায় না। আবার কেউ কেউ বলে, গায়ে মাটি মেখে কুস্তি লড়তে তারা পারবে না। বাড়ির দারোয়ান-গুলো দেখতে পেলে হাসবে।

একে একে সব পালিয়ে যেতে লাগল।

অথচ তারাই শঙ্করের একমাত্র ভরসা।

সারা ভারতবর্ষে তখন আগুন জ্বলছে। ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে সকলেই কৃতসংকল্প।

শঙ্কর তারই সুযোগ গ্রহণ করলে। একজন সাহিত্যিকের কাছে গিয়ে ভাল করে একটি বিজ্ঞাপন লিখিয়ে আনলে।—বাঙালী নির্বীর্য, বাঙালী বলহীন, বাঙালী কাপুরুষ, বাঙালী শুধু কেরানীর জাত। জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত প্রয়োজন। তোমরা সব দলে দলে চলে এস আমাদের ক্লাবে। তিনমাসে তোমাদের চেহারা ফিরিয়ে দেব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

"নর্থ ক্যালকাটা জিমনাসিয়াম" "উত্তর কলিকাতা শক্তি মন্দির" এ-সব নাম তার পছন্দ হল না। তাই শঙ্কর তার ক্লাবের নতুন নামকরণ করলে—"বোসবাগান ক্লাব।"

কাজ যে কিছু হল না তা নয়।

নতুন কিছু ছেলে এসে ভর্তি হল। সব গরিবের ছেলে। মাসিক বেতন চার আনার জায়গায় এক টাকা করলে, কিন্তু তবু সে তার ছাপাখানার বিলটা মেটাতে পারলে না। নতুন সাইন বোর্ডের টাকাটা দিতেই সব ফুরিয়ে গেল।

এমন দিনে গজা এল। তার চাকরির জায়গা থেকে দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে।

শঙ্কর অবাক হয়ে গেল তার মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, "এ কী চেহারা হয়েছে গজাদা? রোগা হয়ে গেছ, কুঁজো হয়ে গেছ, চোখে চশমা নিয়েছ। মনে হচ্ছে এই কমাসে বয়েস যেন তোমার অনেক বেড়ে গেছে। বোম্বাই থেকে আসছ?"

গজা বললে, "না রে ভাই, চরকির মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সারা দেশটা। চাকরি আবার মানুষে করে!"

শঙ্কর বললে, "ভালই ত! কত দেশ দেখলে!"

গজা বললে, "দেশ দেখে আমার লাভ ত হল খুব। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরিয়ে এলাম। যা খাই কিছুই হজম হয় না।"

শঙ্কর টেবিলের উপর একটা ঘ্‌ুষি মেরে বলে উঠল, "কাল থেকে লেগে যাও এইখানে। দ্‌দিনে তোমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ভাল হয়ে যাবে।"

গজা বললে, "না রে না, দ্‌দশদিনের কম্ম নয় আমি জানি। দশদিনের ছ্‌টি পেয়েছি, দশদিন পরেই ছ্‌টতে হবে মেদিনীপ্‌রে। তিরিশটে টাকা দে দেখি। তুই তিনমাস কিছ্‌ দিসনি আমার বাড়িতে।"

শঙ্কর মাথায় হাত দিয়ে বসল। বললে, "কি কষ্টে যে ক্লাব চালাচ্ছি তা আমি জানি গজাদা। হাজার পাঁচেক্‌ হ্যান্ডবিল ছাপিয়েছিলাম। ছাপাখানার প'চিশটে টাকা এখনও দিতে পারিনি।"

কথাটা গজা বিশ্বাস করলে বলে মনে হল না। বললে, "যাঃ. গ্‌ল মারবার আর জায়গা পেলি না? মাইনে করেছিস এক টাকা, মাস্টারগ্‌লোকে মেরে তাড়িয়েছিস, আমার দেওয়া নামটা পর্যন্ত বদলে দিয়ে চক্‌চকে নতুন সাইনবোর্ড টাঙিয়েছিস, আমি সব ব্‌ঝি। তোর হাতে ক্লাবটা ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত হয়নি।"

এই বলে গজা উঠে চলে গেল।

শঙ্কর কিছ্‌ক্ষণ বসে রইল মাথায় হাত দিয়ে। তারপর ভাবলে ভালই হল, কাল সকালে এসেই সে গজাদার হাতে তার ক্লাবটিকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

পরের দিন সকালে এসেই দেখে, স্‌রপতি সরকার দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাব-ঘরের সামনে। সঙ্গে গজা।

গজা বললে, "এ-ই শঙ্কর।"

শঙ্কর স্‌রপতিকে চেনে, কিন্তু স্‌রপতি বোধকরি এই প্রথম দেখলে শঙ্করকে।

"ক্লাবটা কি তুমি ভাল চালাতে পারছ না?"

স্‌রপতি একদ্‌ষ্টে কিছ্‌ক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। চোখ যেন আর ফেরাতে পারে না। কিন্তু কিছ্‌ না বলে কারও দিকে তাকিয়েও থাকা যায় না। জিজ্ঞাসা করলে "ক্লাবটা কি তুমি ভাল চালাতে পারছ না?"

শঙ্কর প্রথমে বলতে চাচ্ছিল না, কিন্তু গজা রয়েছে স্‌ম্‌খে দাঁড়িয়ে। কাজেই বলতে বাধ্য হল। বললে, "আজ্ঞে না, ভাল চলছে না।"

গজা বললে, "তার চেয়ে আমি বলিকি, তুই ছেড়ে দে। আমরা অন্য লোক দেখি। আমি ত এখানে থাকতে পারছি না, নইলে আমার ক্লাব আমিই চালাতাম।"

শঙ্কর বললে, "আজ আমি সেই কথা বলতেই এসেছিলাম। আসি তাহলে। নমস্কার।"

শঙ্কর যে এত সহজে ছেড়ে চলে যাবে, গজা তা ভাবেনি। যাক, ভালই হল, যে-কদিন সে কলকাতায় আছে, নিজে দেখাশোনা করে সবকিছ্‌ ঠিক করে দিয়ে যাবে।

কিন্তু দেখাশোনা করতে গিয়ে দেখে খাতায় মাত্র তিরিশজনের নাম। তিরিশজন মানে তিরিশ টাকা মাসে! গজা ভাবলে অনেকের নাম বোধহয় খাতায় লেখেনি শঙ্কর।

দ্‌দিন বসে থাকবার পরেও তাদের কোনও হদিশ মিলল না, তায় উপর শঙ্কর ছেড়ে দিয়েছে শ্‌নে তিরিশজন ছাত্রের মধ্যে কুড়িজন আসা বন্ধ করে দিলে। তখন নির্‌পায় হয়ে গজা আবার স্‌রপতির কাছে গিয়ে হাজির হল। বললে, "শঙ্কর ছেলেটা ভালই ছিল, ব্‌ঝলেন? এখন দেখছি একেবারে বখে গেছে। যেই দেখলে আমি টেক আপ করলাম, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব দিলে বারণ করে। যাই হক ক্লাব আমি ছাড়ব না। কলকাতায় বদলি হয়ে আসবার দরখাস্তটা আমার মঞ্জ্‌র হয়ে গেলেই আমি এখানে ফিরে এসে দেখ্‌ন না ক্লাবটাকে কিরকম জাঁকিয়ে তুলব।"

গজার ছ্‌টি গেল ফ্‌রিয়ে। ক্লাব ঘর বন্ধ করে দিয়ে সে মেদিনীপ্‌র চলে গেল।

তিনদিন যেতে না যেতেই কলকাতায় আগ্‌ন জ্‌লে উঠল। লাগল হিন্দ্‌-ম্‌সলমানে দাঙ্গা। কলকাতা শহরের পথে ঘাটে চলতে লাগল বীভৎস নরহত্যা আর ল্‌ঠতরাজ।

অরিন্দম ঘোষালের বাড়িটা যে-পাড়ায়, সে-পাড়াটা ছিল একেবারে নিরাপদ। নানারকমের অদ্ভুত গ্‌জব ছাড়া তার অন্দরমহলে আর কিছ্‌ প্রবেশ করেনি। কর্তাবাব্‌ বিচক্ষণ ব্যক্তি। হ্‌কুম দিলেন, সদর দরজা বন্ধ করে রাখো। খ্‌ব দরকারী কাজ ছাড়া কেউ যেন বাইরে না বেরোয়।

বড় বউ কিন্তু প্রথম দিনেই একটা ভারী মজার খবর নিয়ে গিয়ে শ্বশ্‌র শাশ্‌ড়ীর কানে তুলে দিলে। বললে, "এত ত বারণ করলেন, কিন্তু শঙ্কর বেরিয়ে গেল। ওর

মা শুধু পায়ে ধরতে বাকি রাখলে, কিন্তু কিছুতেই শুনলে না।"

বড় বউ ভেবেছিল এই নিয়ে বেশ একটা হৈ হৈ হবে বাড়িতে, কিন্তু রাঁধুনি বামনীর ছেলে—বেরিয়ে গেল ত বয়ে গেল। তার জন্যে কার কী মাথাব্যাথা!

কর্তাবাবু মুখ না তুলে শুধু বললেন, "ও।"

শঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার বোসবাগান ক্লাবের সুমুখে। গিয়েই দেখে, সুরপতিবাবু দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি এখানে?"

সুরপতি বললে, "তোমারই খোঁজে।"

শঙ্কর বললে, "আপনারা ত আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, তারপরেও ভাবলেন কেমন করে আমি এখানে আসব?"

সুরপতি বললে, "ও-সব কথা থাক। এখন শোন, আমাদের এই বিপদের দিনে নিজেদেরই সব ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার দলবল নিয়ে এই পাড়াটা তুমি বাঁচাও।"

শঙ্কর বললে, "সে সাধ্য কি আমার আছে?"

"খুব আছে। চমৎকার ছেলে তুমি।"

এই বলে সুরপতি তার পিঠ চাপড়ে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "রাইফেল চালাতে জান?"

শঙ্কর বললে, "কেমন করে জানব? রাইফেল কোথায় পাব বলুন?"

সুরপতি বললে, "আমার আছে। আমি তোমাকে শেখাব।"

শঙ্কর তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে শুধু। বললে, "আমার একটু কাজ আছে। আমি চললাম।"

সুরপতি বললে, "না না, এসময় কোনও কাজ নয়। তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না। যে-কদিন এইরকম গোলমাল চলবে, সে-কদিন তোমার দলবল নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে খাবে, থাকবে। এস তুমি আমার সঙ্গে।"

শঙ্কর বললে, "এ সময় বাড়ির বাইরে থাকলে আমার মা কেঁদে কেঁদে মরে যাবে। তাকে অন্তত একটিবার দেখা দিয়ে আসতেই হবে।"

সুরপতি নিজের স্বার্থ বেশ ভালই বোঝে। জিজ্ঞাসা করলে, "বাড়িতে কে কে আছে? তোমার মা—"

শঙ্কর বললে, "আর কেউ নেই। শুধু আমার মা।"

সুরপতি বললে, "তবে আর কী! নিয়ে এস তোমার মাকে আমার বাড়িতে। মাকে আমি আলাদা ঘর ছেড়ে দেব। আমার মস্ত বাড়ি, তুমি দেখেছ বোধহয়।"

"দেখেছি। কিন্তু এখন আমাকে ছেড়ে দিন, আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।"

শঙ্কর তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুরপতি তাকিয়ে রইল তার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে। শঙ্কর তার চোখের বাইরে চলে যাবার পর হঠাৎ মনে হল,—শঙ্করের বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে হত। এই বিপদের দিনে শঙ্করের মত ছেলের একান্ত প্রয়োজন।

সুরপতির বাড়ির ত্রিসীমানায় বিপদের আশঙ্কা কিছু ছিল না, তবু সুরপতি ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে গিয়ে স্নানাহার করেই সে তার বন্দুক আর রিভলভার নিয়ে বসল। বন্দুকের নল পরিষ্কার করলে। রিভলভারের চেম্বারে বুলেট পুরলে। বাড়ির ছাদে উঠে ফাঁকা দুটো আওয়াজ করলে, তারপর ব্রিচেস পরে শিকারীর বেশে বন্দুক হাতে নিয়ে বীরবিক্রমে বেরিয়ে পড়ল।

কথায় আছে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। সুরপতিরও ঠিক তাই। সাজ-পোশাক পরে, হাতে বন্দুক আর চামড়ার বেল্টে রিভলভার নিয়ে এসে দাঁড়াল বোস-বাগান ক্লাবের সুমুখে।

এসে যা দেখলে, তা অবশ্য দেখবার প্রত্যাশা সে করেনি।

দেখলে, শঙ্কর তার দলবল নিয়ে ক্লাব-ঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে কী যেন পরামর্শ করছে। সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, "তখন তুমি কোথায় চলে গেলে?"

শঙ্কর বললে, "যেখানে গেলাম, সেখানে যেতে যদি আর একটু দেরি হত, তাহলে ভারি মুশকিল হত কিন্তু। বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে নিয়ে যেতে যেতে আমার একটু দেরিও হয়েছিল।"

ক্লাবঘরের দিকে তাকিয়ে সুরপতি দেখলে, কয়েকজন মেয়েছেলে রয়েছে সেখানে। জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা কে ওখানে?"

শঙ্কর বললে, "ওদেরই ত এনে এইখানে তুললাম। গজাদার বউ, গজাদার বোন, গজাদার ছেলেমেয়ে। বাড়িতে একটা ব্যাটা-ছেলে নেই, টাকা নেই, পয়সা নেই, এর ওর কাছে চেয়ে চিন্তে আজ আর কাল দুদিনের মত ব্যবস্থা করে দিলাম।"

সুরপতি অবাক হয়ে গেল শঙ্করের ব্যবহার দেখে। এখান থেকে চলে যাবার আগে গজা তাকে শঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গিয়েছে। বলে গিয়েছে, "ছোঁড়া-টাকে ক্লাবের পাশ মাড়াতে দেবেন না। ছোঁড়াটা শয়তান।"

সেই শয়তানই আজ তার পরিবারকে রক্ষা করলে।

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, "ওখানে আরও ত বাড়ি আছে, তাদের কী হবে?"

শঙ্কর বললে, "সেবাড়িগুলো একটু দূরে, আর সেখানে লোক আছে অনেক। তাহলেও আজ আমরা পালা করে পাহারা দেব রাত্তিরটা।"

সুরপতি বললে, "বস্তিটা ত খালের ওপারে। সেখান থেকে অতটা ঘুরে লোক-জন এপারে আসবে ভেবেছ?"

শঙ্কর বললে, "যদি আসে—? দেখে এলাম খালের ওপার থেকে ওরা চিৎকার করছে, এপার থেকে এরা চেঁচাচ্ছে। এই চলছে দিনরাত।"

সুরপতি বললে, "আজ সারাদিন ত তুমি বাড়িছাড়া। আর তখন আমাকে বললে, বাড়ির বাইরে থাকলে মা তোমার কেঁদে কেঁদে মরে যাবে!"

শঙ্কর বললে, "ঠিক সময়ে আমি মার কাছে গিয়ে খেয়ে এসেছি। আবার রাত্রেও গিয়ে খেয়ে আসব। একটা বাইক্ পেলে ভাল হত। বিজনের কাছ থেকে চেয়েছি, দেখি যদি পাই।"

সুরপতি বললে, "আমি তোমাকে সবকিছু দিতে পারি শঙ্কর, তুমি যদি আমার কথা-মত কাজ কর।"

শঙ্কর হাসলে সুরপতির মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, "করব, এই হাঙ্গামাটা চুকুক।"

খালের এপারে পাহারা অবশ্য তারা দিয়েছিল। সুরপতি নিজেও একবার গিয়েছিল সন্ধ্যার পরে। দুটো আওয়াজও করে এসেছিল বন্দুকের।

সেদিন একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটে গেল। রাত্রি তখন বোধ করি এগারটা হবে। পাড়ার সব জোয়ান ছেলেরা খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে ক্লান্ত হয়ে একে একে সব বাড়ি চলে গিয়েছে। শঙ্করের দলের মাত্র জন পাঁচেক ছোকরা একটা গাছের তলায় বসে বসে গল্প করছে।

গল্প করছে এই ব্যাপার নিয়েই।

কে একজন বললে, "এটা কী হল বল্ দেখি? গৃহযুদ্ধ?"

ঘনা অন্যদিকে তাকিয়েছিল। বলে উঠল, "ওরে থাম। তোকে আর লেকচার মারতে হবে না। এইদিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ।"

সবাই তাকিয়ে দেখলে। শঙ্কর এগিয়ে এল। দূরে গজার বাড়ির দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ঘনা চুপি চুপি বললে, "কী মনে হচ্ছে?"

রাস্তার আলো গিয়ে পড়েছিল একটা গাছের উপর, আর সেই গাছের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু ঝাপ্‌সা আলো পড়েছিল গজার দরজায়, তাইতে মনে হল, কে একটা লোক যেন দোরটা একবার খুলছে, আবার বন্ধ করছে।

শংকর বললে, "বাড়িতে ত কেউ নেই।"

ঘনা বললে, "নেই বলেই ত ঢুকছে।"

শংকর বললে, "চোর নিশ্চয়ই। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে কিছু চুরি করবে বলে ঢুকেছে।"

"যেই হক, চল দেখি।"

ছুরি ছোরা লাঠি সোটা যা কিছু ছিল প্রত্যেকে হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে।

দোরের কাছে গিয়ে দেখে ভিতর থেকে খিল বন্ধ।

"হ্যাঁ ঠিক। আমাদের আসতে দেখে ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে দিয়েছে।"

ঘনা বললে, "সাবধান কিন্তু, অনেকে আছে। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এইখানে ঘাটি করেছে।"

তারু বললে, "আমরা ছ'জন মাত্র আছি। দলে যদি ওরা ভারী হয়, আমরা বেকায়দায় পড়ে যাব। দাঁড়া আরও লোক জড় করি।"

শংকর বললে, "না। কেউ যদি না থাকে ত লোকে হাসবে। পাঁচিল টপকে চল আগে ঢুকে পড়ি। দোরের কাছে কে থাকবে? তোর হাতে ধারালো টাঙ্গি আছে। তুই থাক্।"

দুটো কপাটের ফাঁকে টাঙ্গিটা ঢুকিয়ে দোরের খিলটা বাইরে থেকে খোলবার চেষ্টা করছিল ঘনা। একটু এদিক ওদিক করতেই খুলে গেল।

শংকর বললে, "আয়।"

বলে সে নিজেই আগে ঢুকে পড়ল। তার একহাতে ছিল টর্চ, আর একহাতে ছোট একটি লাঠি। টর্চ ফেলে সুইচটা দেখে নিয়ে বারান্দার আলোটা জেলে ফেললে।

কিন্তু কোথায় মানুষ? দু'খানি মাত্র ঘর। সুমুখে একটুখানি বারান্দা। বারান্দার পাশে টিনের একটি ছোট্ট ঘরের একপাশে রান্নার উনোন পাতা, আর তার পাশেই জলের কল আর চৌবাচ্চা।

দু'খানা ঘরেই তালা বন্ধ। টেনে টেনে দেখলে। খোলা গেল না।

"দোরে আর মিছেমিছি পরশুরাম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেন?"

ঘনাও ঘরে ঢুকল।

ছ'জন লোক তন্ন তন্ন করে' খুঁজতে লাগল। কিন্তু মানুষ ত ইঁদুর নয় যে, গর্তে ঢুকল, পাখি নয় যে, উড়ে পালাল। মানুষ একটা ছিল নিশ্চয়ই। নইলে ভিতর থেকে সদর দরজায় খিল বন্ধ করলে কে?

কে একজন বললে, "ছাতে গিয়ে ওঠেনি ত?"

কিন্তু ছাতে ওঠবার কোনও ব্যবস্থাই নেই কোথাও।

বাথরুমটা পর্যন্ত টর্চ ফেলে দেখে আসা হল। সেখানেও নেই।

পালিয়েছে তাহলে।

এই বলে শংকর রান্নাঘরের টিনটা তার হাতের লাঠি দিয়ে খুঁচে খুঁচে দেখছিল, সবাই তখন বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, এমন সময় শঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলো, "পেয়েছি! উঠে আয় ব্যাটা, উঠে আয়!"

হুড়মুড় করে সবাই তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখা গেল, ফাঁকা চৌবাচ্চার ভেতর জড়সড় হয়ে বসে আছে একটি মানুষ। বয়স তিরিশ পেরিয়েছে কি না সন্দেহ। লাঠির খোঁচা খেয়ে সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। মুসলমান যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ছেড়া ফতুয়া। মুখে দাড়ি গোঁফ।

হঠাৎ 'জয় মা!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো ঘনা। দেখা গেল, হন্তারকের মত দুহাত দিয়ে টাঙ্গিটা সে তখন তুলে ধরেছে।

শংকর বললে, "না।"

"না কি? আমাদের অনেককে ওরা এমনি করে মেরেছে। চৌবাচ্চার ওপর মাথাটা চেপে ধর, আমি দিই বলিদান করে।"

শংকর বললে, "চুপ কর।"

লোকটা তখন চৌবাচ্চা থেকে নেমে শংকরের পাদুটো জড়িয়ে ধরেছে।

শংকর তার চুলের মুঠি ধরে তাকে টানতে টানতে এনে ফেললে বারান্দায়। বারান্দায় ভাল আলো ছিল। লোকটা কাঁদছে, আর থর থর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ভাল করে কথা বেরুচ্ছে না। খালি বলছে, "জানে মারবেন না বাবু, আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে।"

লোকটা তোতলা। ভয়ে যেন আরও তোতলা হয়ে গেছে।

শংকরকে সরিয়ে দিয়ে তারু এগিয়ে এল। ঠাস ঠাস করে দুটি চড় মেরে তারু জিজ্ঞাসা করলে, "দলে ক'জন আছিস তোরা বল। কী মতলব করেছিলি? সঙ্গে কী এনেছিস? ছুরি? কই দেখি।"

কোমরে হাত দিয়ে দেখলে কিছু নেই।

লোকটা বললে, "আমি ও-দলের নই বাবুমশাই। আমি গজুভাইএর কাছে এসেছিলাম।"

"চোপ, ব্যাটা বলে কি না গজুভাই! গজুভাইকে ছুরি মারতে এসেছিলি?"

লোকটার পকেটে ছুরির খোঁজ করতে গিয়ে তারু বের করলে দুটি দশ টাকার নোট, আর একটি পাঁচ টাকার। পঁচিশ টাকা। আর এক পকেট থেকে বার হল চারটি বিড়ি আর একটি দেশলাই।

ঘনা বললে, "ওই পঁচিশটে টাকা কেড়ে নিয়ে দে ব্যাটাকে ছেড়ে দে।"

তারু বললে, "সেই ভাল।"

টাকা পঁচিশটা শঙ্করের হাতে দিয়ে তারু তাকে মারতে মারতে দোরের বাইরে টেনে এনে বললে, "তোদের দলের লোককে বলিস, এদিকে যেন হাঙ্গামা করতে না আসে। এলে আর বেঁচে ফিরে যেতে হবে না!—ভাগ্!"

বলে এক লাথি মেরে তাকে ছেড়ে দিতেই লোকটা প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেল।

বোসবাগানে হাঙ্গামা বিশেষ কিছু হল না।

সবাই বলতে লাগল, "ভাগ্যিস লোকটা সেদিন ধরা পড়ে গেল, নইলে নিশ্চয়ই একটা কিছু হত।"

তার কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া পঁচিশটি টাকা গজার বউয়ের হাতে দিয়ে শংকর বলেছিল, "এই দিয়ে চালাও কয়েকটা দিন। ফুরোবার আগেই গজাদার টাকা এসে যাবে।"

গজাদার টাকা আসবার আগে কিন্তু গজা নিজেই এসে হাজির হল। মেদিনীপুর পেঁছেই সে শুনতে পেলে কলকাতায় নাকি একটা ভারী বিশ্রী ব্যাপার শুরু হয়েছে। দিনে দুপুরে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঢুকে দুর্বৃত্তরা নাকি মেয়েছেলে সব কুচি কুচি করে কেটে দিয়ে যাচ্ছে। শহরের পথে রক্তগঙ্গা বইছে। দিনে দুপুরে পথে পথে শেয়াল-শকুনের জটলা চলছে। আরও সব দোকান-পাট লুটতরাজের ছোটখাটো ভাল ভাল খবরও সে পেয়েছিল, কিন্তু সে সব কথা এখানে অবান্তর। তার শুধুই মনে হতে লাগল, বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, তার উপর শঙ্করের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে, সুতরাং এই সর্বনাশা হত্যাকান্ড তার বাড়িতেও যে সংঘটিত হয়েছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চোখের সুমুখে নানারকম ভয়াবহ চিত্র ক্ষণে ক্ষণে উপস্থিত হতে লাগল। তার স্ত্রীর বয়স বেশী নয়, দেখতেও সুশ্রী, অবিবাহিতা যুবতী ভগিনী পদ্মাসুন্দরী, —তাদের সর্বনাশ যা হবার তা ত হয়েই গিয়েছে। আর নয়ত ছুটে পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে, তক্ষুনি একটা পা দিয়েছে কেটে, তারপর কেটেছে হাত, তারপর খানিকটা মাংসপিণ্ডের মত ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রক্তের স্রোতে ভেসে চলেছে তারা। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দুটো হয়ত-বা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। দুটো বর্শা দিয়ে বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় করে তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছে জন্মের মত। তারপর বাড়ির সুমুখের গাছের ডালে টাঙিয়ে দিয়েছে তাদের মৃতদেহ।

কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে মন তার উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু কপর্দকহীন নিঃসম্বল অবস্থায় সেখানে গিয়েই বা কী করবে সে?

আপিসের বড়বাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ সময় আপনার বাড়ি ছেড়ে আসা উচিত হয়নি গজেনবাবু।"

মাত্র এইটুকু সহানুভূতি! গজেনের চোখের সামনে সেই কাল্পনিক ভয়াবহ চিত্র ভেসে উঠল—ছেলেমেয়ে দুটোর মৃতদেহ গাছে টাঙান, তার দিকে যেন হাত বাড়িয়ে আছে।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল গজা। তারপর কান্না থামিয়ে বললে, "কী করব বলুন! টাকার বড় অভাব—"

কথাটা শেষ করতে হল না। বড়বাবু লোকটি দয়ালু। তৎক্ষণাৎ চল্লিশটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, "এক্ষুনি চলে যান। গিয়ে চিঠি দেবেন।"

চল্লিশটি টাকার একটি পয়সাও খরচ করেনি সে। ট্রেনের টিকিটও কেনেনি, খায়ওনি কিছু। হাওড়া স্টেশনে নেমে সত্যিই দেখেছে—শহরের সেই ভয়াবহ রূপ। কেমন করে কোন্‌দিক দিয়ে কুখ্যাত পল্লীর পথ এড়িয়ে গজা তাদের বোসবাগানে এসে ঢুকেছে তার মনে নেই। বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল সে ছুটতে ছুটতে, পথে সুরপতির সঙ্গে দেখা। বন্দুক নিয়ে সেদিনও সে রাউণ্ডে বেরিয়েছিল।

থম করে থেমে গেল গজা। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে সেই দুর্ধর্ষ গজেন জমাদ্দার। চোখ দুটো তার জলে ভরে এসেছে। কোনও কিছু প্রশ্ন করতে ভয় করছে।

সুরপতি নিজেই বললে, "বাড়িতে আপনার কেউ নেই।"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল গজা।—"আঃ, সব শেষ হয়ে গেছে?"

সুরপতি বললে, "না না, সবাই ভাল আছে। তবে আপনার বাড়িতে কেউ নেই। আছে ওই ক্লাব-ঘরে।"

গজা উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। জিজ্ঞাসা করলে, "হামলা হয়েছিল বুঝি?"

সুরপতি বললে, "হয়নি। হতে পারত। যে-শংকরকে আপনি শয়তান বলে তাড়িয়ে দিলেন, সেই শংকরই বাঁচিয়েছে আপনার বাড়ির সবাইকে। বাঁচিয়েছে এই পাড়াটাকে।"

গজা তার মুখ দিয়ে একবার উচ্চারণ করলে, "শংকর?"

শংকর বলতেই শংকর!

ঘনা আর তারুকে সঙ্গে নিয়ে শংকর বোধকরি সেইদিকেই আসছিল। সুরপতি বলে উঠল, "ওই ত শংকর! অনেকদিন বাঁচবে তুমি। এই মাত্তর তোমার নাম হচ্ছিল।"

সে-কথায় কান দিলে না শংকর। গজা কখন এল, কেমন করে এল, তাও জিজ্ঞাসা করলে না। শুধু বললে, "ছি গজাদা, একটা পয়সাও দিয়ে যাওনি বউদির হাতে?"

গজা বললে, "দেব কোত্থেকে?"

এই বলে একটু থেমে একটা ঢোঁক গিলে বললে, "একটা ব্যবস্থা আমি করে গিয়েছিলাম, এই হাংগামাটা না বাধলে হয়ত সে দিয়ে যেত তোর বউদির হাতে।"

শংকর বললে, "কোথায় থাকে বল, আর একখানা চিঠি লিখে দাও, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"

গজা বললে, "কাছেই থাকে ওই খাল-পারে, কিন্তু আর হবে না। সে মুসলমান।"

মুসলমান!

গজা বললে, "হ্যাঁ। তোরাব আলিকে বলে গিয়েছিলাম—পঁচিশটে টাকা তোর বৌদির হাতে দিয়ে যেতে।"

কথাটা ধক করে এসে বাজল শংকরের বুকে। বললে, "তোরাব আলি? কেমন চেহারা বল দেখি? দেখতে কেমন?"

গজা বললে, "দেখতে আর পাঁচজন যেমন হয়। মুখে গোঁফ আছে, এইখানে চারটি দাড়ি আছে, রোগা পাতলা চেহারা, ভাল করে কথা বলতে পারে না। তোতলা।"

বুঝতে কারও বাকী রইল না। ঘনা, তারু, শংকর—তিনজনেই বুঝতে পারলে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "জানে মের না বাবু, বাড়িতে আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে।"

তারুর হাতটা কেমন যেন ঝিন্‌-ঝিন্‌ করে উঠল। এই হাত দিয়ে সে তাকে মেরেছিল।

শংকর বললে, "পঁচিশটে টাকা সে দিয়ে গেছে। আমি বউদির হাতে দিয়েছি।"

শংকরের গলাটা মনে হল যেন ধরা-ধরা। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা তাই-বা কে জানে!

কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয় এই পৃথিবীতে।

প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। থেমে গেল।

নরমেধ যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল সত্যাশ্রয়ী এক বৃদ্ধ তাপস। মুণ্ডিত-মস্তক স্খলিতদন্ত নির্ভীক এক ভিখারী এসে দাঁড়াল মানুষের কাছে। বললে, বনের হিংস্র পশুর কাছে আসিনি আমি। এসেছি মানুষের কাছে। মানবতার পূজারী আমি। পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে তোমরা এসে দাঁড়াও আমার সম্মুখে। আমি তোমাদের সেবা করব। পূজা করব তোমাদের।

হোমাগ্নিশিখা নির্বাপিত হল।

শংকরের আর কোনও কাজ নেই।

সুরপতি ধরলে তাকে। বললে, "এস তুমি আমার সঙ্গে। তোমাকে আমি রাইফেল চালাতে শেখাব। আজকালকার দিনে এ-সব শিখে রাখা ভাল।"

রাইফেল, রিভলবার শিখতে শংকরের মোটেই দেরি হল না। দশদিন যেতে-না-যেতেই সুরপতি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলে, শংকর তার বন্দুক দিয়ে একটা উড়ন্ত পাখিকে নামিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে শংকরের টারগেট প্র্যাকটিস অব্যর্থ হয়ে উঠল।

কিন্তু অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে এই শংকর। তারপর কোথায় যে সে ডুব মারলে, সুরপতি তার আর কোনও সন্ধানই পেলে না।

মায়ের তাড়া খেয়ে আবার তাকে ইস্কুলে যেতে হল।

কিন্তু ইস্কুল তখন তার নাম কেটে দিয়েছে। অনেকগুলো টাকা লাগবে।

লজ্জায় সে তার মাকে কিছু বলতেও পারলে না।

অতগুলো টাকা মা তার পাবেই-বা কোথায়।

ইচ্ছে করলে টাকা সে অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু ইচ্ছে তার কিছুতেই হল না।

ক্লাসে গিয়ে বসতেও তার ভাল লাগে না। মনে হয় যেন ছেলেগুলো সবাই তার চেয়ে বয়েসে ছোট।

চারিদিকে সেদিন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। অসম্ভব গরম। শংকর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে বইখাতা নিয়ে। মা জানে সে ইস্কুলে গিয়েছে।

ইস্কুলের বাইরে বাঁদিকের একখানা বাড়ির ছায়ায় নতুন একখানা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার সামনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পা দুটো দোরের বাইরে বেরিয়ে আছে। গাড়িখানা কার—শংকর জানে। তাদেরই ক্লাসে পড়ে নরেন—মস্ত বড়লোকের ছেলে। লেখাপড়া করে না। পিছনের বেঞ্চে বসে থাকে। গাড়ি নিয়ে ইস্কুলে আসে। আবার সেই গাড়ি করেই বাড়ি যায়।

শংকর সময়টা কাটাবার জন্যে গাড়ির দোর খুলে পিছনের সিটে গিয়ে বসল। ফুর-ফুর করে হাওয়া বইছিল। বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারেনি।

ঘুম যখন ভাঙল, দেখলে গাড়ি তখন চলছে। পাশে বসে আছে নরেন।

নরেন হাসছে ফিক্‌-ফিক্‌ করে।

শংকর বললে, "দাঁড়াতে বল, আমি নেমে যাব।"

নরেন বললে, "নামতে হবে না। চল আমাদের বাড়িতে ক্যারম খেলবি।"

শংকর বললে, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়াবি ত যাই।"

নরেন বললে, "খাওয়াব। কিন্তু হাঁরে, তুই এতদিন ইস্কুল আসিসনি কেন? আজও ত দেখলাম ক্লাসে ঢুকেই পালিয়ে এলি।"

শংকর বললে, "একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা লাগবে। দেব কোত্থেকে?"

নরেন কী যেন ভাবলে। ভেবে বললে, "আমি যদি দিই!"

"ধেৎ! তোর টাকা আমি নেব কেন? আমার আর পড়তে ভাল লাগে না।"

নরেন বললে, "ঠিক বলেছিস মাইরি, আমারও ভাল লাগে না। কিন্তু মা ছাড়ে না যে!"

শঙ্কর চুপ করে রইল। নরেন তার কাছে একটু এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, "চেহারাটা আচ্ছা বাগিয়েছিস কিন্তু। কী করে বাগালি বল ত?"

শঙ্কর বললে, "তোর এমনি হতে ইচ্ছে করে?"

নরেন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "করে না আবার! তুই পারিস করে দিতে?"

শঙ্কর বললে, "নিশ্চয় পারি।"

"কী করতে হবে বল। খুব খেতে হবে?"

শঙ্কর হাসলে। বললে, "না।"

গাড়ি এসে দাঁড়াল নরেনদের বাড়ির দরজায়। চমৎকার বাড়ি। কিন্তু লোক নেই বাড়িতে। নরেনের বিধবা মা আর সে। বাকী সব দাসদাসী।

শঙ্করকে নিয়ে গিয়ে নরেন প্রথমেই তার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে, "মা, আমরা একসঙ্গে পড়ি। এর নাম শঙ্কর। আমরা কিন্তু এক্ষুনি মাংস আর লুচি খাব।"

মা বললেন, "মাংস ত এক্ষুনি হয় না বাবা, দোকান থেকে তাহলে আনিয়ে দিতে হয়।"

"তাই দাও।"

লুচি-মাংস আনাতে দেরি হল না, কিন্তু শঙ্কর কী যে দেখলে এই মা আর ছেলেটির ভিতর, তার পরদিন থেকে তার আর টিকিটি দেখা গেল না। নরেন তার বাড়ির ঠিকানাও জানে না যে খুঁজে বের করবে।

নরেনের মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কই রে, তোর সেই বন্ধুটি কোথায় গেল?"

নরেন বললে, "টাকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়ত। ভারী গরিব। টাকার অভাবে ইস্কুলে যেতে পারছে না।"

"কত টাকা?"

"জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিছুতেই বলতে চাইলে না।"

মা বললেন, "ভাল ছেলে। জিজ্ঞাসা করবি কত টাকা। আহা, টাকার অভাবে পড়তে পারছে না! টাকা আমি দেব।"

সেইদিন থেকে নরেন খুঁজে বেড়াতে লাগল শঙ্করকে।

শঙ্করের আর এক বন্ধু বিজন। বড়লোকের ছেলে—নতুন একটি বাইক কিনেছে। হঠাৎ তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। বাইকটি শঙ্করকে দেখাবার জন্যে বিজন বাইক থেকে নামল।

"দ্যাখো কেমন সুন্দর বাইক। কত দাম জান?"

শঙ্কর বললে, "জানবার দরকার নেই। গরিব মানুষ, কোনদিন কিনতে ত পারব না। তবে বাইকে চড়া যদি শিখিয়ে দিস ত শিখতে পারি তোর বাইকে।"

বিজন বললে, "এস। একদিনেই শিখিয়ে দেব। বোস এইখানে।"

শঙ্কর প্রস্তুত। বিজনের বাইকের পেছনে চড়ে তক্ষুনি চলে গেল সে বাইকে চড়া শিখতে।

শঙ্করের শিখতে অবশ্য দেরি হল না।

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা নেশা আছে। বিজনের বাইক চড়ে শঙ্কর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শেষে একদিন বললে, "দিন কয়েকের জন্যে দিবি তোর বাইকটা?"

"কেন দেব না? নিয়ে যাও।"

সেই বাইক নিয়েই শঙ্কর এসেছিল। এসেছিল অরিন্দম ঘোষালের বাড়িতে। এক দিন নয়, দিনের পর দিন বিজনের বাইকটি ছিল তার সঙ্গে।

রাস্তায় বিজনের সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল, বিজন ফেরত চেয়েছিল তার বাইক। শঙ্কর বলেছিল, "দাঁড়া না। অত ছটফট করছিস কেন?"

বিজন হয়ত ভেবেছিল, শঙ্কর তার বাইকটা আর দেবে না। তাই সে ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঘোষাল-বাড়ির সামনে যে-কেলেঙ্কারি করে এল, শঙ্কর সেকথা ভুলবে না কোনদিন।

ঘোষাল-বাড়ি তাকে ছাড়তে হল চির-দিনের জন্যে।

এই ছাড়ার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল নরেন।

নরেনের মার হাতে লুচি আর মাংস খেয়ে

"দাঁড়া না, অত ছটফট করছিস কেন?"

যে নরেনকে সে পরিত্যাগ করে এসেছিল, আবার একদিন হঠাৎ সে তারই কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, "আমাকে টাকা দিবি বলেছিলি, কই দে।"

নরেন জিজ্ঞাসা করলে, "কত টাকা?"

শংকর বললে, "আপাতত পঞ্চাশ টাকার কম নয়।"

নরেন তারপর মার কাছ থেকে পঞ্চাশটি টাকা এনে শংকরের হাতে দিয়ে বললে, "আমার শরীরটাকে তোর মত করে দিবি বলেছিলি, তার কী হল?"

শংকর বললে, "আমি যা বলব শুনবি ত?"

নরেন বললে, "শুনব।"

"পরশু সকালে এসে তোকে নিয়ে যাব। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবি।" বলেই শংকর চলে গেল।

নরেন ভেবেছিল হয়ত সে আর আসবে না।

ভাবনাটা তার আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল, যখন দেখলে, যার জন্যে টাকা নেওয়া, সেই ইস্কুলেও সে যায়নি। শংকরের উপর মনটা তার বিরূপ হয়েই রইল। ভাবলে, ছেলেটা জোচ্চোর।

শংকর কিন্তু সেই টাকা নিয়ে প্রথমেই গেল বোসবাগানে। উত্তর দিকে ছোট যে বস্তিটি ছিল, খুঁজে বের করলে সেখান একখানি ছোট ঘর। মাকে তার ঘোষাল-বাড়ি থেকে আনতেই হবে।

নিয়েও এল মাকে। কিন্তু যে দাম দিয়ে আনতে হল, সে-কথা মনে তার গাঁথা হয়ে রইল চিরজীবনের মত। বড়লোকেরা হয়ে রইল তার দু'চক্ষের বিষ।

নরেনকে সে কথা দিয়ে এসেছে। সে-কথা তাকে রাখতেই হবে।

বোসবাগানের ক্লাব-ঘরে তখন তালা ঝুলছে।

শংকর গিয়ে দাঁড়াল সুরপতির কাছে। চাবিটা চেয়ে এনে ক্লাব খুললে। বন্ধুদের বললে, "ঝাটপাট দিয়ে পরিষ্কার কর। আমি আসছি।"

নরেনকে নিয়ে এল বোসবাগান ক্লাবে। শুধু নরেনের জন্যেই বোসবাগান ক্লাব আবার চালু হল।

নরেনকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগল শংকর। শরীরটাকে তার শক্ত করে তুলতে হবে। সানন্দে সে-দায়িত্ব শংকর গ্রহণ করেছে তার অর্থের বিনিময়ে।

নরেন একদিন চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলে শংকরকে, "ইস্কুল যাওয়া তুই ছেড়ে দিয়েছিস, না রে?"

শংকর বললে, "হ্যাঁ।"

"আমারও ইচ্ছে করে। কিন্তু মার ভয়ে পারি না।"

"মাকে তুই ভয় করিস নাকি?"

নরেন বললে "কচু! বল্ না তোর কত টাকা চাই। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।"

টাকার জন্যে তখন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে শংকর। নরেনের দেওয়া পঞ্চাশ টাকা তার কবে খরচ হয়ে গিয়েছে।

শংকর বললে, "কেমন করে আনবি? মা তোর বকবে না?"

নরেন বললে, "মা জানলে ত!"

শংকরের মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। বললে, "চুরি করে আনবি? ছি, চুরি করিস না।"

নরেন বললে, "চুরি কেন করব? গাড়ি বাড়ি টাকাকড়ি সবই ত আমার। আমিই মালিক। আমারই ত সব।"

শংকর আর-কিছু জানতে চাইলে না। বললে, "তাহলে আরও পঞ্চাশটা টাকা এনে দে।"

পরের দিন সকালে নরেন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। অন্যদিন গাড়ি নিয়ে আসে, সেদিন এল পায়ে হেঁটে। শংকর তখন খালি গায়ে ক্রমাগত ডন টেনে টেনে শরীরটাকে গরম করছে।

নরেন বললে, "উঠে আয় দেখি একবার।"

শংকরকে সে ক্লাবঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে হাসতে লাগল, মনে হল, যেন সে দিগ্বিজয় করে এসেছে।

"শংকর বললে, "হাসছিস কেন? কী বলবি বল।"

নরেন বললে, "আমার মা ত লেখাপড়া জানে না, তাই ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা থাকে না। মায়ের সিন্দুকে আলমারিতে যেখানে সেখানে শুধু তাড়া তাড়া নোট।"

শংকর বললে, "থাকবেই ত! তোরা বড়লোক।"

নরেন আবার হাসলে। বললে, "তুই ত পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলি, আমি সেই নোটের একটা বাণ্ডিল থেকে পাঁচখানি নোট বের করে' আনলাম তোর জন্যে। কিন্তু বাইরে এসে দেখি কি পাঁচটাই একশ টাকার নোট।"

শংকর বললে "তাতে কী হয়েছে? এক-খানা নোট ভাঙিয়ে আমাকে দে পঞ্চাশটা টাকা।"

নরেন তার পকেট থেকে ভাঁজকরা পাঁচ-খানা নোটই বের করলে, তারপর পাঁচ-খানাই শংকরের হাতে দিয়ে বললে, "এই নে আর ভাঙাতে পারি না। এখন কিন্তু আর চাইবি না।"

নরেন ভেবেছিল, মাসখানেক পরিশ্রম করলেই তার শরীরটা ঠিক শংকরের মত হয়ে যাবে। কিন্তু জন্মাবধি আদরের দুলাল শরীরটা তার গড়তে চায় না কিছুতেই। দুবার ডন টেনেই থপ করে শুয়ে পড়ে। পাঁচবার ওঠ-বোস করলেই কোমরে হাত দিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে। বলে, "দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নিই।"

শংকরের চেষ্টার ত্রুটি নেই। নিজে বার-বার দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

শেষে সব চেয়ে যা সহজ—ছোট ছেলেরা যা করতে পারে—শংকর তাকে তাই শেখায়।

দিন চার-পাঁচ শেখবার পরেই নরেন তার হাতখানা যার তার কাছে বাড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, "দ্যাখ ত, মাসেলটা কী রকম শক্ত হয়েছে।"

বুক চিতিয়ে চিতিয়ে চলে আর বলে, "এবার মেরে দিয়েছি।"

শংকর একদিন তাকে তিরস্কার করলে। বললে, "এরকম করলে কিছু হবে না।"

নরেন বলে, "তোর হল কেমন করে?"

শংকর বলে, "একদিনে হয়নি। এর জন্যে আমাকে অনেক কিছু করতে হয়েছে।"

নরেন বলে, "অনেককিছু করেছিস মানে ইস্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস, এই ত? আমিও ছেড়ে দিচ্ছি দ্যাখ না! তখন হোল টাইম এই শরীর নিয়েই থাকব।"

শংকর বলে, "না না, ইস্কুল ছাড়িসনি। আমি ভাল কাজ করিনি।"

নরেনকে নিয়ে শংকর সত্যিই একটু বিপদে পড়ল। তারই দয়ায় তাকে আজকাল সংসারের কথা ভাবতে হচ্ছে না, বিনিময়ে সে যদি তার শরীরটা একটু ভাল করে না দিতে পারে ত অন্যায় হবে।

শংকর বললে, "কাল থেকে তোকে আমি 'আসন' শেখাব।"

'আসন' অভ্যাস করতে গিয়ে নরেন এক-দিন চিৎকার ক'রে উঠল, "ওরে বাবারে, পাদুটো আমার ভেঙে গেল। এ আরও শক্ত। এ আমি পারব না।"

"পারবি না, মর!" বলে রাগের মাথায় শংকর তার মাথার উপর একটা চড় মেরে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তারপর তিন দিন আর নরেনের দেখা নেই।

চারদিনের দিন যদি-বা এল ত বসে রইল চুপটি করে।

শংকর বললে, "গায়ের জামাটা খোল। আরম্ভ কর।"

নরেন বললে, "আজ থাক। ব্যায়াম করছি তাই একটু খাওয়াদাওয়া বেশী হচ্ছে কি না—পেটের অবস্থা ভাল নয়।"

শংকর বললে, "তোর কিছু হবে না নরেন।"

"নাহক গে।" বলেই নরেন তার পকেট থেকে রূপোর একটা সিগারেটের কৌটো বের ক'রে ফেললে। তারপর কৌটোটা শংকরের সামনে খুলে ধরে বললে, "খাবি?"

শঙ্কর বললে, "এ আবার কবে ধরলি?"

একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দিয়াশালাই জ্বালিয়ে নরেন বললে, "ধরেছি।"

দেখেশুনে মনে হচ্ছে, নরেনের আর তেমন গা নেই।

একদিন আসে ত পাঁচদিন আসে না।

শঙ্করও হাল ছেড়ে দিয়েছে।

এমনদিনে শঙ্কর একদিন ক্লাবে গিয়ে শুনলে, নরেন নাকি আজকাল প্রতিদিন বই-খাতা নিয়ে দশটার সময় ক্লাবে আসে, দুটো বেঞ্চি জোড়া করে তার উপর পড়ে পড়ে সারা দুপুরটা ঘুমোয়, তারপর চারটের আগেই উঠে পালিয়ে যায়।

দুপুরে একদিন শঙ্কর তাকে গিয়ে ধরলে। "ইস্কুলে যাস না বুঝি?"

নরেন বললে, "না, ভাল লাগে না।"

শঙ্কর বললে, "ভাল কাজ করছিস না নরেন।"

নরেন বললে, "ভাল মন্দ আমি বুঝব। তুই থাম।"

শঙ্কর থামল। আর কোনও কথাই সে বললে না।

নরেনের মোটরটা একদিন সকালে ক্লাবের সমুখে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর ভেবেছিল, নরেন আসছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল ড্রাইভার। ক্লাবের দরজায় এসে বললে, "শঙ্করবাবু আছেন?"

শঙ্কর বেরিয়ে এল।

ড্রাইভার বললে, "মা আপনাকে ডাকছেন।"

শঙ্কর গাড়ির কাছে এসে দেখে, নরেনের মা বসে আছেন গাড়িতে।

শঙ্করকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "আমার নরেনকে তুমি কী বলেছ?"

শঙ্কর বললে, "কিছু করছে না বলে একটু বকেছি।"

মা বোধ হয় তৈরি হয়েই এসেছিলেন। বললেন, "থাক, আর সাধু সাজতে হবে না। নরেনকে তুমি ইস্কুল যেতে বারণ করেছ। বলেছ, চব্বিশ ঘণ্টা প্রাকটিস না করলে শরীর ভাল হবে না।"

শঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলে, "কে বললে এ-কথা?"

"যাকে বলেছ সেই বলেছে।"

শঙ্কর বললে, "নরেনকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করব।"

নরেনের মা বললেন, "সে আর আসবে না এখানে। তোমার ভয়ে সে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। তুমি তার হাত মুড়ে দিয়েছ, পা ভেঙে দিয়েছ, টাকাকড়ি কত যে নিয়েছ তা তুমিই জান। তুমি একটি গুণ্ডা, তুমি জোচ্চোর, তুমি শয়তানের একশেষ।"

মাথা হেঁট করে শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার ঝিমঝিম করছে। এ সময় নরেনকে হাতের কাছে পেলে কী যে সে করত বলা যায় না। কিন্তু নরেনের মাকে কিছুই সে বলতে পারলে না।

নরেনের মা বললেন, "তুমি আর কোনদিন আমার বাড়ির দরজা মাড়াবে না। আবার যদি নরেনের সঙ্গে তোমাকে দেখতে পাই ত আমি কিছু বাকী রাখব না বলে দিচ্ছি।"

এই কথা বলে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, "চল।"

গাড়ি চলে গেল। শঙ্কর তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে।

নরেন বড়লোক! অরিন্দম ঘোষালের বড় ছেলেও বড়লোক।

জনকতক ছেলে ছিল ক্লাবের ভিতর বসে। তারা সবই শুনেছে। একজন বেরিয়ে এল। ডাকলে, "শঙ্কর দা!"

"উঁ।"

"তুলে আনব একদিন নরেনকে?"

শঙ্কর চুপ করে কী যেন ভাবছে। জবাব দিলে না।

"দেব নাকি আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে?"

শঙ্কর বললে, "না।"

ক্লাব-ঘরের দোরের কাছে গিয়ে বললে, "বন্ধ কর।"

"এক্ষুনি?"

"হ্যাঁ।"

ক্লাব-ঘর বন্ধ করে চাবিটা হাতে নিয়ে শঙ্কর বললে, "আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

অরিন্দম ঘোষালের বড় ছেলে তাকে মেরেছিল। সে জ্বালা সে তখনও ভোলেনি। আজ নরেন তাকে যে-মার মারলে, সে-মারের জ্বালা যেন আরও মর্মান্তিক।

ক্লাব-ঘর বন্ধ করে শঙ্কর তার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল, পথের মধ্যে নাদুশ-নুদুশ এক প্রিয়দর্শন যুবক তাকে দেখেই থমকে থামল।

"চিনতে পারছেন?"

শঙ্কর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। চেনা-চেনা মনে হল। মনে হল কোথায় যেন দেখেছে তাকে। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে পড়ল না।

শঙ্কর বললে, "না, ঠিক চিনতে পারছি না।"

ছোকরা বললে, "আমি মডার্ন প্রিন্টিং থেকে আসছি।"

শঙ্করের মনে পড়ল। বললে, "ও, আপনাদের সেই হ্যান্ড বিল ছাপানো বিলের দরুন পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়নি।"

"আজ্ঞে না। পঁচিশ টাকা নয়, কুড়ি টাকা। পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন। মাঝে আমি একবার আপনার খোঁজে এসেছিলাম। শুনলাম ক্লাবটা বন্ধ হয়ে গেছে।"

শঙ্কর বললে, "আবার বন্ধ করে দিলাম।"

ছেলেটি একটু অবাক হয়ে গিয়ে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আবার বন্ধ করে দিলেন?"

শঙ্কর বললে, "তা হক। তোমাদের টাকা আমি মারব না। নেয়ে এস।"

শঙ্করের মন-মেজাজের ঠিক ছিল না, তাই সে আপনি বলতে গিয়ে তুমি বলে ফেলেছে। বলেই কিন্তু সে তার ভুলটা বুঝতে পারলে। বললে, "আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে তুমি বলে ফেললাম।"

ছেলেটি বললে, "তুমি আমাকে তুমিই বল শঙ্করদা, আমিও তোমাকে 'তুমি' বলব। শোন শঙ্করদা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

এই বলে ছেলেটি শঙ্করের একখানি হাত ধরে মিনতিকাতরকণ্ঠে তাকে অনুনয় করে রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বসালে। প্রথমেই নিজের পরিচয় দিলে।

বললে, "আমার নাম শ্রীহরি। মডার্ন প্রিন্টিং আর টাইপ ফাউন্ড্রির যিনি মালিক আমি তাঁর ছোট ছেলে। আমি কিন্তু তোমার কাছে বিলের টাকা চাইতে আসিনি শঙ্করদা। ও-টাকা তোমাকে দিতে হবে না। ওরকম কত মোটা টাকা আমাদের মারা যায়। আমি এসেছি অন্য কারণে।"

শ্রীহরি প্রথমেই তার কারণটি সবিস্তারে বর্ণনা করলে। প্রথম যেদিন সে ছাপাখানার বিল নিয়ে এসেছিল, শঙ্করকে দেখে সেইদিনই সে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছে। চুপি চুপি কতদিন সে তার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে শঙ্করকে দূর থেকে দেখিয়েছে কিন্তু শঙ্করের সঙ্গে কথা বলবার সাহস তার কোনদিন হয়নি।

শ্রীহরির কথা বলবার ভঙ্গীটিও অপরূপ। ফোলা-ফোলা গাল আর ছোট ছোট দুটি চোখ। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলবার সময় আনন্দের উত্তেজনায় তার সেই চোখদুটি গালের ভিতর ঢুকে কেমন যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। কালো কালো দুটি চোখের তারা শুধু গর্তের ভিতর থেকে জ্বল জ্বল করতে থাকে।

"তোমাকে আমার কী ভাল যে লেগেছে শঙ্করদা, তা আর কী বলব? তোমার দেখাদেখি আমিও একটা ক্লাব করে ফেলেছি আর সেইদিন থেকে খালি খালি ভাবছি, কেমন করে তোমাকে আমাদের ক্লাবে একদিন নিয়ে যাব। এই ক্লাবটা বন্ধ হয়ে গেল শুনে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে শঙ্করদা, আমি মাইরি বলছি।"

এই বলে শ্রীহরির সে কী হাসি!

গোলাকার একটা মাংসপিণ্ডের ভিতর সাদা সাদা দাঁতগুলি দেখা যায়, খিক খিক করে' হাসে, আর দুলতে দুলতে দুহাত দিয়ে শঙ্করের গায়ের উপর ক্রমাগত চড় মারতে থাকে।

শঙ্করের মুখে কিন্তু হাসি নেই। সে যেন আরও শক্ত হয়ে গিয়েছে। ভাবছে, এ-ও নরেনের মত আর-এক বড়লোকের ছেলে।

শঙ্কর বললে, "দাও, তোমার ঠিকানা দাও। আমি একদিন যাব তোমাদের ক্লাবে।"

সংবাদটা শুনে শ্রীহরির আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যাবার কথা, কিন্তু শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে আর তার কথা বেরুল না মুখ থেকে। বললে, "এই ত গঙ্গার ধারে ঝিলপাড়ায় আমাদের বাড়ি। ক্লাবটা ওইখানেই। তের নম্বর সুধাকান্ত রায় লেন।"

পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে' ঠিকানাটা শঙ্কর লিখে নিলে।

শ্রীহরি বললে, "ক্লাবে আমাদের টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমরা চালাতে পারছি না শঙ্করদা। বলতে ভরসা হচ্ছে না, তবু একটা কথা বলব?"

"বল।"

"তুমি আমাদের সেক্রেটারি হবে?"

শঙ্কর বললে, "সে-সব পরে দেখা যাবে। তুমি এখন যাও।"

শ্রীহরিকে বিদায় করে দিয়ে শঙ্কর তার বাড়ি গেল। মাকে গিয়ে বললে, "এখান থেকে চল মা, অন্য জায়গায় যাই।"

বিমলা বললে, "কেন রে, এখানে ত আমরা ভালই আছি।"

শঙ্কর বললে, "না মা, আরও ভাল থাকতে হবে।"

আবার একটা বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশী দেরি হল না শঙ্করের।

এবারেও এক গরিবের বস্তির একটেরে ছোট একখানি বাড়ি।

কোথায় যে উঠে গেল বোসবাগানের কেউ জানল না শুনল না, ক্লাব-ঘরের চাবিটা শুধু একজনের হাতে দিয়ে সুরপতির কাছে পাঠিয়ে, শঙ্কর চলে গেল সেখান থেকে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় ঝিলপাড়ায় গিয়ে তের নম্বর সুধাকান্ত রায় লেনের বাড়িটা খুঁজে বের করলে শঙ্কর। টিনের একখানা লম্বা ঘর, পিছনের দিকে অনেকখানা জায়গা পড়ে আছে—আগাছার জঙ্গলে ভরা।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে শঙ্কর দেখলে, ঘরের ভিতর একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে জন দশ-বারো ছোকরা বসে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে হিন্দী সিনেমার একটা গান গাইছে, আর শ্রীহরি একটা চেয়ারে বসে বসে তাল ঠুকছে।

শঙ্কর ডাকলে, "শ্রীহরি!"

মুখ বাড়িয়ে শঙ্করকে দেখেই শ্রীহরি লাফিয়ে উঠল। "ওরে থাম থাম তোদের গান থামা। ওই দ্যাখ কে এসেছে। এস এস শঙ্করদা, ভেতরে এস। আজ আমাদের কী সৌভাগ্য!"

দুহাত দিয়ে টানতে টানতে শঙ্করকে ভিতরে নিয়ে এসে চেয়ারের উপর বসালে শ্রীহরি। সবাইকার সঙ্গে পরিচয় করে দেবার দরকার হল না। শ্রীহরির মুখে শঙ্করদার নাম আর প্রশংসা শুনে শুনে তারা হয়রান হয়ে গিয়েছে।

শঙ্করের মুখের দিকে হাঁ করে সবাই তাকিয়ে রইল।

তা তাকিয়ে থাকবার মত চেহারাই বটে।

শ্রীহরি বললে, "আমাদের ক্লাবের নাম দিয়েছি—ঝিলপাড়া শক্তি মন্দির। ভাল নাম হয়নি শঙ্করদা?"

শঙ্কর এতক্ষণ পরে একটা কথা বললে। বললে, "না।"

শ্রীহরির গালের মাংসপিণ্ডের ভিতর চোখ দুটি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কেন শঙ্করদা?"

শঙ্কর বললে, "যা দেখছি তাতে ত মনে হচ্ছে—সঙ্গীতমন্দির।"

শ্রীহরি কিন্তু অপ্রস্তুত হল না। বললে, "এস তবে, দেখবে এস।" বলেই ফট করে একটা আলোর সুইচ টিপে শঙ্করকে তুলে নিয়ে গেল পিছনের সেই আগাছার জঙ্গলে। বললে, "দেখেছ কত জায়গা পড়ে আছে! আমার ইচ্ছে আছে এখানে অনেক-কিছু করবার, কিন্তু—"

বলেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "কেমন করে করতে হয় কিছুই ত জানি না। তবে আর তোমাকে ডাকছি কেন?"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "টাকা আছে ক্লাবের?"

শ্রীহরি বললে, "আছে।"

"কত?"

"তা প্রায় একশর কাছাকাছি।"

শঙ্কর মৃদু একটু হাসলে। বললে, "কাল আমি আসব। টাকাটা আমার হাতে দিও। দেখি কী করতে পারি।"

পরের দিন শঙ্কর এল। টাকাটা নিলে। কাজও আরম্ভ করলে।

প্রথমে মজুর লাগিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করলে। দুটো হরাইজ্যাণ্টাল বার বসানো হল। বড় একটা আমগাছের ডালে শক্ত দড়ি দিয়ে রিং টাঙানো হল। কুস্তির জায়গা ঠিক হল। নিজের হাতে শঙ্কর মাটি তৈরি করলে। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে শ্রীহরির দেওয়া "ঝিলপাড়া শক্তিমন্দির" নামে চমৎকার একটি সাইন বোর্ড লিখিয়ে টাঙিয়ে দিলে দোরের মাথায়।

তারপর একদিন খুব ঘটা করে ঝিলপাড়া শক্তি-মন্দিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

শ্রীহরি তাদের ছাপাখানা থেকে কার্ড ছাপিয়ে আনলে। সভায় সভাপতিত্ব করলেন শ্রীহরির বাবা। প্রধান অতিথি হলেন পাড়ার একজন ধনী ব্যক্তি। যাঁরা এলেন, খুব করে তাঁদের সন্দেশ খাওয়ান হল।

টাকা জোগালে শ্রীহরি।

টাকা সে কোত্থেকে আনলে শঙ্কর কিছু দেখলে না। জানতেও চাইলে না।

তবে শঙ্করকে জানলে সবাই।

সবাই দেখলে প্রিয়দর্শন স্বাস্থ্যবান এক যুবক এর উদ্যোগী। পাড়ার ছেলে শ্রীহরিকে সামনে রেখে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে সে।

শ্রীহরি ত আনন্দে আটখানা হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার ফুলো ফুলো গাল দুটি যেন আরও ফুলে উঠল।

পাড়ার ছেলেরা স্বাস্থ্যের চর্চায় মন দিলে। সবাই বলতে লাগল, বাহাদুর ছেলে শ্রীহরি!

শঙ্কর রইল তার অন্তরালে। কিছুতেই চাইলে না সে নিজেকে জাহির করতে।

শঙ্কর না চাইলে কী হবে, সবারই নজর গিয়ে পড়ল তারই উপর।

শ্রীহরি একদিন বললে, "টাকার কী হবে শঙ্করদা? আর যে টাকার জোগাড় করতে পারছি না।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "এতদিন চালালি কেমন করে?"

শ্রীহরি বললে, "বাবা, মা, দাদা—সবারই কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা নিয়েছি। আর কিন্তু কেউ একটা পয়সা দিতে চাচ্ছে না।"

শঙ্কর বললে, "মেম্বার ত অনেক। তার ভেতর বড়লোকের ছেলে ত দেখি অনেক। তারা টাকা দেয় না?"

শ্রীহরি বললে, "টাকা দেবে! চাঁদার টাকা পর্যন্ত দেয় না।"

"সব তাড়িয়ে দে।"

শ্রীহরি চুপ করে রইল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কী? ইচ্ছে করছে না?"

শ্রীহরি বললে, "না, তাড়াব কেমন করে? বলতে কেমন যেন—"

শঙ্কর বললে, "লজ্জা করছে?"

"হ্যাঁ"

শঙ্কর বললে, আমি তাড়িয়ে দেব। সব গরিবের ছেলেকে মেম্বার করব। চাঁদা না দিয়ে থাকে ত তারাই থাকবে।"

শ্রীহরি বললে, "শক্তি-মন্দিরের অ্যারিস্টোক্রেসি চলে যাবে না? ছোটলোকের ছেলেরে ভর্তি হয়ে যাবে যে!"

শংকর যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। "ছোটলোক কাকে বলছিস? গরিব হলেই ছোটলোক হয় না। আমিও গরিব।"

নিষ্ঠুর নির্মম শংকর—পাথরের মত শক্ত শংকর যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেল বড়লোকের বখাটে ছেলেদের অপমান করবার।

"ভাল ভাল কাপড়-জামা পরতে পার, সিগ্রেট ফুঁকতে পার, আর ক্লাবের চাঁদা দিতে পার না? বেরোও সব, দূর হয়ে যাও এখান থেকে!"

কতকগুলো সত্যিই চলে গেল। দু-একজন বেঁকেও দাঁড়াল। কিন্তু বাঁকাকে সোজা করতে দেরি হল না শংকরের। মার খেয়ে তারা আর সে-রাস্তা মাড়ালে না। দূরে থেকে শংকরকে গালাগালি দিতে লাগল।

আবার কেউ কেউ চাঁদার টাকা জমা দিয়ে শংকরের আনুগত্য স্বীকার করলে।

শংকর একদিন শ্রীহরিকে বললে, চাঁদার একটা মোটা বই ছাপিয়ে নিয়ে আয় তোদের ছাপাখানা থেকে। তাতে লেখা থাকবে—দরিদ্র-ভাণ্ডার। ঝিলপাড়া শক্তিমন্দির দ্বারা পরিচালিত। বড়লোক যারা, টাকা যারা খরচ করতে পারে, তাদের ধরবি। বলবি, চাঁদা দাও। যে দেবে না, আমাকে দেখিয়ে দিবি তাকে।"

শ্রীহরি খাতা ছাপিয়ে আনলে। তারপর চলতে লাগল—চাঁদা আদায়। যেখানে যার বাড়িতে কোনও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন, শ্রীহরির দল দরিদ্র-ভাণ্ডারের খাতা নিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হয়। টাকা আদায় না করে ছাড়ে না। বিয়ের কোন শোভাযাত্রা ঝিলপাড়ার কোন রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছে, খবর পাবামাত্র শক্তি-মন্দিরের ছেলেরা গিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, "আমাদের দরিদ্র-ভাণ্ডারে ভিক্ষা দিয়ে যান কিছু।" যাঁরা দেন, তাঁরা নির্বিবাদে পার হয়ে যান, দিতে যাঁরা চান না, তাঁদের হয় বিপদ। শক্তিমান যুবকদের হটিয়ে দিয়ে পার হওয়া সম্ভব হয় না। শংকর থাকলে ত নয়ই।

সেদিন ছিল এক মস্ত বড়লোকের ছেলের বিয়ে। খুব ঘটা করে ব্যান্ড বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা পার হচ্ছে। শক্তিমন্দিরের ছেলেরা গিয়ে দাঁড়াল। বর-কর্তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে শংকর বললে, "দরিদ্র-ভাণ্ডারে কিছু দিয়ে যান।"

বরকর্তা হিসেবী মানুষ। কথাটাকে গ্রাহ্যই করতে চাইলেন না। বললেন, "কনের

"গেলাম, গেলাম!"

বাপ তোমাদের পাড়ার লোক, তাঁর কাছ থেকে নাওগে।"

শংকর বললে, "তিনি যা দেবার দিয়েছেন আজ সকালে।"

বরকর্তা বললেন, "আমরা বাইরের লোক, আমরা তোমাদের চাঁদা দিতে যাব কোন্ দুঃখে?"

শংকর বললে, "আপনি বড়লোক, তার ওপর আজ আপনার আনন্দের দিন। আপনি না দিলে দেবে কে?"

বরকর্তা কিছুতেই দেবেন না! ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, দেব না। পথ ছাড়। বেআইনী পথ আটকে রেখ না। ভাল কাজ হবে না।"

অনেকক্ষণ ধরে অনুনয়-বিনয় করলে শংকর। অনেক ভাল ভাল কথা বললে। বরকর্তার সঙ্গে যারা ছিল, তারাও বললে, "দিয়ে দাও কিছু।"

কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। বরকর্তা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, "একটি পয়সা ওরা যদি আদায় করতে পারে আমার কাছ থেকে, তাহলে জানব বাপের ব্যাটা।"

শংকর এবার অন্য মূর্তি ধরলে। বললে, "বড়লোক আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত ছোটলোক চামার আমরা এই প্রথম দেখলাম।"

"কী বললি?" বলে একজন নেমে এল গাড়ি থেকে। নেমে এল বোধহয় শংকরকে মারবার জন্যে। যেই সে হাত তুলেছে, শংকর তার হাতখানা চেপে ধরলে। লোকটা 'গেলাম গেলাম' বলে চেঁচিয়ে উঠল। শংকর তার হাতখানা ছেড়ে দিতেই সে তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে চিৎকার করে লোক জড় করতে লাগল। বললে, "গুণ্ডা—ব্যাটা শয়তান! মার ব্যাটাকে।"

চার-পাঁচখানা গাড়ি খালি করে বরযাত্রীর দল হৈ হৈ করে ছুটে এসে আগলে দাঁড়াল শক্তিমন্দিরের ছেলেদের। কিন্তু কেউ কারও গায়ে হাত তুলতে সাহস করলে না। মুখে যা আসে তাই বলে অপমান করতে লাগল।

ওদিকে ফুল পাতা দিয়ে হাঁসের মত সাজানো বরের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে পিছনে। বরযাত্রীদের ভিতর কে একজন তখন টেলিফোন করে থানায় খবর দিয়ে দিয়েছে।

গোলমাল তখনও থামেনি। থানা থেকে একখানা জিপগাড়ি এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামল দুজন কনেস্টবল। সঙ্গে একজন অফিসার।

বরকর্তা নিজে গাড়ি থেকে নেমে এসে থানা-অফিসারকে নমস্কার করে বললেন, "দেখুন স্যার, দেখুন, এই গুণ্ডা ছোঁড়াগুলো রাস্তার মাঝখানে আমাদের কীরকম বেইজ্জত করছে দেখুন। আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চায়।"

কে একজন বললে, "ওদিকে বিয়ের লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, আর এদিকে পাবলিক রোডের ওপর দাঁড়িয়ে এই গুণ্ডামি।"

শক্তিমন্দিরের জন-পাঁচ ছেলে মাত্র শঙ্কর আর শ্রীহরির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে তখন, বাকী সব পুলিস দেখেই পালিয়েছে।

পুলিস-অফিসার শ্রীহরিকে বোধহয় চিনতেন। বললেন, "ছি-ছি, বড় অন্যায় করেছ তোমরা। ও'দের ছেড়ে দাও।"

শ্রীহরি বললে, "আমরা কিছু অন্যায় করিনি স্যার। অত বড়লোক, প্রসেশন করে ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, আমরা দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্যে কিছু ভিক্ষা চেয়েছিলাম। এরকম সবাইকার কাছেই চাই। হাসিমুখে সবাই কিছু কিছু দিয়ে যান। উনিই রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা পয়সা যদি আদায় করতে পার ত জানব বাপের ব্যাটা।"

থানা-অফিসার কৌশল করে বললেন, "থাক, তোমাদের কথা পরে শুনছি। তোমরা বোস আমার এই জিপে।" বলেই তাড়াতাড়ি শঙ্কর আর শ্রীহরিকে জিপে তুলে দিয়ে বরকর্তাকে নমস্কার করে বললেন, "যান আপনারা চলে যান।"

এই বলে নিজেও চট করে জিপে উঠে জিপ চালিয়ে দিলেন থানার দিকে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?"

অফিসার বললেন, "থানায়।"

বরকর্তা বললেন, "কেমন জব্দ!" বলেই তিনি তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সবাইকে হুকুম দিলেন হাসতে হাসতে। বললেন, "চল।"

চল বললেই চলা যায় না। এদিকে তখন আর-এক সর্বনাশ হয়ে বসে আছে। ড্রাইভারেরা এতক্ষণ গাড়ি থেকে নেমে মজা দেখছিল। গাড়ি চালাতে গিয়ে দেখে, দু-খানা চাকায় একবিন্দু হাওয়া নেই। চাকাদুটো একেবারে মাটিতে বসে গিয়েছে।

বরকর্তা বললেন, "স্টেপনি লাগাও।"

ড্রাইভার বললে "স্টেপনি ত একটা মশাই, এদিকে দুটো চাকাই যে পাংচার।"

ওদিকে হাঁসমার্কা বরের গাড়িখানাও তাই। সে-গাড়িরও দুটো চাকায় হাওয়া নেই।

থানার গাড়িটাও তখন নাগালের বাইরে। রাগে ফুলতে লাগলেন বরকর্তা।

থানার সমনে জিপ গিয়ে দাঁড়াল। শ্রীহরি আর শঙ্করকে থানা-অফিসার থানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "ওখানে কিছু বললাম না। কিন্তু তোমরা খুব অন্যায় করেছ।"

কৌশল করে জিপে বসিয়ে থানায় টেনে আনার জন্য শঙ্করের মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। বললে, "আজ্ঞে না, দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য কিছু চাওয়া অন্যায় নয়।"

অফিসার বললেন, "তাই বলে রাস্তার ওপর গাড়ি আটক করে?"

শঙ্কর বললে, "গাড়ি আমরা আটকাইনি। শোভাযাত্রা কিসের জন্য জানি না, দাঁড়িয়েছিল, আর ঠিক সেই সময় আমি নিজে গিয়েছিলাম বরকর্তার গাড়ির কাছে।"

থানা-অফিসার কথা বলছিলেন আর একটা কাগজে কী যেন লিখছিলেন। লিখতে লিখতে বললেন, "তাহলেও অন্যায় করেছিলে। বাড়িতে যেতে পারতে।"

শঙ্কর বললে, "কেন যাইনি তা আপনি বুঝবেন না।"

অফিসার তাঁর চোখদুটো বড় বড় করে তাকালেন শঙ্করের দিকে। বললেন, "আমি বুঝব না?"

"আজ্ঞে না। বুঝলে জিজ্ঞাসা করতেন না। কন্যাকর্তা আমাদের চেনা মানুষ, সকালে দশ টাকা দিয়েছেন, তার ওপর যখন দেখতেন তাঁর নতুন বেয়াইকে ধরেছি, তিনি তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে আসতেন, আর নয়ত দু-একটা টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়েই আমাদের বিদেয় করে দিতেন। যাক, আমরা চললাম। শ্রীহরি, ওঠ!"

অফিসার বললেন, "দাঁড়াও!"

বলেই তিনি তাঁর হাতের কাগজটা শঙ্করের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "এইখানে একটা সই করে দিয়ে যাও।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কী ওটা?"

অফিসার বললেন, "কিছু না। ওতে লেখা আছে শুধু পথের ওপর গাড়ি আটকে চাঁদা চাইতে যাওয়া অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের। আর কখনও এমন কাজ করব না।"

"ওইতে সই করতে হবে আমাকে? একা?"

"হ্যাঁ। শক্তিমন্দিরের হয়ে। অন্ বিহাফ অব ঝিলপাড়া শক্তিমন্দির।"

শঙ্কর বললে, "শক্তিমন্দিরের আমি কেউ নই।"

এই বলে চট করে থানা থেকে সে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে ডাকলে, "শ্রীহরি, সই করিসনি, চলে আয়।"

শ্রীহরিও বেরিয়ে যাচ্ছিল।

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, চিৎকার করে বললেন, "সই তুমি করবে না?"

শঙ্করও তেমনি চেঁচিয়ে জবাব দিলে, "না।"

"তোমার নামে আমি কেস করব।"

"করতে পারেন।"

শ্রীহরি তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শঙ্কর তার হাতে ধরে বললে, "আয়!"

যাবার জন্যে তারা পিছন ফিরল।

পিছন থেকে ও-সির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "ভাল কাজ করলে না কিন্তু। মনে থাকে যেন।"

শঙ্কর কথাটার জবাব দিলে না।

পরের দিন সকালে একটা ভারী মজার ব্যাপার ঘটে গেল।

কলকাতার কাছাকাছি কোন একটা জায়গা থেকে বর এসেছিল বিয়ে করতে। লগ্ন ছিল একটু দেরিতে। বরযাত্রীরা খেয়ে-দেয়ে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে গেল। কথা রইল, পরের দিন সকালে এইখানে কুশণ্ডিকা সেরে টানা গাড়িতে বরকর্তা বর-কনে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।

রাত্রে বিয়ের পর বর-কনেকে খাইয়ে কনের বন্ধুরা হৈ হৈ করে বরকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাসর-ঘরে। সারারাত তারা নিজেরাও ঘুমোয়নি, বরকেও ঘুমোতে দেয়নি। চারিদিক ফর্সা হয়ে যাবার পর তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে বর-ছোকরাটি বেরিয়ে পড়েছিল কলকাতার রাস্তায়। চায়ের পিপাসা পেয়েছিল বেচারার। রাত্রি জেগে বিয়ে-বাড়িতে সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। লজ্জায় চায়ের কথা কাউকে বলতে পারেনি। ভেবেছিল, পথের ধারে কোনও দোকানে বসে চট করে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়েই বাড়িতে ফিরে আসবে।

কাছেই গঙ্গা। চা খেয়ে একটা সিগারেট টানতে টানতে বর গিয়েছিল গঙ্গার ধারে। রাত্রি-জাগরণের পর গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া মন্দ লাগছিল না। তাই সে একটুখানি বসেছিল গঙ্গার কিনারে। বসে ভাবছিল গত রাত্রির আনন্দের কথা। ঘুমে কিন্তু চোখ তখন তার ভেরে এসেছিল।

বেলা আটটায় কুশণ্ডিকা বসবে। আয়োজন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বরকে ডাকতে গিয়ে দেখে বর নেই। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

বাড়ির একটা ছেলে গিয়েছিল শক্তি-মন্দিরে। ফিরে এসে বললে, "ওরা বলছে, বরকর্তাকে চাঁদাটা দিতে বল, বর আমরা এক্ষুণি খুঁজে এনে দিচ্ছি।"

বরকর্তা চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ ঠিক ওদেরই কাজ। আমি এক্ষুনি থানায় খবর দেব।"

সর্বনাশ! তার চেয়ে কেলেঙ্কারির ব্যাপার আর কী হতে পারে? পাড়ায়-

পাড়ায় ঘরে-ঘরে জানাজানি হয়ে যাবে, এই নিয়ে বিশ্রী আলোচনা চলবে, এমন কোন্ কঞ্জুসের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে হরিশ মুখুজ্যে, যে-লোকটা সামান্য চাঁদা না দিয়ে পাড়ার ছেলেগুলোকে এমন ক্ষেপিয়ে দিলে যে, কুশণ্ডিকার দিন জামাই চুরি হয়ে গেল? মেয়েও ত চুরি হয়ে যেতে পারত!

রাত্রে মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ এখন পাকা। হরিশ মুখুজ্যে ছুটে গিয়ে বেয়াই-মশাইয়ের হাত-দুটো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "যাক, আর থানা-পুলিস করে কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না বেয়াই, ছেলেদের চাঁদা আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

বরকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দিতে হবে?"

হরিশ মুখুজ্যে বললেন, "ওরা যা চায়, যাতে খুশী হয়।"

"এমনি করে করে আপনারাই মাথায় তুলেছেন ওদের।"

হরিশ মুখুজ্যে বললে, "না বেয়াই, ওরা আমাদের অনেক উপকার করে। এই পাড়াটা ছিল চোরের আড্ডা। মোটরকার যাদের আছে, তারা ত পাগল হয়ে গিয়েছিল। রোজ রোজ পার্টস চুরি যেতে লাগল। পশুপতি ভট্টাচার্যের গাড়িকে গাড়ি সাফ। ওই ছেলেরাই বাঁচালে। শঙ্কর বলে যে-ছেলেটি আছে, একদিন সে মাল সমেত ধরে ফেললে এক-ব্যাটা চোরকে, তারপর তাকে এই ক্লাবঘরে-না ঢুকিয়ে এমন মার মারলে যে, ব্যাটা তিনদিন পড়ে রইল ওইখানে। বাস্, চুরি গেল বন্ধ হয়ে।"

বরকর্তা বললেন, "ওদের শুধু মারলে কিছু হয় না। যে অভাবের জন্যে চুরি করে, সেই অভাবটা ওদের মিটিয়ে দিতে হয়।"

হরিশ মুখুজ্যে মুখ টিপে একটু হাসলেন শুধু। যে-কথা এর জবাবে বলা উচিত, নিজে কনের বাপ হয়ে বরের বাপকে সে-কথা সাহস করে বলতে পারলেন না। তাঁর ভাগ্নে শক্তিমন্দিরের একজন সভ্য। ডাকলেন, "সুধা!"

সুধা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বললে, "বলছেন কিছু?"

হরিশ মুখুজ্যে বললেন, "ডাক বাবা ওদের কাউকে। আমি ওই হাঙ্গামাটা মিটিয়ে ফেলি।"

বরকর্তা বললেন, "হ্যাঁ মিটিয়ে ফেলুন। কুশণ্ডিকার যত দেরি হবে, আমাদের ফিরে যেতেও তত দেরি হয়ে যাবে।"

সুধা বললে, "ওরা কেউ এখানে আসবে না মামা, টাকা নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে।"

বরকর্তা আবার বললেন, "হ্যাঁ যান। যা লাগে আপনিই এখন দিয়ে দিন। আমার টাকা বের করা আবার অনেক হাঙ্গামা, সুটকেশে চাবি বন্ধ করে রেখেছি। চাবিটা আবার মনের ভুলে কাল চলে গেছে আমার বড় ছেলের সঙ্গে।"

এবার হাসতে গিয়েও পারলেন না হরিশ মুখুজ্যে। কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বোধকরি একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি।

সুধাকে বললেন, "একটু দাঁড়া বাবা, আমি আসছি।"

দোতলায় উঠে গিয়ে টাকা সঙ্গে নিয়ে হরিশ মুখুজ্যে নিজে গেলেন শক্তি মন্দিরে। তারপর তাঁর বড়লোক বেয়াইএর সম্মান রক্ষা করে তাঁরই নামে চাঁদা দিয়ে এলেন পঞ্চাশ টাকা।

নির্বিঘ্নে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হয়ে গেল।

এই মজার ব্যাপারটা নিয়ে ঝিলপাড়ার ঘরে ঘরে আলোচনা চলতে লাগল। শঙ্করকে যারা চিনত না তারাও চিনলে। তার খ্যাতি যেন আর-একটু বেড়ে গেল ঝিলপাড়ায়।

এদিকে যখন এই অবস্থা, ওদিকে শঙ্করের সংসারে তখন দারুণ অনটন।

"বিমলা বললে, বেশ ত চালাচ্ছিলি, এখন আবার এ কীরকম হল বল দেখি?"

শঙ্কর বললে, "ভাল লাগছে না মা।"

বিমলা এতদিন বাড়িতেই বসেছিল। শঙ্কর তাকে কাজ করতে দেয়নি।

এবার আর সে শঙ্করকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। বেরিয়ে গেল কাজের সন্ধানে।

কলকাতা শহরে বিমলার মত মেয়ের কাজের অভাব হল না। তিনদিন এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে বেড়াবার পর চারদিনের দিন তার কাজ জুটে গেল।

যত বয়স বাড়ছে, কীরকম যেন হয়ে যাচ্ছে শঙ্কর। কেমন যেন রূঢ়, নির্মম, নিষ্ঠুর একটা মানুষ। কেমন যেন অশিক্ষার ছাপ পড়ছে তার মুখে।

মার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

বিমলা চঞ্চল হয়ে উঠল। এর প্রতিকার করতে হবে।

কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথই ত তার জানা নেই। মমতাময়ী মা হলে কী হবে, তারও ত শিক্ষা দীক্ষার একান্ত অভাব।

যে-বাড়িতে কাজ পেয়েছে বিমলা, সে-বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াতে দেয় না শঙ্করকে। দুবেলা সে গামছায় বেঁধে খাবার নিয়ে আসে। মা ছেলে বসে বসে খায়।

বাড়ির গিন্নি বলেন, "হ্যাঁ গা মেয়ে, তুমি এইখানে খেয়ে গেলেই পার। বাড়িতে মাছ মাংস রান্না হয়, শুনেছি তুমি ও-সব কিছু নিয়ে যাও না। ছেলেকেও রোজ রোজ নিরামিষ খাওয়াচ্ছ কেন বাছা?"

বিমলা বলে, "মাছ মাংস আমার ছেলে তেমন পছন্দ করে না।"

"ছেলে কত বড়?"

বিমলা বলে, "তা কুড়ি বাইশ বছরের হল।"

গিন্নী বলেন, "ছেলে লেখাপড়া শিখছে?"

"না মা, পয়সা নেই, লেখাপড়া শেখাতে পারলাম না।"

গিন্নী বলেন, "কাজকর্ম কিছু শেখালে না কেন? রোজগার করত।"

বিমলা বলে, "রোজগার যে একবারে করে না তা নয়। তবে বুঝতেই ত পারছ মা, আজকালকার দিনে মাথার ওপর একজন কেউ না থাকলে কিছু হয় না।"

গিন্নী বললেন, "ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে কলকাতা শহর, ছেলে খারাপ হয়ে যাবে।"

বিমলা বললে, "ঠিক বলেছ মা। সেই চেষ্টাই করি।"

কথাটা বিমলার বেশ মর্মে ধরে গেল। গিন্নী-মা ঠিকই বলেছে। শঙ্করের মাথার উপর একটা দায়িত্ব থাকা ভাল।

তাছাড়া নিজেরও ত একটা সাধ-আহ্লাদ আছে। ছেলে-বউ নিয়ে ঘর করবার ইচ্ছে কার না হয়?

বিমলা শঙ্করকে কিছু জানালে না। ভিতরে ভিতরে একটি মেয়ের সন্ধান করতে লাগল।

গিন্নীমার দাসীকে একদিন সেকথা বলেছিল বিমলা। অনেককেই বলেছিল একটি মেয়ের কথা।

কিন্তু রাঁধুনী বামনীর ছেলের জন্য বউ পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। গিন্নীর দাসীকে বিমলা একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "একটি মেয়ের কথা তোমাকে বলেছিলাম সন্ধান করেছিলে?"

দাসী তার মুখটা কেমন যেন অদ্ভুত রকমের করে বললে, "না মা, যে-সব বাড়িতে যাই, সে-সব বাড়িতে কি তোমার ছেলের জন্যে মেয়ে পাওয়া যায়? তোমার ছেলের বউ খোঁজা আমার কম্ম নয়।"

নাপিত-বউ এসেছিল গিন্নীমাকে আলতা পরাতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাটা সে শুনলে। বললে, এ-কথা আমাকে বলনি কেন মা? আমার হাতে একটি মেয়ে আছে। আমার বাড়ির পাশেই থাকে।"

নাপিত-বউকে বিমলা একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "মেয়েটি কত বড়?"

নাপিত-বউ বললে, "তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে, পরমা সুন্দরী, দেখলে মনে হয় পনর ষোল বছর বয়েস। বাপ কিন্তু খুব গরিব, সে-কথা আমি আগেই বলে রাখছি।"

বিমলা বললে, "আমার ছেলে কিন্তু রাজপুত্রের মত দেখতে। নিজের ছেলের কথা নিজের মুখে বলা সাজে না। তুমি যদি একদিন বেড়াতে বেড়াতে আসতে পার আমার বাড়িতে, ত দেখিয়ে দিই আমার ছেলেকে।"

নাপিত-বউ কিন্তু আগে ছেলে দেখতে রাজি হল না। বললে, "না মা, আগে তুমি বরং একদিন এস আমার বাড়িতে। মেয়েটি তোমাকে দেখিয়ে দিই। এই ত কাছেই আমার বাড়ি। নয়ান সুর লেন ধরে সোজা চলে যাবে। রাস্তার বাঁদিকে দেখবে একটা কেষ্টচুড়োর গাছ। সেই গাছটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে—খ্যাপার বস্তি কোনদিক দিয়ে যাব। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দেখিয়ে দেবে। তারপর খ্যাপার বস্তিতে ঢুকে বাঁদিকে দেখবে একটা পুকুরে ধোপারা কাপড় কাচছে। সেইখানে গিয়ে নেত্য নাপতিনীর বাড়ি খুঁজবে। ছোট ছেলেটি পর্যন্ত জানে আমার বাড়ি।"

সেই কথাই ঠিক রইল।

বিমলা বললে, "আমি আর দেরি করতে চাই না মা। কালই যাব।"

বিমলা ভেবেছিল শঙ্করকে কিছু জানাবে না। কিন্তু না জানিয়ে থাকতে পারলে না। নেত্য নাপতিনীর বাড়ি যাবার আগে ছেলেকে জানিয়ে যাওয়াই ভাল। ছেলে যদি শেষে বেঁকে বসে ত সব কিছু তার মিছে হয়ে যাবে।

মা আর ছেলে দুজনেই খেতে বসেছিল। বিমলা বললে, "আমার একটা কথা রাখবি বাবা?"

শঙ্কর বললে, "তোমার কথা কবে রাখিনি মা?"

বিমলা বললে, "মানুষের মরা-বাঁচার কথা কিছু বলা যায় না বাবা, আমি যদি ঝট করে কোনদিন মরে যাই ত আমার মনের সাধ মনেই থেকে যাবে।

শঙ্কর ভেবেছিল মা বুঝি তার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করবার কথা বলছে। বললে, "না মা, তুমি এখন মরবে না, মরতে তোমাকে আমি দেব না। ময়নাবুনি আমি একদিন যাবই। তারপর তোমার অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব, তুমি দেখে নিও।"

বিমলা বললে, "সেকথা আমি বলিনি শঙ্কর। বর্ধমান জেলায় ময়নাবুনি তোকে একদিন যেতেই হবে। সম্পত্তি ফেরাতে পারবি কিনা জানি না, তবে সেখানে তোর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা একটা হবেই তা আমি জানি। আমি কিন্তু অন্য কথা বলছি।"

শঙ্কর বললে, "কী কথা বল।"

বিমলা বললে, "বউ নিয়ে ঘর করতে আমার খুব ইচ্ছে করছে বাবা, এবার তোমার একটি বিয়ে দেব। খুব ভাল একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি।"

শঙ্কর কেমন যেন একটুখানি চিন্তিত হয়ে উঠল।—"বিয়ে?"

"হ্যাঁ বাবা, নিজের মেয়ে নেই, কত সাধ হয়, মেয়ের মত পিছু পিছু ঘুরবে, মা মা বলে ডাকবে, ঘরের কাজকর্ম করবে—"

কথাটা শঙ্কর তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, "সবই বুঝলাম মা, কিন্তু তোমার তাহলে আর পরের বাড়িতে কাজ করা চলবে না।"

বিমলা বললে, "খুব চলবে। যে আসবে সে খুব গরিবের মেয়ে। আমি কাজ করব, ওইখানে খেয়ে আসব। ভাত না আনলে ওরা আমাকে তিরিশ টাকা মাইনে দেবে। তার ওপর তুই যদি আর কুড়ি পঁচিশটে টাকা আনতে পারিস, তাহলেই তোদের দুটি মানুষের খরচ দিব্যি চলে যাবে। বউমা তোদের দুজনের রান্না করবে। আমি সব গুছিয়ে-টুছিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে দেব। তুই আর অমত করিস না বাবা।"

কথাটা শঙ্করের বেশ ভালই লাগছে। ভাল লাগবারই বয়স। সুন্দরী একটি ছোট্ট মেয়ে হবে তার জীবনসঙ্গিনী। মায়ের মনের সাধ পূর্ণ হবে। মন্দ কী?"

শঙ্কর সম্মতি দিলে।

নেত্য নাপতিনীর বাড়ি খুঁজে বের করতে একটুখানি বেগ পেতে হয়েছিল অবশ্য বিমলাকে। কৃষ্ণচূড়ার গাছও পেয়েছিল, খ্যাপার বস্তিও পেয়েছিল, পুকুরও পেয়েছিল—ধোপাও পেয়েছিল, কিন্তু যে-লোকটিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে ছিল হিন্দুস্থানী। বাংলা "বাত" সে বোঝে না বলেই হক কিংবা কাপড় কাচতে কাচতে অন্যমনস্ক ছিল বলেই হক, নেত্য নাপতিনীর বাড়িটা যেদিকে, ঠিক তার উলটো দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল সে। শেষে সারা বস্তিটা ঘুরে ঘুরে একে জিজ্ঞাসা করে ওকে জিজ্ঞাসা করে হয়রান হয়ে গিয়ে আবার ঠিক সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে।

সামনেই নেত্যর বাড়ি। বিমলাকে দেখেই সে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে গিয়ে একটা আসন পেতে দিয়ে বললে, "বোস মা, আগে একটু জিরিয়ে নাও। তারপর আমি ডেকে আনছি মেয়েটাকে। পছন্দ যদি হয় ত তখন দেখা করব ওর বাপের সঙ্গে।"

বিমলা বললে, "নেত্য, তুমি আমাকে একঘটি জল দাও আগে। পা দুটো ধুয়ে নিই। ধুলোয় কাদায় পায়ের কী অবস্থা হয়েছে দ্যাখো।"

নেত্য বললে, "এস আমার সঙ্গে।"

খোলার ছোট ছোট তিনটি ঘর, কিন্তু বেশ গুছানো সংসার। বাড়িতে জলের কল নেই। বাইরের টিউবওয়েল থেকে জল ধরে আনতে হয় নেত্যকে। ছোট্ট একটুখানি জায়গা বাঁশের দরমা দিয়ে ঘিরে স্নানের ঘর করা হয়েছে। বড় বড় দুটো টিনের ড্রামভর্তি জল দেখিয়ে দিয়ে নেত্য বললে, "হাত পা ধুয়ে এস মা, আমি মেয়েটাকে ডেকে আনি।"

পাশেই দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে বাপ আর মেয়ে। বাপের অবস্থা একসময় নাকি বেশ ভালই ছিল। নিজের একখানা ট্যাক্সি ছিল, নিজেই চালাত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রোগে শোকে ভদ্রলোক একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সিটা দিয়েছে তার এক শালাকে। সে-ই এখন দয়া করে যা দিয়ে যায় তাইতে তাদের সংসার চলে।

নেত্য গিয়ে ডাকলে, "ডলি!"

ডলি একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। বললে, "কী!"

নেত্য দেখলে তার পরনের শাড়িটা ময়লা। কাছে গিয়ে বললে, "চট করে একটা ফর্সা জামা কাপড় পরে এস ত একবার আমার সঙ্গে।"

ডলি তক্ষুনি হাতের ঝাঁটাটা নামিয়ে রেখে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ডলির বাবা একটু দূরে বসে বসে বিড়ি টানছিল আর কাশছিল। কাশির ধমকটা একটু থামলে জিজ্ঞাসা করলে, "ডলিকে কী বলছ নেত্য?"

নেত্য বললে, "ওকে একবার নিয়ে যাব আমার বাড়িতে। বিয়ের একটা সম্বন্ধ এনেছি।"

বাপ বললে, "মেলগোত্র মিলবে ত ঠিক? আমরা চাটুজ্যে। কাশ্যপ গোত্র।"

নেত্য বললে, "ও-সব পরে মেলাবে দাদা, আগে পছন্দ হক।"

বাপ আবার খানিকটা কেশে নিলে। তারপর বললে, "আগেই বলে রাখছি নেত্য, একটি পয়সা আমি দিতে পারব না।"

নেত্য এবার তার কাছে এগিয়ে এল। বললে, "তা বললে চলবে কেন দাদা? ছেলের বিয়ে ত নয়, মেয়ের বিয়ে, কিছু খরচ করতে হবে বইকি।"

"পাব কোথায়?"

নেত্য বললে "কেন, তোমার সেই শালা দেবে।"

বাপ বললে, "সে ত সবই দিচ্ছে গো। সেই ত এখন ওর গার্জেন। আমি ত গেছি।"

এই বলে আবার সে কাশতে লাগল।

কাপড় ছাড়তে এত দেরি কেন হচ্ছে?

নেত্য ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখলে, ডলি কাপড় জামা ছেড়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

ডলিকে দেখে বিমলার ভারী পছন্দ!

"ও মা, এ যে বেশ মেয়ে!"

নেত্য বলে, "প্রণাম কর ডলি, ইনি তোমার শাশুড়ী হবেন।"

ডলি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাত বাড়িয়ে বিমলার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

বিমলা আশীর্বাদ করে মুখখানি তার তুলে ধরে বললে, "না নেত্য, বয়েস তের-চোদ্দ বলেছিলে, তা নয়, আর-একটু বেশী।"

নেত্য বললে, "কি জানি মা, বলে ত চোদ্দ।"

মেয়ে বেশ স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, মাথায় একমাথা চুল, গায়ের রং ফর্সা, হাত-পায়ের বেশ নিটোল গড়ন। সব রকমেই ভাল, শুধু বয়স একটু যেন কম হলেই ভাল হত।

বিমলা ভাবে, সেরমকটি পাচ্ছেই-বা কোথায়?

তা শঙ্কর তার বয়সের তুলনায় যেরকম জোয়ান, এ-মেয়ে তার সঙ্গে বেমানান হবে না।

বিমলা ডলিকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলে, "গরিবের ঘরে যেতে তোমার আপত্তি নেই ত মা?"

কথাটার জবাব দিতে গিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ডলি। তবু সে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে তার আপত্তি নেই।

বিমলা নেত্যর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, "দেখা আমার শেষ হয়ে গেছে নেত্য। দেনা-পাওনার কথা কী আর বলব। মেয়ের বাবা কিছু দিতে পারবে না তা আমি শুনেছি। আমার ছেলেকে ও'রা কবে দেখতে যাবেন জিজ্ঞাসা করে এস।"

ডলিকে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে নেত্য ফিরে এল।

বিমলা উদগ্রীব হয়ে বসেছিল, নেত্য বললে, "না মা ডলির বাবা কিছু করতেও পারবে না কিছু বলতেও পারবে না। ডলির এক মামা আছে, আমি দেখেছি—মিনষে ট্যাক্সি চালায়। সে-ই ওদের সব দেখাশোনা করে, টাকাকড়ি দেয়। ডলির বাবা বললে, আসছে রবিবার-দিন দুপুরে সে যাবে আপনার বাড়ি। ছেলেকে দেখে একেবারে আশীর্বাদ সেরে দিন-টিন করে আসবে। লোকটা কিন্তু ভাল নয়, মদ খায়।"

"তা খায় ত খায়, আমাদের কী?"

বলে বিমলা উঠল। বললে, "তাহলে এই কথা রইল। রবিবার আমি তাহলে সকাল-সকাল বাড়ি চলে যাব।"

এই বলে চলে যেতে যেতে বিমলা দোরের কাছে ফিরে দাঁড়াল। বললে, "এই দ্যাখো, আসল কথাটাই যে তোমরা ভুলে গেছ।"

"ওমা এযে দেখছি বেশ মেয়ে"

নেত্য জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা?"

"আমি কিন্তু ভুলিনি।"

বিমলা তার কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা একটি কাগজের টুকরো বের করে নেত্যর হাতে দিয়ে বললে, "আসবার সময় শঙ্করকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছি। আমার বাড়ির এই ঠিকানাটি ওদের দিও। নইলে ডলির মামাই বল আর বাবাই বল—যাবে কেমন করে?"

নেত্য বললে, "এর জন্য আটকাত না মা। ঠিক সময়ে আমি নিয়ে আসতাম তোমার কাছ থেকে।"

বিমলার বাড়ির দোর পর্যন্ত গাড়ি যায় না।

রবিবার দুপুরে একখানা ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়াল বড় রাস্তায়। ট্যাক্সি থেকে নামল দুজন লোক। একজন ডলির মামা পল্টুবাবু, সঙ্গে আর-একজন ছোকরা—বোধকরি তার সাকরেদ।

বিমলার কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে পল্টুবাবু ঠিক এসে হাজির হল শঙ্করের বাড়ির দরজায়।

এরা আসবে বলে দোরটা খুলেই রেখেছিল শঙ্কর। তবু সেই খোলা দরজার শিকল ধরে বারকতক নাড়া দিয়ে পল্টু বললে, "কে আছেন বাড়িতে?"

গলাটা কেমন যেন ধরা-ধরা।

মা ও ছেলে তৈরি হয়েই ছিল। শঙ্কর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললে, "আসুন!"

বছর-চল্লিশেক বয়স, বেঁটে খাটো কালো রঙের একটা শক্ত চেহারার মানুষ। বললে, "নাম-টাম কিসসু জানি না স্যার, এসেছি পাত্তোর দেখতে। আমি ডলির মামা। মানে, আপন-মামা নই, সম্পর্কে আঙ্কেল।"

লোকটির গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতদুটো গুটনো, পায়ে কালো-রঙের পাম্প্-শু চকচক করছে, একেবারে নতুন।

শঙ্করের পিছু পিছু আসতে আসতে আঙ্কেল একবার হোঁচট খেলে। সঙ্গের লোকটি তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেললে। শঙ্কর

পিছন ফিরে দেখলে। দেখলে, তার চোখদুটো লাল, কথাগুলোও কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। তবে কি এই ভর দুপুরে সে মদ খেয়েছে নাকি?

পল্টু নিজেই সামলে নিলে। বললে, "পায়ে চলা ত অভ্যেস নেই, হরদম মোটরেই থাকি। গাড়ি চালাই, তাই বলে গাড়োয়ান নই। ড্রাইভার। ট্যাক্সি-ড্রাইভার। নাও, জলদিজলদি সারো, এইখানে বসব?"

ঘরের ভিতর একটা চৌকি সরিয়ে দিয়ে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসবার জায়গা করা হয়েছে। শংকর বললে "আজ্ঞে হাঁ এইখানেই বসুন।"

পল্টু জুতো খুলে বসল। সঙ্গের লোকটি তাকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসল তার পাশে।

দুটি রেকাবিতে কয়েকটি রসগোল্লা আর সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকল বিমলা। রেকাবি দুটি হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বোধকরি জল আনতে গেল।

পল্টু তাকিয়ে দেখলে। বললে, "ও, তুমিই বুঝি ছেলের মাদার?"

তাকাবার, কথা বলবার ভঙ্গি দেখে শংকরের আপাদমস্তক জ্বলে গেল। লোকটি মদ খেয়েছে কিনা কে জানে, কিন্তু অভদ্র যে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জলের গ্লাস দুটি নামিয়ে দিতেই পল্টু আবার তাকালে বিমলার দিকে। বললে, "এ-সব কেন?"

বিমলা বললে, "মিষ্টিমুখ করতে হয়।"

পল্টু বললে, "আমার এ-সময় চলবে না। হাবা, তুই খা।"

সঙ্গের ছোকরাটির নাম বোধকরি হাবা। তাকে বলবার দরকার ছিল না। সে তখন খেতে আরম্ভ করেছে। বলবামাত্র পল্টুর রেকাবির মিষ্টিগুলি সে তার নিজের রেকাবিতে তুলে নিলে।

পল্টু বললে, "কই, দেখি এবার, ছেলেটিকে দেখি। আমার কাজ আছে। তবে হাঁ, দেখবার আগেই বলে রাখি—ডলিকে আমি যেখানে-সেখানে দেব না। এতে যদি তার বিয়ে না হয় ত না হবে।"

বিমলা এবার কথা বললে। "যেখানে-সেখানে দেবেন না বলেছেন, ওদিকে মেয়ের বাপ ত বলছেন—একটি পয়সা খরচ করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

পল্টু বলে উঠল, "হু, ইস্ দি মেয়ের বাপ? আমি সব। আমি যা বলব তা-ই হবে।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কত টাকা খরচ করবেন আপনি?"

পল্টু বললে, "নাথিং। ইংলিশ-মেক গাড়ি—যত বয়েসই হক, বাজারদর তার চড়েই আছে। ডলির মতন সুন্দরী মেয়ে—কত ব্যাটা লুফে নেবার জন্যে হাঁ-হাঁ করছে। সিনেমা-কোম্পানীতে দিতে চাই না, তবু ব্যাটারা খবর পেয়ে সেদিন আমাকে শ্যামবাজার ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে ধরেছে। বলে, দিন ওকে আমরা হিরোইন করব।... কই দেখি তোমার ছেলে দেখি।"

আবার 'তুমি!'

বিমলা বললে, "ছেলে ওই আপনার চোখের সামনে বসে।"

পল্টু এবার শংকরের দিকে ভাল ক'রে তাকালে। তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললে, "হুঁ, চেহারা ত দেখছি পাকা-পোক্ত। ফিফটিন হর্স পাওয়ার। কী করা হয় শুনি?"

শংকর যা-হক কিছু একটা বলে দিতে পারত, কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই তার মা এগিয়ে এল। বললে, "ছেলে আমার মস্ত বড়লোকের ছেলে বাবা। কপালদোষে আজ এইখানে এসে পড়েছি। বর্ধমান জেলার ময়নাবুনিতে ওর বাবার যে সম্পত্তি আছে তা যদি ও উদ্ধার করতে পারে ত ওর আর কিছু করবার দরকার হবে না, ও-ই কত লোককে খেতে দেবে।"

বড়লোকের ছেলে?

পল্টু তার লাল চোখদুটো তুলে একবার তাকালে বিমলার দিকে।

বিমলা বললে, "ময়নাবুনিতে গিয়ে খবর নিয়ে আসতে পারেন।"

"দরকার হবে না।" পল্টু বললে, "সম্পত্তি যদি উদ্ধার করতে পারে—সেই আশায় বসে আছে যে-ছেলে, সেই ছেলের সঙ্গে ডলির বিয়ে দেব? ওরে হাবা!"

সঙ্গের ছোকরাটি তখন এক গ্লাস জল শেষ করে আর একটা গ্লাসে হাত দিয়েছে।

পল্টু বললে, "এর দেখছি ইঞ্জিনেই গোলমাল। এ চালু হতে দেরি আছে। নে আর ঢক্-ঢক্ করে জল খেতে হয় না। ওঠ।"

উঠে দাঁড়াল পল্টু। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী হাবাও উঠল।

বিমলা বললে, "এরই মধ্যে উঠে পড়লেন?"

পল্টু বললে, "আমার গাড়িব হ্যাণ্ডেল মারতে হয় না। সেলফে হাত দিয়েছে কি চোঁ—সাঁ। আমার সব কাজই এমনি।"

বিমলা কী বলবে কিছুই যেন বুঝতে পারলে না। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, "তাহ'লে কি—"

কথাটা শেষ হল না। শেষ করতে দিলে না পল্টু। বললে, "ছেলে তার বাপের সম্পত্তি উদ্ধার করুক আগে। তারপর কথা হবে।"

বিমলা এবার স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে "বিয়ে কি তাহ'লে আপনারা দেবেন না?"

পল্টু পরিষ্কার জবাব দিলে। বললে, "না। চাকায় পাঙ্চার-টাঙ্চার হত ত না হয় সারিয়ে-সুরিয়ে নেওয়া যেত। এ হচ্ছে গিয়ে ইঞ্জিনে গোলমাল। এ-গাড়িতে আমরা হাত দিই না।"

হাবা ডিটো মারলে। ঘাড় নেড়ে বললে, "ঠিক।"

বিমলা বললে, "মেয়েটাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল বাবা।"

শংকর উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে কটমট করে তাকালে।

পল্টু বললে, "হেঁ-হেঁ বাবা, মেয়ে একেবারে রোল্‌স-রয়েস্! যেমন বডি তার তেমন ইঞ্জিন।"

বিমলা বললে, "কী জানি বাবা। আপনার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি না।"

শংকর রাগে ফুলছিল। এবার সে চিৎকার করে উঠলো "মা!"

পল্টু বললে, "অমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল। রাগ হচ্ছে?"

জবাব দিতে পারলে না শংকর। একটা জবাব মাত্র তার জানা ছিল। একটি ঘুষি মেরে লোকটার দাঁতগুলো সে ভেঙে দিতে পারত। সেইটেই হত এর একমাত্র জবাব। কিন্তু সে-জবাব সে দিতে পারলে না। কোথায় যেন বাধল।

পল্টু কিন্তু থামল না। জুতো দুটো পায়ে দিতে দিতে বললে, "নেতা নাপতিনীর কাছে আমি সব শুনেছি। মা তোমার কোন এক বাড়িতে রান্না করে আর তুমি সেই মায়ের রোজগারে বসে বসে খাও। শুধু চেহারা দেখিয়ে বিয়ে হয় না। বাপের সম্পত্তি উদ্ধার কর আগে। তারপর বিয়ের কথা হবে। এখন থাক।"

শংকর এবার কথা না বলে পারলে না। বললে, "তখন তোমার মত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ভগ্নীকে বিয়ে সে করবে না—এই যা দুঃখু।"

পল্টু বললে, "আচ্ছা দেখা যাবে। মিটার চালু রইল। তখন না হয় তুলে দেব।"

এই বলে তারা দুজনেই চলে গেল।

শংকর গিয়েছিল সদর দরজাটা বন্ধ করতে। ফিরে এসে দেখলে মা তার বসে বসে কাঁদছে।

শংকর অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। তাকে দেখেই বিমলা তার চোখের জল মুছে ফেলছিল। শংকর বললে "ছি-ছি, কাঁদবার কী হয়েছে মা? তুমি কাঁদছ?"

বিমলা বললে, "মানুষ করতে এনেছিলাম তোকে কলকাতায়। তা এমনি মানুষ হলি যে কেউ তোর হাতে মেয়ে পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না!"

শংকর বললে, "আচ্ছা দেয় কি না দ্যাখো।"

বিমলা উঠে দাঁড়াল। বললে, "আর দেখতে চাই না বাবা। দেখতে অনেক কিছু চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম তোর

বিয়ে দেব, ছেলে-বউ নিয়ে দেশে যাব। তোর বাপের সম্পত্তি উদ্ধার করে তোদের সেইখানে বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তা সে সব ত আমার সবই হল। এখন মরণ হলেই বাঁচি।"

শঙ্কর আর যাই করুক, মাকে সে ভালবাসে। মা এই সব কথা বললে সত্যিই তার কষ্ট হয়। বললে, "মরতে তোমায় দেবে কে?"

এত দুঃখেও মা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "দিবি না মরতে?"

শঙ্কর বললে, "না। তুমি যাতে না মর, তার ব্যবস্থা আমি করছি।"

তা ব্যবস্থা একটা সে করলে।

ঝিলপাড়া শক্তিমন্দিরের হয়ে একদিন একটা বিয়ে বাড়িতে চাঁদা আদায় করতে গিয়েছিল শঙ্কর। সেখানে পরিচয় হয়েছিল একজন ঘটকের সঙ্গে। রোগা-পটকা নিতান্ত দরিদ্র একটি মানুষ। বিয়ের ঘটকালি আর লটারির টিকিট বিক্রি করা ছিল তার পেশা। নাম ছিল দাসু।

দাসু সেইদিন শক্তিমন্দিরের খোঁজ পেয়ে গেল। জানতে পারলে, রোজ সেখানে অনেকগুলি ভাল ভাল অবিবাহিত ছেলে ছোকরা আসে ব্যায়াম শিখতে।

তারপর থেকেই শক্তিমন্দিরে দাসুর শুভাগমন হতে লাগল খুব ঘন ঘন।

শঙ্কর একদিন তাকে ধরে বসল, "রোজ রোজ কি জন্যে আস তুমি এখানে?"

দাসু বললে, "লটারির টিকিট বিক্রি করতে।"

শঙ্কর বললে, "ওটা তোমার ছল। তুমি আস তোমার মক্কেল পাকড়াতে।"

দাসু নির্লজ্জের মত হাসতে লাগল।

তা সত্যি বলতে কি, লজ্জাশরমের বালাই তার ছিল না।

দাসু নিজেই একদিন বলে বসল, "ও-সব থাকলে আমাদের চলেও না।"

শঙ্কর বললে, "না ভাই, তুমি আর এখানে এস না। আমার ক্লাবের ছেলেদের আর বিয়ের লোভ দেখিয়ো না। বিয়ে ওরা কেউ করবে না।"

দাসু বললে, "আচ্ছা, আর আসব না।"

কিন্তু তবু আসে।

রঙিন কাপড়ের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে পা টিপে-টিপে এসেই আগে দেখে, শঙ্কর আছে কিনা, তারপর হাসতে হাসতে ক্লাব-ঘরের ভিতরে ঢুকে বেশ জাঁকিয়ে বসে বিড়ি ফুঁকতে থাকে।

আসর জমাবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। কত মজার মজার গল্প শোনায়! কত বিয়ের ব্যাপারে কত লোককে সে ফাঁকি দিয়েছে, কত কুলীনের সঙ্গে কত শ্রোত্রীয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, কত জায়গায় ধরা পড়ে কত মার খেয়েছে—নিঃসঙ্কোচে এই-সব কথা বলে আর ফিক ফিক করে হাসে।

শঙ্কর তাকে দেখতে পেলেই তার ঘাড়ে একটি রদ্দা মেরে তাকে অভ্যর্থনা করে। তাই শঙ্করকে দেখলেই হয় সে খানিকটা দূরে সরে যায়, আর নয়ত হাত দুটো আড়াল করে বলে, "মের না মের না ভাই মরে যাব। কী শক্ত হাত রে বাবা, মাথা ঝনঝন করে ওঠে।"

দাসু একদিন শঙ্করকে একা পেয়ে বললে, "তোমার যদি একটি বিয়ে দিতে পারতাম মাইরি মেয়েটা আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিত।"

শঙ্কর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

দাসু বললে, "আরে ভাই, ছেলে কোথায় আমাদের দেশে? সব ত আমার মতন রোগা-পটকা, আর নয়ত নাদুশ-নুদুশ একটা মাংসপিণ্ড। জোয়ান জোয়ান সুন্দর মেয়ের সঙ্গে এই সব ছেলের বিয়ে দিই। সত্যি বলছি দেখে কষ্ট হয়।"

শঙ্কর সেদিন বলেছিল, "থাক আর আমার বিয়ে দিতে হবে না। তুমি যাদের বিয়ে দিচ্ছ তাদেরই দাওগে যাও।"

তারপর হঠাৎ এক সময় দেখা গেল, দাসু আর শক্তিমন্দিরে আসে না। সবাই ভাবলে বুঝি এখানে তার বিশেষ কিছু সুবিধা হল না বলে সে তার আসা বন্ধ করেছে।

শঙ্কর সেদিন একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়ল, দাসু ট্রাম থেকে নামছে। কাঁধে তার সেই কাপড়ের ঝুলিটা ঠিক তেমনিই আছে। দেখে মনে হল আর একটু যেন রোগা হয়ে গিয়েছে।

শঙ্কর তারই দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু শঙ্করকে প্রথমে সে দেখতে পায়নি। যেই মুখ তুলে তাকিয়ে সে শঙ্করকে দেখেছে, আর অমনি পিছন ফিরে দে ছুট!

শঙ্কর ডাকলে, "দাসু!"

দাসু শুনেও শুনলে না।

বাধ্য হয়ে শঙ্করকেও ছুটতে হল।

একটুখানি ছুটেই দাসু তখন হাঁপিয়ে পড়েছে। শঙ্কর কাছে আসতেই দাসু দুহাত তুলে বলে উঠল "মের না ভাই, মাইরি বলছি মরে যাব। আমার কোনও দোষ নেই, মাইরি বলছি তুমি শোন আগে।"

শঙ্কর তার হাতখানা চেপে ধরে বললে "আমি তোমাকে মারবার জন্যে আসিনি দাসু। শোন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মজা দেখবার জন্যে রাস্তায় লোক জড় হয়ে গিয়েছিল। শঙ্কর তাকে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। দাসুর ভয় তখনও যায়নি। সে তখনও বলে চলেছে, "আমি কী করব, আচ্ছা তুমিই বল না, আমার হচ্ছে গিয়ে এই পেশা। জলজ্যান্ত অত বড়লোক বাপ বেঁচে রয়েছে, আমি বললাম তা বিয়ে করবি ভাল কথা, চল আমি তোর বাপের কাছে যাই। তা সে বললে, না, আমি বাবাকে না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করব। ওর ধারণা বি-এ পাশ না করলে বাপ বিয়ে দেবে না, আর ইদিকে ছেলে একেবারে অঘামারা অচৈতন্য—বি-এ পাশ সে কখনই করতে পারবে না জানে।"

শঙ্কর কিছুই বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কার কথা বলছ?"

দাসু বললে, "কেন চালাকি করছ? তুমি জান না? তোমার কেলাবের ননী তোমাকে বলেনি? আমি ত তোমারই ভয়ে কেলাবে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।"

শঙ্কর বললে, "ননী কাউকে কিছু বলেনি। আর আমিও ওদিক দিয়ে বড়-একটা যাই না।"

এতক্ষণ পরে দাসুর মুখে হাসি ফুটল। বললে, "মাইরি বলছ—কিছু জান না?"

"না, সত্যি বলছি, জানি না।"

দাসু খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "চল না একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি। ননীর গল্পটা তোমাকে বলি। ভারী মজার গল্প।"

শঙ্কর বললে, "চা আমি খাই না। তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী কথা আছে। চল তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই।"

শঙ্করের বাড়ি এখান থেকে খুব কাছে নয়। চট করে একটা রিকশা ডেকে বললে, "ওঠ।"

দাসুর অপরাধী মন আবার কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মারবে নাকি?

তবু শঙ্করের ভয়ে তাকে উঠতে হল রিকশায়।

রিকশায় উঠে দাসু একেবারে চুপ। ননীর যে মজার গল্পটা সে আরম্ভ করেছিল, সেটাও কেমন যেন শেষ করবার প্রবৃত্তি তার হল না। ক্রমাগত সেই একটা কথাই তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

শঙ্কর বললে, "তারপর? ননীর বিয়ে দিয়ে দিলে?"

দাসুর ভয় এবার যেন আরও বাড়ল। ননীর ব্যাপারটা শঙ্কর নিশ্চয়ই সব জানে। ননীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার অত বড় সর্বনাশ দাসু করে ফেলেছে। সে-কথা কি আর ননী বলেনি শঙ্করকে?

শঙ্কর আবার বললে, "কী ভাবছ দাসু? আমার বাড়ি যেতে কি তোমার ইচ্ছে করছে না?"

দাসু বললে, "না না, তা কেন? এই ত যাচ্ছি।"

বলেই সে কথার ধারাটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। বললে, "শঙ্কর, তুমি কখনও লটারির টিকিট কিনেছ?"

শঙ্কর বললে, "না ভাই, কখনও কিনিনি।"

দাসু বললে, "মাঝে-মাঝে এক-আধটা কেনা ভাল। কখন যে কার ভাগ্যে কী লেগে যায় কিছু বলা যায় না। এই ধর না কেন, ভূতোবাবু—চল্লিশটি টাকা মাইনে পেত, সংসার চলত না কিছুতেই। আমি জোর করে কেনালাম তাকে একখানা এক টাকা দামের টিকিট। সেদিন পেয়ে গেল পনের হাজার টাকা। তা ব্যাটার কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে কিছু তোমার দেওয়া উচিত। পনের হাজার পেলি তুই, পনেরটা টাকা দে? দিলে না কিছুতেই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।"

ভূতোবাবুর লটারির টাকা পাওয়ার গল্প শঙ্কর শুনতে চায়নি। চুপ করে শুনেই গেল শুধু। কোনও মন্তব্যই করলে না।

দাসু জিজ্ঞাসা করলে, "কিনবে নাকি একটা টিকিট?"

শঙ্কর বললে "কিনব।"

দাসু রিকশায় বসেই তার ঝুলিতে হাত ঢুকিয়েছিল। শঙ্কর তার হাতটা চেপে ধরে বললে "রিকশায় বসে কেন? বাড়িতে চল, সেইখানেই দেবে।"

তারপর দু'জনেই চুপ।

দাসু আর কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না বলবার মত।

কিন্তু পথ অনেকখানি।

শঙ্কর বললে, "ননীর বিয়ের কথা বললে না?"

দাসু এবার না বলে পারলে না। বললে, "বিয়ে করবার জন্যে ননী একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। আসল ব্যাপার কী জান? ননীর মা মরে যাবার পর, ননীর বাবা বুড়ো বয়েসে আবার একটি বিয়ে করে বসেছেন। তাই ননীর ধারণা হল, সৎমা তার বিয়ে দেবে না কিছুতেই। বি-এ পাশ-টাস ছুতো। হাতে তখন আমার একটিমাত্র মেয়ে। তবে মেয়েটি খুব সুন্দরী। ননী দেখলে মেয়েটিকে। দেখে অবধি নিজে ত পাগল হলই, আমাকেও পাগল করে তুললে। তখন আর কী করব বললাম, নে, কর তবে বিয়ে। কনে-পক্ষের আপত্তি হল না। ননী দেখতে-শুনতেও ভালো, বড়লোকের একটিমাত্র ছেলে। তবে হ্যাঁ, বিয়ের আগে ননী তাদের বলে দিলে, বিয়ে করছি, কিন্তু তোমাদের মেয়েকে আমি এখন আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারব না। আমি নিজে তোমাদের এখানে আসা-যাওয়া করব তারপর বাবা বুড়ো হয়েছে, সে আর কত দিন? বিয়েটা চুকে গেল।"

শঙ্কর বললে, "ভালই হল। এর জন্যে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন, আর লুকিয়ে লুকিয়েই বা বেড়াচ্ছ কেন?"

দাসু এইবার শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসি হাসলে। বললে, "মের না মাইরি, আমি বলছি তাহলে সত্যি কথা, শোন।"

শঙ্কর বললে, "বল।"

দাসু একটু চাপা গলায় বললে, "বিয়েটা অসবর্ণ' বিয়ে হয়ে গেল।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "বিয়ের আগে ননী সে-কথা জানত না?"

"না।"

শঙ্কর বললে, "তুমি তাকে জানাওনি?"

দাসু অম্লানবদনে বললে, "না।"

শঙ্কর কী যেন ভাবলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "মেয়েটি ত বলছ সুন্দরী, ননীও দেখতে খারাপ নয়। তাদের দু'জনের ভাব-ভালবাসা হয়েছে ত?"

দাসু বললে, "ওরে বাবা! সে খুব। লুকিয়ে লুকিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি, ননী আজকাল দিনরাত বউয়ের কাছে পড়ে থাকে।"

শঙ্কর বললে, "তাহলে হক না অসবর্ণ। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

দাসু এতক্ষণে যেন তার মনে একটু শান্তি পেলে। বললে, "ভয় পাব না, না? আমিও ক'দিন থেকে সেই কথাই ভাবছি।"

এ-রাস্তা ও-রাস্তা এগলি সেগলি পেরিয়ে রিকশা এসে দাঁড়াল শঙ্করের বাড়ির কাছে।

দাসু কোনদিন শঙ্করের বাড়ি দেখেনি। আজ দেখলে।

দেখলে, বস্তির ভিতর একখানা বাড়ি। দোরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘরদোর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে শঙ্কর বললে, "বোস।"

দাসু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। শঙ্কর বললে "কী দেখছ?"

"তুমি এইখানে থাক?"

"তবে তুমি কি ভেবেছিলে আমি রাজবাড়িতে থাকি?"

দাসু বললে, "না, তা ভাবিনি। তুমি একাই থাক এখানে?"

শঙ্কর বললে, "না। আমি থাকি আর আমার মা থাকে। মা বেরিয়ে গেছে। থাকলে তোমাকে দেখাতাম।"

বলেই সে বসল দাসুর পাশে। বললে, "দাসু, তুমি একদিন আমাকে বিয়ে করতে বলেছিলে, মনে আছে?"

বিয়ের নাম শুনে দাসু উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "বিয়ে করবে তুমি?"

শঙ্কর বললে, "সেইজন্যেই ত তোমাকে ডাকলাম।"

দাসু চোখ বুজে কী যেন ভাবলে। বললে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাবতে দাও। এ বাবা আর কারও বিয়ে নয়। ভাল বিয়ে না দিতে পারলে জানে মেরে ফেলবে।"

এই বলে সে তার ঝুলিতে হাত ভরে একটি খাতা বের করল। খাতার পাতায় লেখা ছিল তার মক্কেলদের নাম ঠিকানা। তাই থেকে খুঁজে খুঁজে একটি নাম ঠিকানা বের করে বললে, "এই একটিই আছে বামুনের মেয়ে—যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া চলে।"

শঙ্কর বললে, "মাত্র একটি?"

দাসু বললে, "হ্যাঁ ভাই, আপাতত এই একটিই আছে। বিধবা মায়ের এই একটি-মাত্র মেয়ে।"

শঙ্কর আনন্দিত হল। বললে, "বা রে বা বেশ মিলে গেছে ত! আমারও ত তাই। আমিও আমার মায়ের একটিমাত্র ছেলে।"

দাসু বললে, "না, মেয়েটির আর একটি ছোট ভাই আছে। কিন্তু খুব গরিব।"

"গরিবই আমি চাই।"

দাসু এই বার ভাল করে চেপে বসল। বললে, "শোন, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। জবাব দাও।"

দাসু এইবার হাতে পেয়েছে শঙ্করকে। তার ভাবভঙ্গী দেখে শঙ্কর মনে মনে হাসলে। বললে, "বল, জবাব দিচ্ছি।"

দাসু জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আমার সঙ্গে একদিন যেতে পারবে কিনা বল।"

"কোথায়?"

"এই কালীঘাটে। শুধু যাবে। কোনও কথা বলবে না। দূর থেকে একবার তোমাকে দেখিয়ে দেব। বাস্, মুণ্ডুটি ঘুরে যাবে মেয়ের মায়ের।"

শঙ্কর বললে, "না ভাই, তা পারব না। তোমার পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব চুপ করে'—তা হবে না।"

এ-সব ব্যাপারে দাসুর মাথা খুব সাফ। বললে, "তাহলে এক কাজ কর। আমি তোমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ব। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে তুমি সেই বাড়িতে ঢুকে ডাকবে, দাসু! বেশ মানুষ ত তুমি! আমাদের গাড়িতে যাবে বলে এইখানে ঢুকে গপ্প করতে বসে গেলে? যাবে ত এস তাড়াতাড়ি।"

শঙ্কর বললে, "তা হতে পারে।"

দাসু তার নিজের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় নিজেই যেন মুগ্ধ হয়ে গেল। বললে, "তারপর আর একটি কথা। তুমি কতদূর পড়েছ বল দেখি?"

শঙ্কর এবারে সত্যিই একটু বিপদে পড়ল। বললে, "আবার ও-সব কথা কেন?" বলবে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে।"

দাসুর মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে

গেল। বললে, "এইখানে একটু মুশকিলে পড়তে হবে।"

শঙ্কর কথাটাকে গ্রাহ্যই করলে না। বললে, "যাঃ! ইস্কুলের সার্টিফিকেট দেখতে চাইবে নাকি?"

দাসু বললে, "না। তা অবশ্য দেখতে চাইবে না। তবে মেয়েটি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। মেয়ে চায় কলেজে পড়তে, আর মা চায় মেয়ের বিয়ে দিতে।"

শঙ্কর একটু ভাবনায় পড়ল। কিন্তু ভাবনার সময় তার আর নেই।

শঙ্কর বললে, "দ্যাখো দাসু, এই মাসের ভেতর বিয়ে আমাকে করতেই হবে। তোমার হাতে আর কোনও মেয়ে নেই?"

দাসু বললে, "না ভাই, বামুনের মেয়ে আপাতত এই একটিই আছে। 'অসবর্ণ' বিয়ে ত তোমার দিতে পারব না।"

শঙ্কর বললে, "না। আমার মা তাহলে আত্মহত্যা করবে।"

দাসু বললে, "তাহলে কী করি বল দেখি?"

শঙ্কর বললে, "করবে আবার কী? এইখানেই লাগিয়ে দাও। আর দেরি নয়। কালীঘাটে যেতে বলছিলে, চল কালই যাই।"

দাসু বললে, "কিন্তু মেয়ের মা যে রোজগেরে ছেলে চায়। সে চায় মেয়ে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে।"

"কেন, আমার হাতে মেয়েকে দিয়ে নিশ্চিন্তি না হবার কী আছে? বড়লোকের মেয়ে ত নয়! আর আমিই যে একদিন বড়লোক হব না তাই-বা কে বললে?"

দাসু বললে, "তাহলে কিন্তু আমাকে কতগুলো মিছে কথা বলতে হবে।"

"সেদিক দিয়ে ত তুমি ওস্তাদ। তোমার যা খুশি তাই বোল। আমার চাই বিয়ে।"

দাসু বললে, "কিছুদিন অপেক্ষা করতে পার না?"

শঙ্কর বললে, "এইবার তুমি আমার কাছে মার খাবে। অপেক্ষা করবার সময় আমার নেই।"

দাসু আবার চোখ বুজলে। ধ্যানস্থ হয়ে ভেবে নিলে বোধহয় কেমন করে কী করবে। বললে, "ধর সবকিছু ঠিক করে ফেললাম। বিয়েটাও চুকে গেল। কিন্তু তোমার যে কিছু খরচ আছে।"

শঙ্কর বেশ জোরে জোরেই বলে উঠল, আমি কুলীন ব্রাহ্মণ—ব্যাটাছেলে বিয়ে করব —আমার খরচ আছে মানে?"

দাসু আবার চোখ বুজলে। কিন্তু এবার কিছু চিন্তা করবার জন্য নয়। এবার সে চোখ বুজল ভয়ে।

শঙ্করের কথা শেষ হতেই দাসু চোখ খুলে রীতিমত ভয়ে ভয়ে বললে, "না না, আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি—"

বলেই একটা ঢোক গিলে ভয়ের ধাক্কাটা সামলে নিলে। সামলে নিয়ে বললে, "ধর আমাকে বলতে হবে—ছেলেটি আই-এস্‌সি পাশ করে একটি বিলিতী ফার্মে কাজ করছে। এখন অ্যাপ্রেনটিস্। হাত খরচ

"অসবর্ণ বিয়ে ত তোমার দিতে পারি না"

পায় দেড়শ টাকা। একবছর পরে মাইনে হবে—পাঁচশ টাকা। সাহেব বলছে বিলেত পাঠাব। বছরখানেক যদি বিলেতে থেকে ফিরে আসতে পারে তাহলে দেড়হাজার টাকা পাবে এখানে আসবামাত্তর। কিন্তু বিধবা মায়ের একটিমাত্র ছেলে, তার ওপর গোঁড়া বামুন—মা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। মা বলছে, বিয়ে দিয়ে দেব। অমন রাজপুত্রের মত ছেলে—ওর আবার বিয়ের ভাবনা? বহুত লোক পেছনে লেগে গেছে। আমার খুব চেনা ছেলে। একরকম বন্ধুর মত। খবর পেয়ে ছুটলাম। ছেলে আমাকে দেখেই বললে, ভারী বিপদে পড়ে গেছি দাসু। মা বলছে আমরা গরিব মানুষ, গরিবের মেয়ে চাই। লেখাপড়া জানা মেয়ে হলে চলবে না। কিন্তু আজকালকার দিনে, আচ্ছা তুমিই বল ত দাসু, মেয়ে একেবারে লিখতে পড়তে জানবে না, সেরকম মেয়েকে বিয়ে আমি করি কেমন করে? আমি বললাম, ঠিক তুমি যেরকমটি চাইছ, সেইরকম একটি গরিবের মেয়ে আছে আমার হাতে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। ছেলে রাজি হয়ে গেল। বললে, আমি এইখানেই বিয়ে করব।"

দাসু এই এতগুলো মিথ্যা কথা অবলীলাক্রমে বলে গেল। একটুকু কোথাও আটকাল না, কোথাও থামল না।

শঙ্কর কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেল। বললে, "তারপর? এর ঠ্যালা সামলাবে কেমন করে? বিয়ের পর যখন সব জানাজানি হয়ে যাবে?"

দাসু অম্লান বদনে বললে, "জানাজানি ত হবেই। তা হক না। বিয়ের পর শাশুড়ী হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, কই বাবা, চাকরি ত তুমি করছ না? তখন বলতে পার, বিলেত যেতে রাজি হলে না বলে চাকরিটা গেল।"

কথাটা বলেই শঙ্করের মুখের দিকে একবার তাকালে দাসু। সেখানে কি ভাবান্তর হয়, দেখবার জন্যই বোধকরি তাকিয়েছিল। কিন্তু মুখ দেখে কিছুই সে বুঝতে পারলে না।

শঙ্কর কী যেন ভাবছিল। দাসু বললে, "বেশ ত এ মিথ্যেটুকুও যদি বলতে না চাও বোল না। বলবে, চাকরির কথা কই আমি ত বলিনি! কে বলেছিল? ডাকো তাকে। ঘটককে তখন কেউ খুঁজেও পাবে না। কাজেই তাড়াতাড়ি বিয়ে যদি করতে চাও, বল আমি চেষ্টা করি।"

শঙ্কর বললে, "কর। বিয়ে আমাকে করতেই হবে।"

দাসু বললে, "নিশ্চয়ই করবে। বউ হবে খুব সুন্দরী। আর তোমাদের কীরকম ভাব-ভালবাসা হয় দেখো।"

শঙ্কর বললে, "আমি কিন্তু পাশ-টাশ কিছু করিনি।"

দাসু বললে, "না করলে ত বয়ে গেল। এমন কত হয়।"

"কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে জান দাসু, এ-বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবে না।"

দাসু জিজ্ঞাসা করলে, "কেন হবে না?"

শঙ্কর বললে, "বিয়ের আগে মেয়ের মা যদি আমার মার কাছে আসেন, তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। আমার মা কখনও মিথ্যা কথা বলবে না।"

দাসু বললে, "যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করব। তবে হ্যাঁ, একটি কাজ তোমাকে করতে হবে। বিয়ের পরেই এ-বাড়িতে বউকে এনে তুলবে না। কয়েকটা দিনের জন্যে আর-একটি ভাল দেখে বাড়ি তোমাকে ভাড়া নিতে হবে। তারপর ভাবসাব হয়ে গেলে বউকে তুমি নরকে নিতে যেতে চাইলেও তোমার সঙ্গে সেইখানেই সে চলে যাবে।"

শঙ্কর বললে, "বাড়ি ভাড়া, বউভাত, খাট বিছানা, আমার জামাকাপড়, বউয়ের কিছু কাপড়জামা—এই সব খরচের টাকাগুলি দিতে হবে মেয়ের মাকে।"

দাসু বললে, "বললাম ত মেয়ের মা গরিব। এখন দেখি কী সে দিতে পারে।"

দাসু সেইদিনই চলে গেল কালীঘাটে। ইন্দ্রাণীর মাকে গিয়ে এমনভাবে কথাটা সে বললে, যেন সে হঠাৎ একটি দুর্লভ রত্নের সন্ধান পেয়েছে তার কন্যার জন্যে। এ-রত্ন যদি হাতছাড়া হয়ে যায় ত ইন্দ্রাণীর ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ বলতে হবে।

যে-গল্প সে শঙ্করকে বলে এসেছিল সেই গল্পই সবিস্তারে বর্ণনা করে ইন্দ্রাণীর মাকে সে এই বলে সাবধান করে দিলে যেন সে ঘুণাক্ষরে এ-কথা কারও কাছে প্রকাশ না করে। কারণ তার মত বিবাহযোগ্যা অনেক কন্যার বাপ-মা এই রত্নটির দিকে হাত বাড়িয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে টাকার।

দাসু সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন বলুন মা, আপনি কীরকম খরচ করতে পারবেন। তারই ওপর সব-কিছু নির্ভর করছে।"

ইন্দ্রাণীর মা বললে, "তোমাকে ত বলেছি বাবা গরিব বিধবার মেয়ে। টাকার অভাবে মেয়েটাকে কলেজে পড়াতে সাহস হল না, তাই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। ছোট ছেলেটাকে পড়াতে হবে, তার জন্যেও আমার কিছু রাখা উচিত। কাজেই আমি যা দেখছি, নগদ একটি হাজার টাকা ছেলেকে আমি দিতে পারি।"

দাসু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, "না মা, এরকম ছেলে এত সস্তায় পাওয়া যায় না। ছেলের মা চেয়েছে নগদ দুটি হাজার টাকা। ছেলেটি আমার খুব পরিচিত। দেখি বলে কয়ে কিছু করতে পারি কিনা।"

দাসু সেদিন চলে গেল সেখান থেকে।

একদিন পরে আবার এল।

ইন্দ্রাণীর মা জিজ্ঞাসা করলে, "কিনারা কিছু করলে বাবা?"

দাসু বললে, "মনে মনে একটা ফন্দি এঁটেছি মা, কিন্তু সেটা কি ভাল হবে? সেদিন ত আপনাকে বললাম, ছেলে চায় একটি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, আর মা চায় লেখাপড়া-না-জানা মেয়ে। ছেলে তার জন্যে মাকে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করতেও রাজী। আমি বলি কি, কোনোরকম ফন্দী-ফিকির করে ছেলেটিকে আনি এইখানে। আপনি দেখুন তাকে। দেখে যদি আপনার পছন্দ হয়, তখন কথা কইব। আগে থেকে কিছু বলব না।"

ইন্দ্রাণীর মা তখন ছটফট করছে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে। বললে "তাই কর বাবা, ছেলেটিকে দেখি আমি। তুমি ত দেখেছ আমার ইন্দ্রাণীকে। রূপে গুণে সাক্ষাৎ ইন্দ্রাণী। যারতার হাতে ত দিতে পারব না তাকে।"

দাসু বললে, "ছেলেকে দেখলে মাথাটি আপনার ঘুরে যাবে মা। আপনি দেখুন শুধু কোনও কথা বলবেন না।"

"সেই ভাল।"

শঙ্করকে সব-কিছু বলাই ছিল। দেখাবার ব্যবস্থা তার পরের দিনই হয়ে গেল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। দিনের আলোয় দেখাই ভাল।

দাসু তার আগেই ইন্দ্রাণীর মার কাছে আসর জমিয়ে বসেছে। —"কোম্পানির গাড়ি করে বুঝি বালিগঞ্জ যাচ্ছিল শঙ্কর। পথে দেখা হতেই বললাম, আমিও ওই দিকে যাব দয়া করে যদি নামিয়ে দাও ত ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে যেতে হয় না। তা ছেলেটা খুব ভাল। বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। যাবার সময় আবার তুলে নিয়ে যাব বলেছে। এই কাছেই গেছে, এক্ষুনি আসবে। আপনি দেখবেন শুধু। আজ আর কিছু বলবেন না। কাল আমি জেনে যাব আপনার মতামত।"

আগেই সব ঠিক করা ছিল। শঙ্কর বাড়ির সদর পেরিয়ে একেবারে ভেতরে এসে ডাকলে, "দাসু!"

"ওই এসেছে! দেখুন মা দেখুন।"

চুপিচুপি কথাটা বলে দাসু তার ঝুলিটা খোঁজবার ছুতো করে খানিকটা দেরি করলে। ওদিকে শঙ্করও তার বুকটা ফুলিয়ে সার্টের কলারটা বারকতক নেড়েচেড়ে বাড়িটা ভাল করে দেখে নিলে।

"কাল আবার আসব মা, আজ চলি।"

দাসু তার ঝুলিটা কাঁধে ফেলে, চটি পায়ে দিয়ে শঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে গেল সেদিন।

শঙ্করকে কতক্ষণই-বা দেখেছিল ইন্দ্রাণীর মা। "ইন্দ্রাণীকে ডেকে দেখালে বড় ভাল হত এই আফসোসই সে করছিল, এমন সময় দাসু এল তার পরের দিন মার মতামত জানতে।

ঘুঁড়ুটি সত্যিই তার ঘুরেছে বলেই মনে হল।

দাসু একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেনি, ইন্দ্রাণীর মা তাকে দেখেই বলে উঠল, "যেমন করে হক, এই ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও ইন্দ্রাণীর। তোমাকে আমি খুশি করে দেব দাসু।"

"কত দেবেন মা আমাকে?"

"পঞ্চাশটি টাকা।"

"না মা, একশটি টাকা দিন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"একশ টাকা? বিয়ের দিন তাহলে বরযাত্রী কিছু কম করে আনতে বোলো।"

দাসু বললে "তাহলে শুনুন মা। ওর মাকে বলে যদি বিয়ে দিতে হয়, তাহলে আপনার খরচ পড়বে চার হাজার টাকা। দু'হাজার নগদ, মেয়ের বিশ ভরি সোনা, ছেলের সোনার বোতাম, রিস্ট ওয়াচ, গরদের জোড়, তারপর বরযাত্রী অন্তত জন-তিরিশেক, গায়ে-হলুদের তত্ত্ব, ফুলশয্যার তত্ত্ব, খাট, বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি—হেন তেন সাত-সতেরো। চার হাজার টাকা কম করে বললাম, পাঁচ হাজার টাকার কম হবে না। দিতে যদি রাজি থাকেন ত বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মা বললে, "না বাবা, অত টাকা আমার নেই।"

দাসু বললে, "তাহলে ও-ছেলের আশা ছেড়ে দিন।"

"তবে যে বললে একশ টাকা পেলে তুমি সব ব্যবস্থা করে দেবে?"

দাসু বললে, "সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার মনের কথা। শঙ্করকে একবার আমি জিজ্ঞাসা করব, সে যদি রাজী হয়, আর আপনি যদি পছন্দ করেন, তাহলে হতে পারে।"

"সে কিরকম বাবা?"

"সেই যে বলেছিলাম আপনাকে। ছেলের মাকে না জানিয়ে চুপিচুপি বিয়েটা সেরে দেব। তারপর ছেলে একেবারে বউ নিয়ে বাড়ি ঢুকবে।"

ইন্দ্রাণীর মা বললে, "মা যদি তখন রাগ করে? যদি বলে, ও-মেয়েকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না?"

"একটিমাত্র ছেলে, তা অবশ্য বলবে না। তবে শঙ্করকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। সে যদি রাজি হয় ত—ব্যস, মেরে দিতে পারি কম খরচে। বিয়ের আগে শ'দুয়েক টাকা ধরিয়ে দেব শঙ্করের হাতে, বলব নিজের জামা জুতো কিনে নাও। তারপর বিয়ের দিন সন্ধেবেলা নিয়ে আসব একখানা ট্যাক্সি করে। না বরযাত্রী না কিছু, বড় জোর ওদের পুরুত আসবে সঙ্গে। এখানে আমরা বিয়ের সব ঠিক করে রাখব। বিয়ে হয়ে যাবে, পরের দিন কুশণ্ডিকা হবে, আপনি আমার হাতে হাজারটি টাকা দেবেন, আমি চুপি চুপি শঙ্করের হাতে দিয়ে বলব, তোমার গরিব শাশুড়ী ঠাকরুন লজ্জায় এ-টাকা নিজে দিতে পারলে না, তোমার উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণে এ নয়, তবু তোমাকে এই হাজারটি টাকা নিয়ে হাসিমুখে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে তোমার মায়ের কাছে যেতে হবে। তোমার মাকে খুশি করবার ভার তোমার ওপর।—এতে আপনি রাজি থাকেন ত বলুন—আমি শঙ্করকে গিয়ে বলি। আর যদি রাজি না হন ত ওর আশা ছেড়ে দিন। আমি অন্য ছেলে দেখি।"

ইন্দ্রাণীর মা কিন্তু শঙ্করের আশা ছাড়তে পারলে না সহজে। বললে, "তাই দ্যাখো

বাবা শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করে।"

দাসু বললে, "রাজি যদি হয় ত আর দেরি করব না মা। আসছে সোমবার ভাল একটি দিন আছে। সেইদিনই সেরে ফেলতে হবে নইলে মত আবার বদলে যেতেই-বা কতক্ষণ!"

তাই হল শেষ পর্যন্ত।

সোমবার সন্ধ্যায় ইন্দ্রাণীদের কালীঘাটের বাড়ির নীচের তলার একটি ঘরে শঙ্করের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিয়েটা চুকে গেল।

মাকে না জানিয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে শঙ্করের এই গোপন বিবাহের কারণ যে শুধু ইন্দ্রাণীর মার অর্থাভাব সে কথাটা দাসু যে কতবার কতরকম করে মাকে শোনালে তার ইয়ত্তা নেই।

বিবাহের অনুষ্ঠান-আচরণের কোথাও কোনও ত্রুটি হল না। শঙ্কর একজন ভাড়া-করা পুরোহিত সঙ্গে এনেছিল। কন্যাপক্ষের পুরোহিত ছিল, নাপিত ছিল, একান্ত অন্তরঙ্গ প্রতিবেশিনী কয়েকজন ভদ্রমহিলা ছিলেন, আর ছিল ইন্দ্রাণীর চারজন ইস্কুলের বান্ধবী।

এই বান্ধবী চারজনেই জমিয়ে রাখলে বিয়েবাড়িটা।

সবাই একবাক্যে বলতে লাগল, এমন রাজযোটক সহজে হয় না। যেমন বর, তেমন কনে।

নিতান্ত ছোট বাড়ি। মাত্র খানতিনেক ঘর। তার ভেতর ইন্দ্রাণী আর ইন্দ্রাণীর ছোট ভাই যে-ঘরখানায় থাকে সেই ঘরটিই সবচেয়ে ভাল। সেই ঘরটি ভাল করে সাজিয়ে বাসর ঘর তৈরি করেছিল ইন্দ্রাণীর বান্ধবীরা।

বিয়ের পর বর-কনেকে নিয়ে তারা সেই ঘরে গিয়ে সারা রাত ধরে হৈ-হুল্লোড় চালালে। শঙ্করকে নিয়ে কী যে তারা করবে বুঝতে পারলে না। শঙ্করের কাছে নিজেদের জাহির করবার জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যে, ইন্দ্রাণী বলে যে একটি মেয়ে আছে সেখানে, সেকথা তারা ভুলেই গেল। ভুলে গেল, নববিবাহিত দম্পতির তখনও পরিচয় হয়নি।

নিজেরাই তারা নেচে গেয়ে নিজেদের ভেতর রেশারেশি করে রাত কাবার করে দিলে। ইন্দ্রাণী খাটের একপাশে শুয়ে শুয়ে ঘুমল।

পরদিন সকালেই কুশণ্ডিকা।

তার আগে দাসুর সঙ্গে শঙ্করের দেখা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দাসু বসে বসে চা খাচ্ছিল, শঙ্কর তাকে বাইরে রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললে, "কী হল?"

দাসু বললে, "সব ঠিক আছে। দেখছ না তোমার শাশুড়ী কী রকম ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। তা ছাড়া তোমার মাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বিয়ে হচ্ছে। ভাবছে হয়ত কুশণ্ডিকা চুকে যাক, তার পরেই দেবে।"

"কত দেবে?"

"পাঁচশ টাকা ত নিশ্চয়ই। হাজারও দিতে পারে।"

এই বলেই দাসু চট্ করে তার পকেট থেকে একশ টাকার একখানি নোট বের করে শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "এইটে রাখ তোমার কাছে। আমার ঘটকালির দরুণ এই একশ টাকা আমাকে দিয়েছে।"

"এ-টাকা আমি রাখতে যাব কেন? তোমার টাকা তুমি রাখ।"

দাসু বললে, "ঝুলিটা আমি আনিনি দেখছ না? রাখ তোমার কাছে। আমি আবার চেয়ে নেব।"

শঙ্কর বললে "এখান থেকে গিয়েই বাড়িওলাকে বলেছি দেড় শ টাকা দেব। তার ওপর মা বউভাতের আয়োজন করবে। খরচ কম হবে না।"

দাসু বললে, "কিছু ভেবো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে। বউ কেমন হয়েছে বল।"

শঙ্কর বললে "ভাল।"

কুশণ্ডিকা চুকে গেল।

সকাল-সকাল চারটি খাইয়ে দিতে হবে মেয়ে-জামাইকে। তার পরেই ইন্দ্রাণীকে নিয়ে শঙ্কর চলে যাবে তার মার কাছে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যাবে তার ছোট ভাই সমর।

শঙ্করকে খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বসলেন তার সুমুখে একটি পাখা হাতে নিয়ে। বললেন, "তোমারই ওপর ভরসা করে ইন্দ্রাণীকে আমি দিলাম তোমার হাতে। তুমি ওকে দেখ বাবা। তোমার মাকে যা বলবার তুমিই বোল।"

থেমে থেমে তিনি বলতে লাগলেন, "বেয়ানের সঙ্গে পরিচয় করতে দিলে না বাবা, কী আর করব বল, আমার অদৃষ্ট। তোমার মায়ের উপযুক্ত সম্মান আমি করতে পারলাম না বাবা শঙ্কর। তোমার মা দু হাজার টাকা চেয়েছিলেন, আমি অত টাকা কোথায় পাব বাবা আমার যা-কিছু ছিল বিক্রি করে এক হাজার টাকা দিলাম।"

শঙ্কর এতক্ষণ মাথা হেঁট করে খেতে খেতে সব শুনছিল। এবার মুখ তুলে তাকালে। জিজ্ঞাসা করলে, "দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, কাল বিয়ের আগেই দিয়েছি দাসুর হাতে। দাসু বললে, জামাই-এর হাতে দেবেন না মা, মায়ের ভয়ে সে কি নিতে পারবে? দরকার হয় আমি নিজে গিয়ে আপনার বেয়ানের হাতে দিয়ে ওঁকে-যা বলবার বলে ঠাণ্ডা করে আসব। তার পর আপনাদের বেয়ানে বেয়ানে দেখা করিয়ে দেব।"

শঙ্কর আবার জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, কাল রাত্রে দিয়েছি এক হাজার। বিয়ের আগে তোমার জুতো কাপড় কেনবার জন্যে দিয়েছি দু শ। আর আজ সকালে ওর ঘটকালির জন্যে দিয়েছি একশ।"

শঙ্কর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেই উঠে পড়ল।

শঙ্কর দাসুকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথায় দাসু?

রাস্তায় পানের দোকান, চায়ের দোকান পর্যন্ত দেখে এল, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

বিয়ের আগে পঞ্চাশটি টাকা সে তাকে দিয়েছে। দেড়শ মেরেছে সেই দিন। তার পর এক হাজার। আর শুধু সেই জন্যেই তার নিজের ঘটকালির টাকা একশ তার হাতে দিয়ে দাসু পালিয়েছে। ইন্দ্রাণীকে দেখে শঙ্করের মন ভরে গিয়েছিল, ভেবেছিল মাকে সে খুশি করতে পারবে। দেড় শ টাকা দেবে বলে এক মাসের জন্যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে সে। নিয়েছে দাসুর কথা শুনে। বউভাতের আয়োজন করতে বলে এসেছে মাকে। দোকান থেকে ধারে জিনিস-পত্র কিনে দিয়ে এসেছে। বাবুদের বাড়ি থেকে পাঁচ-সাত দিনের ছুটি নিয়েছে তার মা। নেত্য নাপ্তিনীকে খবর দিতে বলে এসেছে, আর বলে এসেছে বস্তির মেয়েটার মাতাল ট্যাক্সি ড্রাইভার যে-মামাটা তাকে আর তার মাকে অপমান করে গিয়েছিল, তাকে যেন খবরটা জানিয়ে দেয় নেত্য। ইচ্ছে করলে বউভাতের নেমন্তন্ন সে খেয়ে যেতে পারে।

এ-সবই করেছে সে দাসুর কথা শুনে।

রাগে তার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। এ কী বোকার মত কাজ করলে সে! দাসুকে চিনেও চিনলে না। দাসু কোথায় থাকে কিছুই সে জানে না। তার বাড়িটাও অন্তত তার দেখে রাখা উচিত ছিল।

হতাশ হয়ে শঙ্কর ফিরে এসে বসতেই তার পুরোহিত এসে দাঁড়াল তার কাছে। বললে, "আমার পাওনাটা তাহলে মিটিয়ে দিন, আমি চলে যাই।"

"ও, হ্যাঁ!" শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। পকেটে দাসুর দেওয়া একশ টাকার নোটখানা রয়েছে। বললে, "আসুন, নোটটা ভাঙিয়ে দিই।"

একশ টাকার নোট—ভাঙাতে হলে একটা বড় দোকানে যেতে হয়। কাজেই একটা বড় স্টেশনারী দোকান। কিন্তু শুধু ভাঙানি চাইলে দেবে না। কী কিনবে? ইন্দ্রাণীকে

কিছুই সে দেয়নি। কী দেবে? চট্ করে বলে বসল, "খুব ভাল সেণ্ট আছে আপনার দোকানে?"

দোকানী বের করে দিলে দশ টাকা দামের ভাল একটি সেণ্টের শিশি। বললে, "এর চেয়ে ভাল কিছু আপাতত নেই।"

একশ টাকার নোটটি তার হাতে দিয়ে সেণ্টের শিশিটি সে কিনে ফেললে।

পুরোহিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার পাওনা কত?"

পুরোহিত বললেন, "ঘটকমশাইয়ের সঙ্গে আমার ত কথাই হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, কুড়ি টাকা দেবেন। আসলে ব্যাপারটা কী হয় জানেন? আমরা আমাদের প্রাপ্য পাই কন্যাপক্ষের তরফ থেকে। আর পাত্রপক্ষ দেয় কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে। কিন্তু ঘটকমশাই সে-নিয়ম বদলে দিলেন। বললেন, না, পাত্রপক্ষ দেবে পাত্রপক্ষের পুরুতকে আর কন্যাপক্ষ দেবে কন্যাপক্ষের পুরুতকে।"

অত কথা শোনবার অবসর নেই শঙ্করের। কুড়িটি টাকা পুরোহিতের হাতে দিয়ে বললে, "আসুন।"

পুরোহিত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শঙ্কর বললে, "যান, আপনি এবার ট্রামে চড়ে বাড়ি চলে যান।"

"ট্রামের ভাড়াটা? আসবার সময় অবশ্য আপনাদের সঙ্গে গাড়িতেই এসেছিলাম।"

খুচরো কিছু ছিল না শঙ্করের হাতে।

একটি টাকা পুরোহিতকে দিয়ে বললে, "দাসু ঘটকের বাড়ির ঠিকানা জানেন?"

পুরোহিত বললে, "আজ্ঞে না, তাঁর সঙ্গে ত আমার পরিচয় ছিল না। গঙ্গার ঘাটে আমি একটা লোকের শ্রাদ্ধের পিণ্ডি দেওয়াচ্ছিলাম। উনি আমাকে সেইখানে গিয়ে ধরলেন। আমি অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁর নিবাস কোথায়? তিনি বলেছিলেন, নবদ্বীপে। আপাতত থাকেন বুঝি বেহালায়। আজ্ঞে, আর কিছু আমি জানি না।"

শঙ্কর বললে, "আচ্ছা, যান আপনি।"

ভদ্রলোক তবু যান না!

"আবার কী?"

পুরোহিত বললেন, "আপনি আমাকে ট্রাম ভাড়ার দরুণ একটা টাকা দিলেন। আমার কাছে খুচরো পয়সা কিছু নেই, আপনাকে কত ফেরত দিতে হবে বলুন, আমি চট করে এই দোকান থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে আনি।"

শঙ্কর বললে, "থাক আর ফেরত দিতে হবে না, আপনি যান।"

খুশী হয়ে পুরোহিত চলে গেলেন।

বাড়ির দরজায় ইন্দ্রাণীর ভাই সমর দাঁড়িয়েছিল। বললে, "আপনি ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিলেন?"

শঙ্কর বললে, "না, আমি দাসু ঘটককে খুঁজছি।"

সমর বললে, "এই দেখুন, আপনাকে বলতে আমি ভুলে গেছি—সে বাড়ি চলে গেছে। যাবার সময় আমাকে বললে, তুমি তোমার জামাইবাবুকে বলে দিও, আমি তার বাড়িতেই যাচ্ছি। সেইখানেই দেখা হবে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আমি তখন কোথায় ছিলাম?"

"আপনি তখন মন্ত্র বলছিলেন আর দিদির মাথায় সিঁদুর দিচ্ছিলেন।"

"হুঁ।" বলে শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

সমর বললে, "ট্যাক্সি ওদিকে পাওয়া যায় না। এই দিকে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। ডাকব।"

শঙ্কর বললে, "তোমার দিদি তৈরি হয়েছে?"

সমর বললে, "হ্যাঁ। দিদি জামা কাপড় পরে মার কাছে বসে বসে কাঁদছে।"

শঙ্কর চমকে উঠল। "কাঁদছে? কেন?"

সমর বললে "কাঁদতে হয় যে! মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কাঁদে না?"

এত দুঃখেও হেসে ফেললে শঙ্কর। বললে, "ডাক একটা ট্যাক্সি।"

শঙ্কর নতুন যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে, সেটাও ঝিলপাড়ায়। সেই বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

দোরে দাঁড়িয়েছিল নেত্য নাপতিনী। ছুটে গিয়ে বাড়ির ভিতর খবর দিলে সে।

বিমলা বেরিয়ে এল জলের একটা ঘটি হাতে নিয়ে। নেত্যর হাতে ঘটিটা ধরিয়ে দিয়ে বিমলা এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। শঙ্কর গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দোর খুলে ইন্দ্রাণীর সুটকেসটি হাতে নিয়ে বললে, "নাম।"

ইন্দ্রাণী নামল, সমর নামল।

শঙ্কর ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বললে, কর। এই আমার মা।"

ইন্দ্রাণী সেইখানেই মাথা হেঁট করে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। বিমলা তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "থাক মা থাক। জন্ম-এয়োস্ত্রী হও সুখে থাক। এই ত কেমন সুন্দর বউ হয়েছে আমার। নেত্য দ্যাখো ভাল করে। সেই মিনষেকে গিয়ে বলবে।"

একতলা বাংলোর মত বাড়ি। তিন চারখানা বড় বড় ঘর। একদিকে মস্ত বড় রান্নার জায়গা, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর। সামনে একটুখানি উঠোন। চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

সামনের একখানা ঘরে বউয়ের বসবার জায়গা করাই ছিল। বিমলা তাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে বসল তার ভাই সমর।

পাশের ঘরে গিয়ে ইন্দ্রাণীর সুটকেসটা নামিয়ে শঙ্কর ডাকলে, "মা, শোন।"

বিমলা নেত্যকে বউমার কাছে রেখে শঙ্করের কাছে গেল।

মাকে শিখিয়ে রাখা হয়েছিল, বউ দেখে তুমি একটু অবাক হয়ে যাবে। বলবে, সে কিরে তুই কি তাহলে আমাকে না জানিয়েই বিয়ে করে ফেললি? তার পর বউ দেখে খুশি হয়ে বলবে তা বেশ করেছিস। আমি বউ চেয়েছিলাম, ঘর আলো-করা বউ পেলাম। এস মা, এস।

কিন্তু বিমলা সেসব কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে। অভিনয় সে একেবারে করতে পারলে না। এমন্ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, এমনভাবে কথা বললে, মনে হল যেন সবই সে জানে।

ইন্দ্রাণী নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। সে জানে স্বামী তার মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে। এখন সে ভাববে হয়ত—এদের সব মিছে কথা। হয়ত-বা ভাববে এরা মানুষ ভাল নয়।

বিমলা এসে দাঁড়াল শঙ্করের কাছে। শঙ্কর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বললে, "তুই যা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলি সব ভুলে গেলাম। তাছাড়া ও-সব আমি ভালও বাসি না।"

শঙ্কর বললে, "চুপ! আস্তে কথা বল। শুনতে পাবে।"

"শুনুক না! কদিন লুকিয়ে রাখবি? জানবে আমরা গরিব। জানুক না। বড়লোক সেজে কদিন থাকতে পারবি তুই?"

"আঃ, চুপ করো না!" শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে "দাসু এসেছিল?"

বিমলা বললে, "না, আসেনি। বাড়িওলাকে কী বলে গিয়েছিলি? দু দুবার এসেছিল। লোকটার খুব মুখ খারাপ।"

শঙ্কর মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

"কী ভাবছিস? এই দ্যাখ্, বলতে ভুলে যাচ্ছি, দোকান থেকে ধারে জিনিস এনেছিস, তাদের লোক এসেছিল। তা এত এত ঘি ময়দা কী হবে? কত লোককে নেমন্তন্ন করবি?"

শঙ্কর বললে, "তা করতে হবে বই-কি!"

বিমলা বললে, "তাহলে আমিও কিছু করি?"

"হ্যাঁ কর। কিন্তু তুমি যেখানে কাজ কর, তাদের কাউকে বোল না।"

এই বলে শঙ্কর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ইন্দ্রাণীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, "দাসু আগেই তোমাকে খবর দিয়েছে! তাই বল!"

বিমলার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি

একটু ঘুরে আসি মা। নেমন্তন্নটা সেরে দিয়ে আসি। খাওয়াবার ব্যবস্থা কাল রাত্রে।"

দোরের কাছ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল শঙ্কর। পকেট থেকে দশ টাকার একটি নোট বের করে মার হাতে দিয়ে বললে, "আজ তোমার বাড়িতে দুজন নতুন মানুষ এসেছে। রাত্তিরে একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।"

ইন্দ্রাণীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সমর চুপি চুপি বললে, "জামাইবাবু গরিব মানুষ নয় দিদি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "চুপ!"

ঠিক শ্রীহরির কাছে যাবে বলে যায়নি শঙ্কর। ভেবেছিল শক্তি মন্দিরে গিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করে আসবে আর সেই সঙ্গে ক্লাবের যে-সব ছেলেরা তার অনুগত—তাদেরও জানিয়ে দেবে।

কলকাতার পথে পথে সে বৃথাই সন্ধান করে ফিরছিল দাসুর। শঙ্কর মনে মনে জানে সে পালিয়েছে। হয়ত বা কলকাতা ছেড়েই চলে গেছে।

তবু সে একবার থমকে থামল ঠিক সেই জায়গাটায়—দাসু যে-জায়গাটায় একদিন ট্রাম থেকে নেমেছিল।

এরই কাছাকাছি কোথাও সে থাকে নিশ্চয়ই। একদিন না একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। মাত্র এক হাজার টাকা মেরে দিয়ে সে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারবে না।

ইলেকট্রিক পোস্টের গায়ে একটা হাত রেখে শঙ্কর এমনি-সব নানা কথা ভাবছে। ভাবছে, কিছু টাকার তার একান্ত প্রয়োজন। টাকা না হলে ইন্দ্রাণীর কাছে তার সম্মান থাকবে না।

বাড়িওলাকে টাকা দিতে হবে। দোকানীকে টাকা দিতে হবে। তা ছাড়াও এতগুলি লোককে ভাল করে খাওয়াতে হলে আরও সব অনেক কিছু কেনা দরকার।

এই সব কথা ভাবছে আর মনে হচ্ছে, দাসুকে এখন যদি সে হাতের কাছে পায় ত তাকে এমন শিক্ষা দেবে যে, সে এমন কাজ আর জীবনে কখনও করবে না।

হঠাৎ তার গায়ে হাত পড়তেই চমকে সে পিছন ফিরে দেখলে, শ্রীহরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। গাল দুটো তার তেমনি ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো তার তেমনি ছোট হয়ে গিয়েছে। "শক্তি-মন্দিরে আর যাচ্ছ না কেন শঙ্করদা, কী হয়েছে তোমার?"

"একটা লোক আমাকে ঠকিয়েছে। আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"তোমাকে ঠকিয়েছে?"

কথাটা সে এমনভাবে বললে, মনে হল, শঙ্করদাকে ঠকানো তার কাছে যেন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

শঙ্কর বললে, "চল, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।"

শ্রীহরি বললে, "আমি এখন ছাপাখানায় যাচ্ছি শঙ্করদা।"

"চল্ ওই দিকেই যাই।"

ছাপাখানার কাছাকাছি গিয়ে শঙ্কর বললে, "শক্তি-মন্দিরের তহবিলে টাকা আছে?"

শ্রীহরি বললে, "তুমি ত জান।"

"না, আমি অনেকদিন দেখিনি।"

"আছে গোটা চল্লিশেক।"

"আর দরিদ্র ভাণ্ডারে?"

শ্রীহরি বললে, "দরিদ্র-ভাণ্ডারে আছে বোধহয় নব্বই টাকা।"

কথাটা বলতে কেমন যেন আটকাচ্ছিল শঙ্করের, তবু বললে, "তুই আমাকে শ দুই টাকা কোথাও থেকে এনে দিতে পারিস? তিন-চার দিন পরে ফেরত দেব।"

শ্রীহরি বললে, "তুমি আমাদের ছাপাখানার দোরে দাঁড়াও, আমি দেখছি।"

শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল গেটের সামনে।

শ্রীহরি খানিক পরেই বেরিয়ে এল—দশটাকার কুড়িখানা নোট হাতে নিয়ে। শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "ক্যাসিয়ারের কাছে থেকে নিয়ে এলাম। গুনে দ্যাখো।"

শঙ্কর নোট গুনছে, এমন সময় শ্রীহরির দাদা এসে শঙ্করকে বললে, "কই দেখি নোটগুলো।"

নোটগুলো একরকম সে কেড়েই নিলে শঙ্করের হাত থেকে। তারপর শ্রীহরির দিকে তাকিয়ে বললে, "তোর বেশ আক্কেল ত? ভাগ্যিস আমি দেখলাম। বলেই নোটগুলো সে পকেটে রাখলে। তারপর শঙ্করকে বললে, "না ভাই, টাকা এখন দেওয়া হবে না। তুমি অন্য কোথাও দ্যাখো। কাল শনিবার, আমাদের পেমেণ্টের দিন।"

শ্রীহরির দাদা ভিতরে চলে গেল। শ্রীহরি তার দাদার পিছনে ছুটল : "দাদা! দাদা!"

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখলে, শঙ্কর চলে গিয়েছে।

নেত্যকে বউমার কাছে রেখে বিমলা নিজেই গিয়েছিল বাজারে। বাড়িতে সবই সে ঠিক করে রেখেছে। রাত্রে খাবার লোক মাত্র তিনজন। ভাল দেখে আধসের মাংস কিনে আনলেই চলবে।

তার বস্তির বাড়িটা বেশি দূরে নয়। যদিও তালা বন্ধ করে এসেছে, তবু একবার দেখে যাওয়া ভাল।

বাড়ির আশেপাশে যারা থাকে, তারা সবাই তাকে ভালবাসে। বড় গরিব তারা। পেট ভরে দুবেলা খেতে পর্যন্ত পায় না। বাড়িতে তার বউ এসেছে। কাল বউভাত। এত এত জিনিস এসেছে বাড়িতে। এত লোক খাবে, আর এই সুযোগে তাদের কয়েকজনকে যদি ভাল মন্দ দুটো খাইয়ে দিতে পারে, তার ছেলে বউকে তারা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

আজ না হয় সে একটা বড় বাড়িতে বাস করছে, দুদিন বাদে ওই বউ নিয়েই তাকে তার বস্তির বাড়িতে উঠে যেতে হবে। কাজেই তার প্রতিবেশী কয়েকজনকে বলে যাওয়া ভাল।

বাজারে যাবার পথে তাই সে ছেলেতে মেয়েতে জন দশবারো লোককে বলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল, কাল সন্ধ্যে-বেলা তোমরা যাবে আমার ওই বাড়িতে, কাজকম্ম কিছু করে দেবে আর আসবার সময় চারটি খেয়ে আসবে।

পেট ভরাবার জন্য দুবেলা দুটি অন্ন আর লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্রই যাদের জীবনের একমাত্র চাওয়া, বিয়ে-বাড়িতে চারটি খেয়ে আসবার নিমন্ত্রণ পাওয়াকে তারা দুর্লভতম সৌভাগ্য ছাড়া আর কী ভাবতে পারে?

বাজার থেকে বিমলা ফিরে আসবার আগেই দেখলে, ফিরিওলা রামু এসে হাজির হয়েছে।

বিমলা আসতেই নেত্য বললে, "আমি এবার আসি।"

বিমলা বললে, "কাল একটু সকাল-কাল এস নেত্য। তোমার কর্তাটিকেও আসতে বোলো। এইখানেই খাবে তোমরা।"

"আসব।" বলে নেত্য চলে গেল।

"বউমা কোথায়?"

"চানের ঘরে গেছে। ওই ত এসেছে।"

রামু ফিরিওলা বুড়ো মানুষ। মুখে মাত্র দুটি কি তিনটি দাঁত। মাথার চুল সব সাদা। হাতজোড় করে উবু হয়ে বসে আছে দোরের বাইরে। ইন্দ্রাণীকে দেখেই বলে উঠল, "আ হা হা হা, ই যে পিতিমের মতন বউ হয়েছে দিদিঠাকরুণ! যেমন ছেলে, তেমনি বউ।"

বিমলা বললে, "তুমি ছিলে না বাড়িতে, তাই তোমার নাতনীকে বলে এসেছিলাম।"

রামু বললে, "তাই শুনেই ত ছুটে আসছি দিদি, বলি, বউ ঠাকরুণকে দেখে আসি। কাল আবার আসব। চারটি পেসাদ পেয়ে যাব। নাতনীটাকেও নিয়ে আসব ত দিদি?

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার নাতনীকেও নিয়ে আসবে বই-কি!"

রামু জিজ্ঞাসা করলে, "তা ই বাড়িটি কদিনের জন্যে ভাড়া নিয়েছ দিদি?"

"সে-সব আমি জানি না রামু, শঙ্কর জানে।"

রামু বললে, "তা এইরকম বাড়ি না হলে

"ইযে পিতিমের মতন বউ হয়েছে"

ইন্দ্রাণী কথা বললে। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "শাশুড়ী রান্না করে?"

রামু বললে, "কী আর করবে মা? দাদাবাবু যতদিন রোজগার না করবে, ততদিন মাকে এ-কাজ করতেই হবে। হ্যাঁ, বাহাদুর তোমার শাশুড়ী বৌরানী! দুটি বেলা গামছায় বেঁধে ভাত-ডাল-তরকারি ছেলের জন্যে বয়ে বয়ে আনছে। কিন্তু ছেলেও রাজপুত্তুরের মতন দেখতে, গায়ের ক্ষেমতা খুব। ও-ছেলে একদিন বড় হবে, মেলা টাকা রোজগার করবে। তখন আর কোনও দুঃখ থাকবে না। তাই যেন হয়, হে ভগবান, তাই যেন হয়!"

কি চলে? বেয়াই বাড়ির কুটুমজন সব আসবে, বস্তিতে বিয়ে দিলে তাদের বসবার দাঁড়াবার ঠাইটুকু পর্যন্ত দিতে পারতে না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে বেশ বড়লোকের বাড়িতেই ছেলের বিয়ে দিলে।"

"হ্যাঁ, তা দিলাম।" বলেই বিমলা চলে গেল রান্নাঘরে।

রামু কিন্তু থামল না। বললে, "তা হ্যাঁ গা মা-লক্ষ্মী, গরিবের বাড়িতে বিয়ে হ'ল, বস্তিতে গিয়ে থাকতে পারবে ত? হাঁড়ি ধরতে পারবে ত?"

ইন্দ্রাণী শুনলে সব। জবাব দিলে না।

রামু বললে, "তবে দুজনের রান্না। শঙ্কর দাদাবাবুর আর নিজের। শাশুড়ী ত চলে যাবে বাবুদের বাড়িতে রান্না করতে।"

এই বলে সেইখানেই মাথাটি মাটিতে ঠেকিয়ে রামু ইন্দ্রাণীকে একটি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

"আজ চলি মা-লক্ষ্মী। কাল আবার আসব। কোথায় গো দিদিঠাকরুন, আমি চললাম দিদি, দুয়োরটি বন্ধ করতে হবে যে।"

বিমলা বোধকরি রান্নাঘর থেকে শুনতে পেল না।

সমর চোখ বুজে শুয়ে ছিল ইন্দ্রাণীর কাছে। তাকে তুলে দিয়ে ইন্দ্রাণী বললে, "যা সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।"

রামু চলে গেল। কিন্তু দরজাটি বন্ধ করতে গিয়ে সমর বিপদে পড়ল। আবার একজন ভদ্রলোক দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"শঙ্করবাবু কোথায়?"

সমর বললে, "বেরিয়ে গেছেন।"

"নে বাবা, এ আমি কার পাল্লায় পড়লাম! তার মা কোথায়?"

সমর বললে, "রান্না করছে।"

ভদ্রলোক সেইখান থেকে চিৎকার করে বললেন, "ওগো মা, শুনছেন? আমি আবার এসেছিলাম। ছেলেটিকে না-জেনে না-শুনে শুধু চেহারা দেখে ভুলে গেলাম আমি। অগ্রিম টাকা না নিয়ে কাউকে আমি ভাড়া দিই না। আর এইখানে গেলাম ফেঁসে।"

"এ কী কথা বলছেন আপনি?"

বিমলা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। "কখন আপনার ভাড়া দেবার কথা ছিল?"

ভদ্রলোক বললেন, "আজ সকালে।"

বিমলা বললে, "না, বিয়ের কনে কুশণ্ডিকা সেরে সকালে আসতে পারে না। আসে বিকেলে। এখনও সন্ধ্যে হয়নি। টাকা যে দেবে, এসেই সে বেরিয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে তার এখনও দেখা হয়নি। আর আপনি একেবারে পাগল হয়ে গেলেন?"

"পাগল হয়েছি কি সাধে মা? লোক-জনের কাছে আপনার ছেলেটি সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে পাগল হবারই কথা।"

বিমলা বেশ রেগে রেগেই জিজ্ঞাসা করলে, কী শুনেছেন?"

"শুনেছি যা, সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলেটি গুণ্ডা। ভাড়া ত পাবই না। এমনকি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বলছি কি, হাত জোড় করে বলছি—ভাড়া আমার চাই না। আপনারা আজ আমার বাড়িটি ছেড়ে দিন।"

বিমলা বললে, "বেশ কথা আপনার! কাল আমার বউভাত। আর আজ আমার বাড়িটি ছেড়ে দিন! যান, আপনি কাল আসবেন। কাল আমার বাড়িতে কাজ। পরশু আসতে পারেন ত আরও ভাল হয়।"

এই বলে বাড়িওলা ভদ্রলোককে একরকম জোর করে বের করে দিয়ে বিমলা দোরটা দিলে বন্ধ করে।

"ছেলে আপনার গুণ্ডা! ভাড়া হয়ত না পেতে পারি! কথা শোনো মিনষের!"

গজগজ করতে করতে বিমলা আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

শ্রীহরির কাছে টাকা না চাইলেই ভাল করত শঙ্কর।

অথচ টাকা তার চাই। টাকা না পেলে তার সম্মান থাকবে না। হঠাৎ মনে পড়ল বোসবাগানের সুরপতিবাবুকে। সুরপতি-

বাবু তাকে ভালবাসেন। টাকা চাইলে হয়ত-বা দিতেও পারেন।

এদিকে বাড়িতে রয়েছে তার সদ্য-বিবাহিতা তরুণী স্ত্রী। পরমাসুন্দরী ইন্দ্রাণী। এখনও তার সঙ্গে ভাল করে তার পরিচয় পর্যন্ত হয়নি।

বোসবাগানের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েও শঙ্কর ফিরে এল। আজ থাক, কাল যাবে সুরপতিবাবুর কাছে।

বাড়ি ফিরেই শঙ্কর দেখলে, একটা ঘরের মেঝেয় শতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে আছে ইন্দ্রাণী। সমর তাকে দরজা খুলে দিয়ে আবার তার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রান্নাঘরে ছিল বিমলা। শঙ্কর তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বিমলা বললে, "কীরকম ছেলে রে তুই! বাড়িওলার টাকাটা ওখান থেকে এসেই ফেলে দিলিনে কেন? যা-তা বলে অপমান করে গেল।"

"অপমান করে গেল?"

"হ্যাঁ। বললে আজ সকালে দেবার কথা ছিল। বললাম না তোকে, সকালে একবার এসেছিল? আবার এখন এসে একেবারে গুন্ডা ফুন্ডা কত কী! ছি ছি, বউমার সামনে—আমার মাথা কাটা গেল।"

একে শঙ্করের মনের অবস্থা খারাপ ছিল, তার ওপর আরও খারাপ হয়ে গেল।

মা আবার বললে, "টাকা নিয়ে এলি শ্বশুরবাড়ি থেকে, আমার হাতে দিয়ে গেলেই পারতিস, ফেলে দিতাম মিনষের মুখের ওপর। আর তোকেই-বা কী বলব বাবা? একবারে দেড়শ টাকার বাড়ি ভাড়া করে বসলি! এইবার বিয়ে হল, ভালই হল—নিজে এবার যা একবার ময়নাবুনিতে, ভাল করে দেখে শুনে আয়, তারপর কিছু রোজগারপাতি কর। আমার আর ভাল লাগে না বাবা।"

কথাগুলো শঙ্করের ভাল লাগছিল না। বললে, তুমি "থাম ত মা। কাল ওর টাকা আমি দিয়ে দেব।"

"হ্যাঁ, তাই দিয়ে দিস।"

এই কথা বলেই মা অন্য কথা পাড়লে। "শাশুড়ী কেমন বললি না ত?"

শঙ্কর বললে, "ভাল।"

বিমলা বললে, "বউমা খুব ছেলেমানুষ নয় কিন্তু। তোর চেয়ে বছরখানেকের ছোট হবে হয়ত।"

"হুঁ।"

"লেখাপড়াজানা মেয়েদের খুব অহঙ্কার হয় গরিবের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না।"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

বিমলা বললে, "বেয়ান বোধহয় খুব আদর দিয়ে মানুষ করেছে। কাজকর্ম কিছু শেখায়নি। দ্যাখ আবার, আমরা কপালে কী হয় কে জানে!"

শঙ্কর একটা কথাও বললে না।

"এর চেয়ে আমি যে-মেয়েটাকে দেখে এসেছিলাম সেইটেই ছিল সত্যিকার গরিবের মেয়ে। আমাদের সঙ্গে খাপ খেত ভাল।"

শঙ্কর এতক্ষণ পরে কথা বললে। কথাটা বোধকরি তার ভাল লাগল না। বললে, "কী জানি বাবা, কী মেয়ে তুমি দেখে এসেছিলে। তার মামাটা আমাদের রীতিমত অপমান করে গেল, বললে এ-ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব না, তবু ভুলতে পারছ না তার কথা। কেন, বউ কি তোমার দেখতে খারাপ হয়েছে?"

"না রে, আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি, এই যে, আমি রাঁধতে এলাম, বাড়িতে একটা ঝি নেই, একটা চাকর নেই, অন্য মেয়ে হলে ছুটে আসত আমার হাতের কাজ কেড়ে নিতে। বিয়ের কনেকে অবশ্য কাজ করতে আমি দিতাম না, কিন্তু ওরও ত একটা কর্তব্য ছিল। কই, তুই বল না!"

কথাটা অবশ্য খুব চুপি-চুপি বললে বিমলা।

শঙ্কর বললে, "দাঁড়াও আজ আমি ওকে বলব সে কথা।"

বিমলা আবার সাবধান করে দিলে, "দেখিস যেন এই নিয়ে প্রথম দিনেই ঝগড়াঝাঁটি করিস না।"

দক্ষিণদিকের সবচেয়ে ভাল ঘরটিতে বেশ পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিয়েছিল বিমলা। ছেলে বউ শোবে ওই ঘরে।

ধরতে গেলে আজই তাদের প্রথম পরিচয়।

শঙ্করকে আগে খাইয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে আর সমরকে নিজের কাছে বসিয়ে আদর করে খাওয়াতে চেয়েছিল বিমলা। ইন্দ্রাণী কিন্তু খেলে না ভাল করে। গোমড়া মুখ করে বসে নাড়াচাড়া করলে শুধু। বিমলা যে এত কথা বললে, একটা জবাব দেওয়া দূরে থাক, একবার মুখ তুলে তাকালে না ইন্দ্রাণী।

বিমলা যা ভেবেছে ঠিক তাই। তার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সাধাসিধে একখানা শাড়ি পরেছিল ইন্দ্রাণী। বিমলা বললে, "ও কাপড়টা তুমি ছেড়ে দাও বউমা। ভাল একখানা শাড়ি পর।"

ইন্দ্রাণী বললে, "না থাক।"

শাড়িখানা কিছুতেই ছাড়ল না সে। সেই শাড়ি পরেই শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শঙ্কর ঘরে ছিল না। সে তখন বাইরে দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে বসে কী যেন ভাবছিল।

বিমলা বললে, "ওখানে বসে কেন রে? যা ঘরে যা। আমি খিল বন্ধ করব।"

যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসেছিল শঙ্কর। বলবামাত্র উঠে এল।

ঘরে ঢুকে দেখলে, ইন্দ্রাণী খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্কর দোরটা বন্ধ করে দিয়ে খাটে গিয়ে বসল। ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালে। লজ্জা করছিল একটুখানি, তবু সে হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীর কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনলে।

শঙ্কর ভেবেছিল সে অতি সহজে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে তার গায়ের উপর ঢলে পড়বে, লজ্জায় তার বুকে মুখ লুকোবে। কিন্তু সে-জাতের মেয়েই নয় ইন্দ্রাণী। এগিয়ে এল বটে শঙ্করের কাছে, কিন্তু সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার মাকে আপনি এরকম করে ঠকালেন কেন?"

ইন্দ্রাণীর মুখ থেকে প্রথমেই সে একথা শুনবে সে-আশা করেনি। তবে এ প্রশ্নের জন্যে শঙ্কর প্রস্তুত হয়েই ছিল। বললে, "আমি ঠকালাম? তোমার মাকে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "হ্যাঁ। আপনি দেড় শ টাকা মাইনের চাকরি করেন, সায়েব আপনাকে বিলেত পাঠাতে চাচ্ছে—আপনি আই-এসসি পাশ করেছেন, এই সব মিথ্যে কথা বলে আমার সর্বনাশ করবার কী দরকার ছিল আপনার?"

শঙ্কর বললে, "কে বলেছে এ-সব কথা? আমি বলেছি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আপনি নাই-বা বললেন, বলেছে আপনার ঘটক।"

শঙ্কর হেসে উঠল। "ঘটক ত আমার নয়। ঘটক তোমার মায়ের। আমাকেও সে তোমার মায়ের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"বলেছে, তোমার মা খুব বড়লোক। তোমার মায়ের হাতে মেলা টাকা আছে।"

"আছেই ত।"

শঙ্কর বললে, "ছাই আছে। তাই তিনি একটা পয়সাও দিতে পারলেন না আমাকে"।

ইন্দ্রাণী বললে, "দিয়েছে ত এক হাজার টাকা।"

"একটা পয়সাও না। আমার হাতে তিনি একটা পয়সা দেননি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ঘটকের হাতে দিয়েছে।"

শঙ্কর বললে, "তাই সে ঘটকের আর টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। সেই টাকা নিয়ে ঘটক পালিয়েছে।"

"সেও কি আমার মায়ের দোষ?"

শঙ্কর বললে, "না, আমার দোষ।"

ইন্দ্রাণী বললে, "লেখাপড়াজানা মেয়ে আপনার মা পছন্দ করেন না বলে লুকিয়ে

আপনি আমাকে বিয়ে করতে গেলেন, সে-দোষটা কার ?"

"আমার।" শঙ্কর এবার ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "সে-দোষটা সত্যিই আমার, কারণ তোমাদের ওই ঘটক দাসু তোমার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলেছিল আমাকে, যার জন্যে আমি একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিলাম তোমাকে পাবার জন্যে।"

এই বলে ইন্দ্রাণীকে সে তার কোলের কাছে টেনে আনলে। এবার আর ইন্দ্রাণী পারলে না নিজেকে ঠিক রাখতে। বললে, "হুঁ। তা কেন হবে? আমার মায়ের সংগে তোমার মায়ের দেখা হয়ে গেলে পাছে সব ফাঁস হয়ে যায় তাই তুমি গেলে লুকিয়ে বিয়ে করতে।"

শঙ্কর বললে, "যাক, এতক্ষণে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামলে।"

ইন্দ্রাণী এবার শঙ্করের চোখের উপর চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "বল সত্যি কিনা!"

"কী সত্যি? কী বলব ?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তোমার মা ভাত রাঁধে।"

"সে-খবরও পেয়েছ ?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমি সব জানি। কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবে ?"

"লুকিয়ে রাখতে ত চাইনি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "তুমি রোজগার করতে পার না ?"

শঙ্কর বললে, "লেখাপড়া জানি না যে।"

"তাহলে লেখাপড়া-জানা মেয়ে বিয়ে করতে গেলে কেন ?"

শঙ্কর বললে, "তার কাছে শিখব বলে।"

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ পরে হেসে ফেললে। মুক্তোর মত শুভ্র সুন্দর দাঁতগুলি দেখা গেল, কালো দুটি চঞ্চল চোখের তারাও যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শঙ্কর এবার তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিছানার উপর তুলে এনে চেপে ধরলে।

ইন্দ্রাণী বললে, "কী জোর রে বাবা! সত্যিই তুমি একটি ডাকাত।"

"হ্যাঁ, আমি তাই।"

শঙ্কর আর তাকে কোনও কথা বলবার অবসর দিলে না। ইন্দ্রাণীর সুন্দর মুখখানি নিজের মুখ দিয়ে চেপে ধরে, বাঁহাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা নিবিয়ে দিলে।

পরের দিন সকালে বাড়িওলা আবার এসে হাজির!

বিমলা তাঁকে দেখেই বলে উঠল, "ওরে ও শঙ্কর, ভদ্রলোকের রাত্তিরে ঘুম হয়নি ও'র টাকাটা দিয়ে দে!"

বাড়িওলা বললেন, "হ্যাঁ দিন। আমি একেবারে রসিদ কেটে এনেছি।"

শঙ্কর এসেই বললে, "কী মশাই, কী বলেছেন আপনি ?"

"কই কিছুই ত বলিনি।"

শঙ্কর বললে, "নিশ্চয় বলেছেন। আমি গুণ্ডা, আমি জোচ্চোর, আমি আপনার টাকা মেরে দেব—এ-সব আবার কীরকম কথা ?"

এরকম ভাবে যে শঙ্কর তাঁকে আক্রমণ করবে, সে কথা তিনি ভাবেননি। তিনি কাঁচুমাচু করতে লাগলেন। "না না, ও-সব কিছু নয়, মানে তুমি ত—"

শঙ্কর ধমক দিয়ে উঠল, "খবরদার 'তুমি' বলবেন না। আমি আপনার চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও আপনার মত লোক আমাকে 'তুমি' বলবে—সে আমি সহ্য করব না।"

"আচ্ছা বেশ, তুমি বলব না। টাকাটা দিন আমি চলে যাই।"

কোনেরকমে টাকাটা নিয়ে তিনি পালাতে পারলে বাঁচেন।

শঙ্কর বললে, "বে-আইনী টাকা নিতে এসেছেন, তার ওপর মুখের চোটপাট দ্যাখো!"

বিমলা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, "অত সব কথায় কাজ কী বাবা, টাকা দেব বলেছিস, দিয়ে দে। প্যাঁচানো কথা আমি ভালবাসি না।"

শঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল, "তমি থাম।"

"মুখের হুমকি দিয়েই ত থামিয়ে দিয়েছিস চিরকাল।"

বাড়িওলা বললেন, "ওই দেখুন, আপনার মা হলেন গিয়ে সাচ্চা মানুষ, উনি ঠিক বলেছেন।"

শঙ্কর বললে, "না, ঠিক বলেননি। আপনাকে টাকা আমি আজ দেব না। আজ আমার বাড়িতে কাজ। কাল সকালে আসবেন। টাকা নিয়ে যাবেন। এখন আপনি থানায় যেতে চান যান, আদালতে যেতে চান যান। এই আমার শেষ কথা।"

বাড়িওলা বিমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "দেখুন মা, দেখুন—"

"মা কী দেখবেন? বেশী চেঁচামেচি যদি করবেন ত আমিই থানায় যেতে বাধ্য হব। তখন সেই মাসের শেষে টাকা পাবেন। যান আপনি।"

এবার আইনের কথা। সত্যিই যদি ছোঁড়াটা এইরকম কিছু করে বসে, বাধ্য হয়ে তাকে এক মাস পরে টাকা নিতে হবে। তার চেয়ে—

বাড়িওলা বললেন, "বেশ, তবে আমি কালই আসব।"

কিন্তু কী দুঃখে যে সে-কথা তিনি বললেন, তা তিনিই জানেন। পিছন ফিরে ঘোঁত ঘোঁত করে বলে গেলেন, "তাহলে যা শুনেছি, সেই কথাই সত্যি।"

কথাটা শঙ্কর শুনতে পেলে, চেঁচিয়ে বললে, "আবার ?"

বলে যেই সে দোরের বাইরে পা বাড়িয়েছে বাড়িওলা পিছন ফিরে দেখেই দে ছুট!

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বউয়ের ব্যবহার দেখে বিমলা বিশেষ খুশি হতে পারেনি।

কোন্ মা-ই বা হয়?

শঙ্কর দোর বন্ধ করে ফিরে আসতেই বিমলা আপনমনেই বলতে লাগল, "তুই যদি ভাল হবি ত আমার এ দুর্দশা কখনও হয়। গুণ্ডার মতন চেহারাটা বাগালেই মানুষ হয় না। পেটে একটু বিদ্যে থাকা দরকার।"

শঙ্কর বললে, "মা, একটু থামবে ?"

তার ভয় শুধু বউ বুঝি শুনতে পায়।

মা কিন্তু থামল না। থামতে পারলে না। আজও সে নিজেই কাজ করে মরছে। বউ তেমনি হাত গুটিয়ে বসে আছে।

বিমলা বললে, "দূর, দূর, এ-জীবন আর রাখতে ইচ্ছে করে না।"

শঙ্কর বললে, "কেন। কী, হল কী তোমার ?"

বিমলা রাগ করেই বললে, "কিছুই হয়নি। মিথ্যে কথা, চালাকি, প্যাঁচ-পয়জার আমি ভালবাসি না। সোজা সত্যি পথে আমি চলতে চাই, তাতে আমার যা হয় তাই হবে।"

শঙ্কর বললে, "বেশ বাবা, তাই চল তুমি। আমি খারাপ, আমি বজ্জাত, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমি গুণ্ডা—"

বিমলা বললে, "হ্যাঁ, তাই ত। টাকা পেলি তবু ওই ছ্যাঁচড়া লোকটাকে যা-তা বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলি। এটা কি তোর ভাল হল? এত টাকা দিয়ে বড়মানুষি দেখাবার জন্যে কী দরকার ছিল তোর এই বাড়ি ভাড়া নেবার ?"

শঙ্কর বললে, "তাও কি তোমাকে দেখতে হবে ?"

"না, কিছুই আমাকে দেখতে হবে না, চোখ বুজে থাকতে হবে। আর তোর জ্বালায় আমাকে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে ?"

শঙ্কর বললে, "আমার জ্বালায় কখন তুমি জ্বলেপুড়ে মরলে? দ্যাখো, মিথ্যে কথা বোল না।"

"বিমলা বললে, "আমি মিথ্যে কথা বলি ?"

শঙ্করের এই একটি কথায় বিমলার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। বললে, "তুই শেষে আমাকে এই কথা বললি শঙ্কর ?"

বলতে বলতে গলার আওয়াজ তার রুদ্ধ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে দরদর করে জলের

ধারা গড়িয়ে এল। সর্বশরীর তার থর-থর করে কাঁপতে লাগল। তেমনি কাঁদতে কাঁদতেই বললে, "মাকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে নিজে দেখে-শুনে বিয়ে করলি। নিজের পেটে এক ফোঁটা বিদ্যে নেই আর লেখাপড়াজানা পাশকরা একটা মেয়ে নিয়ে এলি বিয়ে করে। ফর্সা রং দেখে। একদিনেই তার গোলাম হয়ে গেলি। দেমাগে মাটিতে পা পড়ছে না মেয়ের। গোমড়া মুখ করে বসে আছে। একটা কথা পর্যন্ত বলে না। আমি যেন ওর বাঁদী।"

শঙ্করের আর সহ্য হল না। বললে, "চেঁচাও তুমি। আমি চললাম।"

এই বলে সে উঠে চলে গেল।

যাবার সময় বলে গেল, "মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তোমার নেই তা আমি জানি। আগুন না জ্বালিয়ে তুমি ছাড়বে না।"

বিমলা রাগের মাথায় বললে, "সত্যি যা তাই বলব, তাতে আগুন জ্বলে ত জ্বলুক।"

মার উপর রাগ করেই শঙ্কর বেরিয়েছিল।

ইন্দ্রাণী তার কথাগুলো নিশ্চয়ই শুনেছে। শুনে কী ভাবলে কে জানে। যা ভাবে ভাবুক।

শঙ্করের চাই টাকা। তা সে যেমন করেই হক। দাদু তাকে এই বিপদে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে। মুখ ফুটে কাউকে সেকথা সে বলতে পর্যন্ত পারছে না। এখন নিজের সম্মান যদি বাঁচাতে হয় ত নগদ কিছু টাকা ছাড়া কোনও পথ নেই।

বেলা দুটো পর্যন্ত এখান-ওখান সে বৃথাই ঘুরে মরল। কোথাও একটা পয়সাও পেলে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল সুরপতি-বাবুর কথা। সুরপতি তাকে ভালবাসেন। হয়ত বা এই বিপদের দিনে তাকে তিনি সাহায্য করতে পারেন।

শঙ্কর সেইদিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলে, রাস্তা দিয়ে একটা মোটর-বাইক আসছে। মোটর-বাইকের ওপর বসে আছে সাহেবী পোশাক পরে এক যুবক। শঙ্কর দূরে থেকে দেখেই তাকে চিনতে পারলে। এই সেই তার সহপাঠী নরেন। বোসবাগান ক্লাবের সামনে নরেনের মা তাকে চরম অপমান করেছিল, সেকথা সে সারা জীবনে ভুলবে না।

শঙ্কর ডাকলে, "নরেন।"

নরেনও চিনতে পেরেছিল শঙ্করকে। বোধকরি তার ইচ্ছে ছিল পালিয়ে যাবার। মোটর-বাইকটাকে একটু পাশ কাটিয়ে অনায়াসে পালিয়ে যেতেও সে পারত, কিন্তু কী জানি কেন, পালিয়ে সে গেল না। মোটর-বাইকটা থামিয়ে বললে, "হ্যালো শঙ্কর, কোথায় ছিলি রে এতদিন?"

"আমার কি আর থাকবার কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? এখান-ওখান করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

নরেন বললে, "আমার বিয়ের সময় নেমন্তন্নর চিঠি নিয়ে তোকে কত খোঁজা-খুঁজি করলাম, কোথাও পেলাম না।"

"বিয়ে করেছিস?"

"হ্যাঁ ভাই করেছি। মা ছাড়লে না।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "যাচ্ছিস কোথায়?"

নরেন বললে, "রেসে।"

শঙ্কর বললে, "ভাল।"

বলেই সে মোটর-বাইকটার পিছনের সীটে বসে পড়ল। বললে, "চল, আমাকে একটু পৌঁছে দিবি একটা জায়গায়।"

নরেন বললে, "আমার দেরি হয়ে যাবে না?"

"না না, এ আর কতক্ষণ। তুই ত উড়ে চলে যাবি।"

কিন্তু গন্তব্য স্থান কোথাও নেই শঙ্করের। সে শুধু নরেনকে কতক-গুলো কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না বলেই চড়ে বসল তার গাড়িতে। নরেনের ফুটিয়ে-দেওয়া হুলের জ্বালা সে এখনও ভুলতে পারেনি।

ডানদিকের পথটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। শঙ্কর বললে, "ডানদিকে।"

নরেন ডানদিকে গাড়ি ঘোরালে।

শঙ্কর কথা আরম্ভ করলে।

"তুই আমাকে একদিন পাঁচশ টাকা দিয়েছিলি মনে আছে?"

নরেন কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। বললে, "ও-সব পুরনো কথা আবার কেন?"

শঙ্কর বললে, "পুরনো নয় নরেন, সেই পাঁচশ টাকা পাঁচহাজার হয়েছিল তোর মার কাছে। আর তার জন্যে তোর মা নিজে এসে আমাকে যেরকম ভাবে অপমান করে গিয়েছিল, সে অপমানের জ্বালা যে আমি আজও ভুলতে পারিনি নরেন।"

নরেন আমতা আমতা করে বললে, "মেয়েছেলের কথা আবার ধরে। গুলি মারো ও-সব কথায়।"

"গুলি না হয় মারলাম। কিন্তু তুই কেমন করে অত ছোট হলি রে? আমি তোকে ইস্কুল ছাড়িয়েছি, এক্সারসাইজ করাতে গিয়ে আমি তোর পা ভেঙে দিয়েছি—"

হঠাৎ একটা দারুণ ঝাঁকানি লাগল শঙ্করের সর্বাঙ্গে। মনে হল যেন নরেন ইচ্ছে করেই বাইকটাকে কাঁপিয়ে দিলে। আর-একটু হলে শঙ্কর ছিটকে পড়ে যেত রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে। কিন্তু শঙ্করকে ফেলে দেওয়া অত সহজ নয়।

শঙ্কর দুহাত দিয়ে জাপটে ধরলে নরেনকে।

এই ধরতে গিয়েই হল বিপদ। কী একটা মোটা জিনিস হাতে ঠেকতেই শঙ্কর তাকিয়ে দেখলে চামড়ার একটা মোটা মনি-ব্যাগ রয়েছে নরেনের কোটের পকেটে। চট করে শঙ্কর সেটা তুলে নিলে।

নরেন চিৎকার করে উঠল, "আহা-হা, ওটা তুললি কেন?"

"পড়ে যেত যে।"

"না, পড়ত না। দে।"

গাড়িটা থামিয়ে নরেন হাত বাড়ালে।

"দাঁড়া দাঁড়া, দিচ্ছি।"

হাতটা সরিয়ে নিয়ে শঙ্কর তখন মনি-ব্যাগটা খুলে ফেলেছে। এক গোছা একশ টাকার নোট। দশ-পাঁচ টাকার নোট রয়েছে মাত্র কয়েকখানা।

"এত টাকা কী করবি? সব ঘোড়ার পেছনে নষ্ট করবি?"

নরেন বললে, "ঘোড়ার মর্ম তুই বুঝবি না। দে।"

নরেন একরকম জোর করেই কেড়ে নিতে চাইলে মনিব্যাগটা।

কিন্তু শঙ্করের হাত থেকে কোনও জিনিস কেড়ে নেওয়া অত সহজ নয়। নোটের তাড়া থেকে চট্ করে পাঁচখানা একশ টাকার নোট বের করে নিয়ে মনিব্যাগটা নরেনের গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শঙ্কর বললে, "পাঁচশ দিয়েছিলি, আরও পাঁচশ নিলাম। এক হাজার হল। তোর মা বলে-ছিল তুই নাকি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিস। কাজেই তোর কাছ থেকে আরও চার হাজার টাকা পাওনা রইল আমার।"

"না না, এ-টাকা থেকে একটা পয়সা দিতে পারব না।"

"ভাববি, ঘোড়ার পেছনে ঢেলে দিয়েছিস।"

শঙ্কর নামতে যাচ্ছিল গাড়ি থেকে। শঙ্করের মুখের ওপর ঝট করে বেমক্কা একটা ঘুঁষি চালিয়ে দিলে নরেন।

অতর্কিতে ঘুঁষিটা বেশ জোরেই লাগল শঙ্করের চোয়ালে।

শঙ্কর তখন রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। বললে, "ওতে আমার কিছু হবে না নরেন। এই বিদ্যেটাই তোকে আমি শেখাতে চেয়ে-ছিলাম, তুই শিখলি না।"

নরেন কিন্তু সে কথায় কান দিলে না। গাড়ির স্ট্যান্ডটা পা দিয়ে নামিয়ে, বেড়াল যেমন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি করে নরেন ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করের উপর। গায়ের জোরে শঙ্করের সংগে সে পেরে উঠবে না তা জানে, তাই ভেবেছিল, নখ দিয়ে আঁচড়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে শঙ্করকে সে নাস্তানাবুদ করে নোটগুলো কেড়ে নেবে। কিন্তু সে-সুযোগ শঙ্কর তাকে

দিলে না। প্রথমে হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, বললে, "তুই ত এরকম ছিলি না নরেন, এরকম হলি কেমন করে?"

"চিরকাল বোকা থাকব নাকি? দে, আমার টাকা ফিরিয়ে দে।"

এই বলে সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে শঙ্করের জামা ধরে টানাটানি করতে লাগল।

শঙ্কর বললে, "এরকম করিস না নরেন, রেসে তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে, যা।"

শঙ্কর চলে যাচ্ছিল, রাস্তা থেকে ভাঙা একটা ইঁট তুলে নিয়ে নরেন প্রাণপণে ছুঁড়ে মারলে শঙ্করের মাথা লক্ষ্য করে। মাথায় না লেগে ইঁটটা গিয়ে লাগল শঙ্করের পিঠে। খুব জোর লাগল ইঁটটা। শঙ্কর আর চুপ করে থাকতে পারলে না। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে নরেনের মুখের উপর চালিয়ে দিলে এক ঘুঁষি। নরেন টাল সামলাতে না পেরে উল্টে গিয়ে পড়ল তার বাইকের উপর। মাথা তুলে যখন সে উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল, তার ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে। একটা দাঁত গেছে নড়ে। রক্ত আর থামে না কিছুতেই।

রুমাল দিয়ে মুখখানা চেপে ধরে নরেন চিৎকার করতে লাগল। অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল শঙ্করকে।

রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেল।

নরেন বললে, "তোমরা সাক্ষী রইলে। আমি নালিশ করব ওর নামে।"

এই বলে একটা কাগজ আর কলম নিয়ে সে এগিয়ে গেল তাদের কাছে। বললে, "তোমাদের নাম আর ঠিকানা দাও। ও আমাকে মেরে আমার টাকা কেড়ে নিয়ে চলে গেল।"

নাম-ঠিকানা কিন্তু কেউ দিতে চাইলে না। সবাই ধীরে ধীরে সরে পড়ল। একটা লোক শুধু থানাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "চলে যান সোজা। ওই যে দেখছেন—ওইটেই ঝিলপাড়া থানা।"

থানার দারোগা নরেনকে খাতির করলেন খুব। পরনে সুট আর মোটরবাইক দেখে তাঁর ডায়রিটা প্রথমেই তিনি লিখতে বসলেন। তারপর যখন শুনলেন, যে-ছোকরা তার টাকা কেড়ে নিয়ে চলে গেছে তার নাম শঙ্কর, আর তার চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ আর জোয়ান, তখন যেন খাতিরটা তার একটুখানি বেড়ে গেল। এ সেই শক্তিমন্দিরের শঙ্কর না হয়ে যায় না।

শঙ্করকে যেদিন তিনি মুচলেকা-বণ্ডে সই করাতে চেয়েছিলেন, সেদিন তাঁকে সে অপমান করে চলে গিয়েছিল। কিছুতেই তাকে তিনি সই করাতে পারেননি। সেইদিন থেকে দুর্বিনীত এই ছোকরাটির উপর কেমন যেন একটা বিজাতীয় আক্রোশ তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছিল। আজ যেন সেই নিষ্ফল আক্রোশ চরিতার্থ করবার একটা পথ খুঁজে পেলেন তিনি।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তার ঠিকানা?"

নরেন এইবার বিপদে পড়ল। তার ঠিকানা ত সে জানে না।

বোসবাগান ক্লাবেই সে তাকে দেখেছে, আর তারই কাছাকাছি কোথায় যেন তার বাড়ি, এইটুকু সে জানে।

দারোগাবাবুও একটু চিন্তিত হলেন। অবিলম্বে তার ঠিকানা জানা একান্ত প্রয়োজন।

থানার জিপ গাড়িটা দোরেই দাঁড়িয়েছিল। দুজন কনেষ্টবলকে আসতে বললেন হাতকড়া নিয়ে। নিজের ইউনিফর্মে রিভলবারটা বেঁধে নিলেন। নরেনকে বললেন, "আপনি আসুন আপনার মোটরবাইকে আমাদের পিছু পিছু।"

প্রথমেই গেলেন শক্তি-মন্দিরে। জন-দুই-তিন ছেলে মাত্র ব্যায়াম করছিল। শ্রীহরিও নেই, শঙ্করও নেই। জিজ্ঞাসা করে জানলেন, শঙ্কর অনেকদিন থেকেই এখানে আসছে না। শ্রীহরিও সবদিন আসে না।

দিনটা ছিল শনিবার। ছোঁড়াটাকে আজ ধরতে পারলে খুব ভাল হত। শনি, রবি দুটো দিন থানার হাজতে পুরে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দিতে পারতেন তিনি। তারপর সোমবার তাকে আদালতে হাজির করলেই চলত।

যাই হক, দারোগাবাবু বললেন, "সোমবার ওর নামে ওয়ারেন্ট বের করে তাকে একদিন আমি ধরে ঠিক ফেলবই। এখন চলুন ত দেখি হাসপাতালে, আপনার নামে একটা ইনজুরি রিপোর্ট বের করে নিয়ে আসি।"

এই বলে নরেনকে নিয়ে চলে তিনি যাচ্ছিলেন, এমন সময় দেখলেন শ্রীহরি আসছে হেলতে-দুলতে। দারোগাবাবুকে দেখে ভয়ে তার মাথাটা একবার ঘুরে গেল। তবু সে জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে হাতদুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, "নমস্কার দারোগাবাবু, কী খবর?"

"এমনিই এলাম একবার। ভাবলাম দেখা করে যাই।"

শ্রীহরি বললে, "তাই বলুন। আপনাকে দেখে ত প্রাণ আমার উড়ে গিয়েছিল।"

দারোগাবাবু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সেই বন্ধুটিকে দেখছি না?"

"শঙ্করদার কথা বলছেন? সে ত আর আসেই না। আজ যে তার বিয়ের বউভাত।"

দারোগাবাবু বললেন, "বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে যাবে না?"

শ্রীহরি বললে, "যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়িতে একটা খুব জরুরী কাজ পড়ে গেল। যাওয়া বোধহয় হবে না।"

"আজকাল সে থাকে কোথায়?"

শ্রীহরি তার পকেটে হাত দিয়ে ছোট, একটুকরো কাগজ বের করে বললে, "এই যে, কাল ওর ঠিকানাটা আমি টুকে রেখেছিলাম।"

কাগজের টুকরোটা যেন শ্রীহরির হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন দারোগাবাবু। পড়ে দেখলেন ঠিকানাটা। তারপর কাগজখানি আবার শ্রীহরির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "চলি। আমার আবার কাজ আছে।"

বাড়িওলা টাকা পেয়ে খুশি হয়ে চলে গেছে।

জন-পঞ্চাশেক লোকের খাবার আয়োজন সবই করে দিয়েছে শঙ্কর, অথচ নিজের বন্ধু-বান্ধব কাউকে সে নিমন্ত্রণ করেনি।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "এ-সব কে খাবে তাহলে?"

শঙ্কর বললে, "তুমি যাদের নিমন্ত্রণ করেছ তাদের বেশ ভাল করে খাইয়ে দাও।"

বিমলা ভাবলে এটা তার রাগের কথা। বললে, "বিয়ের পর ছেলে পর হয়ে যায় জানি। কিন্তু আমার এমনি পোড়া কপাল যে, ছেলে পর হল বিয়ের দিন থেকেই।"

কথাটার জবাব দিলে না শঙ্কর।

বউয়ের উপর খুশি হতে পারেনি বিমলা। সেকথা সে জানিয়েছে শঙ্করকে। কিন্তু একমাত্র ছেলেই যদি তার পর হয়ে যায়, গরিব বলে বউমা যদি তাকে অগ্রাহ্য করে, তাহলে কী প্রয়োজন ছিল তার ছেলের বিয়ে দেবার? মনের ভিতর কথাটাকে এতক্ষণ সে চেপে রেখে গুমরে গুমরে মরছিল, কিন্তু আর চেপে রাখতে পারলে না। ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "রূপের দেমাগ, তার ওপর লেখাপড়া জানার অহঙ্কার। ও আমাকে দাসী-বাঁদী ভাববে তাতে আর আশ্চর্য্যি কী!"

শঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল, "মা তুমি চুপ কর। তুমি ভুল বুঝছ।"

বিমলা বললে, "না। মা কখনও ভুল বোঝে না। আমি ঠিকই বুঝেছি। তোর পেটে যদি বিদ্যে থাকত, মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকত, তাহলে ও-মেয়েকে বিয়ে তুই কখনও করতিস না।"

ইন্দ্রাণী আর চুপ করে থাকতে পারলে না।

"তা বেশ ত। গুণ্ডা ছেলেকে হুকুম করলেই ত হয়। ঘাড়ে ধরে বের করে দিক। চলে যাচ্ছি।"

"কী বললে? আমার ছেলে গুণ্ডা?"

আগুন জ্বলল। দু'জনের মনের ঝাল দু'জনেই মেটাতে লাগল প্রাণপণে।

পিছন ফিরে দেখলে ইন্দ্রাণী দেখছে দাঁড়িয়ে

বিপদে পড়ল শঙ্কর। না পারে বউকে থামাতে, না পারে মাকে।

ঝগড়া যখন তাদের চরমে উঠেছে, খুব জোরে জোরে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

সমর ছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকল ঝিলপাড়া থানার দারোগাবাবু। সঙ্গে একজন কনেস্টবল। লাল রক্তে-রাঙা একটা রুমাল মুখে চাপা দিয়ে দোরের কাছে উঁকি মারছে নরেন।

বুঝতে কিছু বাকী রইলো না শঙ্করের।

কিন্তু আজ?

শঙ্কর কী করবে কিছুই বুঝতে পারলে না। এই কটা লোকের হাত ছাড়িয়ে অনায়াসে সে পালিয়ে যেতে পারত, কিন্তু দারোগাবাবুর কোমরে চামড়ার বেল্টের দিকে তাকিয়ে তার সাহস হল না। বিশ্রী একটা কেলেংকারি হয়ে যাবে এক্ষুনি। গুলি অবশ্য তিনি চালাতে পারবেন না। গুলি চালাবার মত অপরাধ সে করেনি। আর করলেও তার প্রমাণ কিছু নেই। কিন্তু ফাঁকা একটা আওয়াজ করলেও লোক জড় হয়ে যাবে। অপমানের বাকী কিছু থাকবে না।

পিছন ফিরে দেখলে ইন্দ্রাণী দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওদিকে বারান্দার পাশে মা দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর এগিয়ে যাচ্ছিল দারোগাবাবুর দিকে।

"নমস্কার! কী খবর?"

দারোগাবাবু এ-সুযোগ পরিত্যাগ করলেন না। কনেস্টবলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "লাগাও হাতকড়া!"

হাতকড়া!

চমকে উঠল শঙ্কর। মনে পড়ল সেই মুচলেকা সই করবার কথা। দারোগাবাবুর চোখে দেখলে সেই হিংস্র আক্রোশ। বললে, "হাতকড়া লাগাবার মত কী করেছি আমি? চলুন, যাচ্ছি।"

কিন্তু কনেস্টবল তখন হুকুম পেয়ে গিয়েছে। সে শুনবে কেন? হাতকড়া নিয়ে সে এগিয়ে এল শঙ্করের দিকে। শঙ্কর বললে, "খবরদার!"

তবু সে এগিয়ে আসছে দেখে শঙ্কর চালিয়ে দিলে এক ঘুঁষি। লোকটা বাপ্‌স বলে পেটে হাত দিয়ে পিছিয়ে গেল। দারোগাবাবু নিজে এইবার এগিয়ে এলেন রিভলবার হাতে নিয়ে। বললেন, পালিয়ো না বলছি। মরে যাবে।"

শঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ল। কনেস্টবলটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে লাগালে হাতকড়া।

বিমলা তখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, "হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কী করেছে শঙ্কর?"

"পরে বুঝতে পারবেন।"

দারোগাবাবু শঙ্করকে নিয়ে চলে গেলেন শঙ্করের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

বিমলাও দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে।

বিপদের সময় রাগ-অভিমান করা বৃথা। বউমা লেখাপড়াজানা মেয়ে। এ সময় কী করা উচিত, সে-ই ভাল বুঝবে। বিমলা বোধকরি তাকেই জিজ্ঞাসা করবার জন্য ডাকলে, "বউমা!"

বউমা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বিমলা

তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ-সময় কী করা উচিত—"

ইন্দ্রাণী কথাটা তাকে শেষও করতে দিলে না, জবাব দেবার জন্যে দাঁড়ালও না, দোরের দিকে যেতে যেতে শুধু বলে গেল, "গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

বিমলা দেখলে তার সুটকেসটা হাতে নিয়ে সমর তার পিছু পিছু চলেছে।

বুঝতে কিছু বাকী রইল না বিমলার।

"তুমি কি চলে যাচ্ছ বউমা?"

কথাটার জবাব দিলে না ইন্দ্রাণী। ফিরেও তাকালে না।

"বউমা! বউমা!"

বলতে বলতে বিমলা তার পিছু-পিছু সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। "ছি-ছি বিয়ের কনে তুমি এরকম করে চলে যেয়ো না বউমা, আমি তোমাকে যা বলেছি, সব ফিরিয়ে নিচ্ছি বউমা। আমি তোমার দুটি হাতে ধরে বলছি, শঙ্কর ফিরে আসবে।"

দোরের বাইরে বিমলা রাস্তায় এসে চেঁচিয়ে ডাকলে, "বউমা!"

বউমা তার ভাইকে নিয়ে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমলার দুচোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এল।

থানার দারোগাবাবু যা ভেবেছিলেন তাই করলেন। শঙ্করকে থানার হাজতে পুরে দিয়ে নির্যাতনের বাকী কিছু রাখলেন না। শনিবার, রবিবার—দুটি রাত্রি আর একটি দিনের ইতিহাস শঙ্করের জীবনে চির-স্মরণীয় হয়ে রইল।

আদালতে গিয়ে কিন্তু সব-কিছু গেল গোলমাল হয়ে। নিজেকে নিতান্ত অসহায় বোধ করতে লাগল শঙ্কর। তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই, জামিন হবার মানুষ নেই, একটা উকিল নেই, মোক্তার নেই, বিচার দেখবার জন্য আছে শুধু কৌতূহলী জনতা।

ফরিয়াদী নরেনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দারোগাবাবু মামলাটা সাজিয়ে দিয়েছিলেন বেশ ভাল করে। মোটরবাইকে চড়ে নরেন যাচ্ছিল রেসে। পকেটে ছিল বারোখানা একশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা-পয়সা। পথের ওপর হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে শঙ্কর রাহাজানি করে। পকেট থেকে জোর করে মনিব্যাগটা সে তুলে নেয়। তারপর দুজনে মারামারি। শঙ্কর মনিব্যাগ খুলে সাতখানা নোট বের করে নিয়ে মনি-ব্যাগটা ছুঁড়ে দেয় তার গায়ের উপর, আর ঘুঁষি মেরে তার একটা দাঁত ভেঙে দেয়। শঙ্করের গায়ের জোরে নরেন পেরে ওঠে না। তখন সে থানায় গিয়ে ডায়রি লেখায়। এই রাহাজানির প্রত্যক্ষদর্শী দুজন সাক্ষীও ছিল

দারোগাবাবু টাকাগুলো উদ্ধার করবার জন্যে নরেনের সঙ্গে শঙ্করের বাড়িতে যান। পুলিস দেখে শঙ্কর পালাতে চায়। একজন কনেস্টবল তাকে ধরতে গেলে শঙ্কর তার পেটে ঘুঁষি মারে। তারপর অনেক কষ্টে অনেক ছোটাছুটি করে তাকে ধরতে হয়। তার পকেটে পাওয়া যায় দুশ তেইশ টাকা নগদ। আর দেড়শ টাকার একটি বাড়ি-ভাড়ার রসিদ।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী দুজন প্রথমেই দিলে সব বানচাল করে।

একজন বললে, নরেনের পকেট থেকে শঙ্কর মনিব্যাগ তুলে নিয়েছিল। একজন বললে, নোটগুলো তুলে নিয়েছিল। একজন বললে, শঙ্কর লাথি মেরে নরেনকে উল্টে ফেলে দিলে। একজন বললে, ঘুষি মেরে দাঁতটা ভেঙে দিলে। সেই ভাঙা দাঁতটা নরেনকে সে নাকি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দেখেছে।

দারোগাবাবু বললেন, শঙ্কর টাকাগুলো নিয়ে গিয়েই বাড়িভাড়া দিয়েছে দেড়শ টাকা। ওই রসিদই তার প্রমাণ। বাকী টাকা কী করেছে ওই জানে। ওর কাছে পাওয়া গেছে দুশ' তেইশ টাকা। একটা পয়সাও সে রোজগার করে না। এত টাকা পেলে কোথায়?

বিচারক বারবার তাকাচ্ছিলেন শঙ্করের দিকে। প্রিয়দর্শন এক স্বাস্থ্যবান যুবক। একটা উকিল পর্যন্ত সে দিতে পারেনি। সত্যই সে দরিদ্র। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কিছু বলবার আছে?"

শঙ্কর বললে, "আমি আর আমার বিধবা মা থাকি একটা বস্তিতে দশ টাকা ভাড়ায় দুখানা ঘর নিয়ে। গত বৃহস্পতিবার সাতাশ নম্বর নিবারণ হালদার লেন, কালী-ঘাটে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের জন্যে একটি বাড়িভাড়া নিতে চেয়েছিলাম সাত-দিনের জন্যে। এই বাড়িটি পেয়েছিলাম। বাড়িওলা বলেছিলেন সাতদিনের জন্যে দেড়শ টাকা ভাড়া দিতে হবে। বলেছিলাম, বিয়েতে আমি এক হাজার টাকা নগদ পাব। সেই টাকা পেলে ভাড়া দেব। সেই টাকা পেয়ে শুক্রবার ভাড়া দিয়েছি। রসিদের তারিখটা একবার দেখুন।"

তারিখটা দেখা গেল, সত্যই শুক্রবারের তারিখ। অথচ ঘটনা ঘটেছে শনিবার।

"নরেনবাবু যে-কথা বলেছেন, সেকথা সত্যি? ও'র পকেট থেকে তুমি মনিব্যাগ তুলে নিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ হুজুর, নিয়েছিলাম।"

শঙ্কর বললে, "একটু আগে থেকে শুনতে হবে হুজুর। ঝিলপাড়ায় আমি আর শ্রীহরি বসাক—আমরা দুজনে একটি ক্লাব তৈরি করেছি। ক্লাবের নাম শক্তিমন্দির। ছেলেরা সেখানে ব্যায়ামচর্চা করে। শক্তি-মন্দিরের আর একটি শাখা আছে। দরিদ্র ভাণ্ডার। কারও বাড়িতে বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন হলে আমরা সেখানে দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য কিছু চাঁদা ভিক্ষা করি। একবার পাড়ায় এক ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। বর আসছে খুব জোর প্রসেশন করে। আমাদের শক্তিমন্দিরের সামনে বরকর্তার মোটরের চাকা গেল পাঞ্চার হয়ে। আমরা সেই সুযোগে তাঁর গাড়ির কাছে গেলাম চাঁদার খাতা নিয়ে। ভদ্রলোক ভারী কৃপণ। একটি পয়সা দেবেন না। তিনিও দেবেন না, আমরাও ছাড়ব না। বরযাত্রীদের ভিতর কে একজন পাশের বাড়ি থেকে লুকিয়ে টেলিফোন করে দেন থানায়। থানা থেকে এই দারোগাবাবু একটা জিপ নিয়ে গিয়ে হাজির। তিনি বললেন, আমি চাঁদা আদায় করে দিচ্ছি। তোমরা গিয়ে বোস আমার ওই জিপে। আমি আর শ্রীহরি গিয়ে বসলাম। উনি কৌশল করে আমাদের দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, মুচলকা-বণ্ডে সই করতে হবে। রাস্তার মাঝে গাড়ি আটকে দলবল নিয়ে গিয়ে বেআইনী গাড়ি আটকেছ, লোক জড়ো করেছ। আমি কিছুতেই সই করতে চাইনি। সই না করে চলে এসেছিলাম। সেই থেকে ও'র রাগ ছিল আমার ওপর।

"নরেন আমার বন্ধু। এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়েছিলাম। দরিদ্রভাণ্ডারের জন্য চাঁদা চেয়েছিলাম। দেয়নি। গত শনিবার ছিল আমার বিয়ের বউভাত। শক্তি-মন্দিরের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে-ছিলাম। ফেরবার পথে দেখলাম মোটর-বাইকে চড়ে নরেন আসছে। হাত তুলে নরেন বলে ডাকতেই গাড়ি থামিয়ে নামল গাড়ি থেকে।। বিয়ের কথা শুনলে, বউ-ভাতের কথা শুনলে। কিন্তু জানি আমি, টাকার কথা শুনলেই সে খেপে যাবে। তাই সবার শেষে বললাম, দরিদ্রভাণ্ডারের চাঁদা দে। শুনেই পালাচ্ছিল, হাতটা চেপে ধরলাম। পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলে নিলাম। কিছুতেই দেবে না। আমিও ছাড়ব না। অতিকষ্টে মনিব্যাগ খুলে দশ-টাকার একটি নোট বের করে নিয়ে মনি-ব্যাগ ওর হাতে দিয়ে ছুটে পালালাম। 'দশ টাকা চাঁদা আমি দেব না। তোর দরিদ্র-ভাণ্ডার না কচু!' এইসব বলতে বলতে সেও আমার পিছু পিছু ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। আমি হাসতে হাসতে বাড়ি চলে এলাম।

"যার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দোকানের টাকাটা দিতে যাচ্ছিলাম, দোরের কড়া নড়ে উঠতেই আমার শালা গিয়ে দরজা খুলে দিলে। দেখি দারোগাবাবু, দুজন কনস্টেবল, [illegible] [illegible] নিয়ে গিয়ে হাজির। কেন এলেন কিছুই বুঝতে

পারিনি, নমস্কার করে কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী খবর? চট করে উনি একজন কনেস্টবলকে হুকুম করলেন, লাগাও হাতকড়া। অবাক হয়ে গেলাম। কেন,, কী করেছি আমি, কোনও কথারই তিনি জবাব দিলেন না। মা ছুটে এল। মা জিজ্ঞাসা করলে। উনি শুধু বললেন, পরে বুঝতে পারবেন। তারপর আমার মা, আমার স্ত্রী ছোট শালা—সবার চোখের সামনে আমাকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে এসে জিপে তুললেন। জিপের কাছে দেখলাম, মোটরবাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে নরেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি তোর কাজ নাকি? নরেন তাড়াতাড়ি বাইকে চড়ে চলে গেল। তারপর থানার হাজতে নিয়ে গিয়ে দুটি দিন ধরে আমার ওপর অত্যাচারের আর কিছু বাকী রাখেননি দারোগাবাবু।"

শঙ্কর থামল।

বিচারক কী যেন লিখছিলেন।

শঙ্কর বললে, "আমি আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব নরেনকে।"

বিচারক বললেন, "কর।"

শঙ্কর বললে, "নরেনের যে-দাঁতটা আমি ভেঙে দিয়েছি, ওর সাক্ষী যেটা রাস্তায় ফেলে দিতে দেখেছে, ও একবার মুখটা হাঁ করে সেই জায়গাটা দেখাক।"

অনেকে হো হো করে' হেসে উঠল।

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "দাঁত ভাঙেনি, তবে নড়ে গেছে।"

শঙ্কর বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল শঙ্কর।

যাবার সময় মাকে সে কিছু বলে যেতে পারেনি। ইন্দ্রাণী কী ভাবছে কে জানে।

বাড়ির সুমুখে এসে দেখে, সদর দরজা খোলা। বাড়ির জিনিসপত্র কোথাও কিছু নেই। ওরা তাহলে এ-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বস্তির বাড়িতে চলে গিয়েছে। শঙ্কর ছুটল বস্তির দিকে।

বাড়ির সুমুখে এসে দেখে, লোকে লোকারণ্য।

এত লোক কেন? ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল শঙ্কর।

ঘরের সুমুখে গিয়ে দেখে ফেরিওলা সেই বুড়ো রামু হাতে একটি ছোট লাঠি নিয়ে বসে আছে চৌকাঠের পাশে।

"কী হয়েছে রামু?"

"এতক্ষণে এলে? যা হবার তাই হয়েছে। ভেতরে গিয়ে দ্যাখো।"

বুড়ো তার হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলে।

শঙ্কর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গিয়ে যা দেখলে, সে-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। পরনের কাপড়টার আষ্টেপৃষ্ঠে গিঁট দিয়েছে বিমলা—যাতে না খুলে যায়। তারপর আর-একখানা কাপড় পাক দিয়ে দিয়ে দড়ির মত করে চালার মাথার উপরে মোটা একটা বাঁশের সঙ্গে নিজের গলায় ফাঁসি লটকে ঝুলে পড়েছে সে। পায়ের নীচে জলের ড্রামটা কাত হয়ে পড়ে আছে।

শঙ্কর সেইদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। চিৎকার করে' উঠল, "মা।"

তারপর সেইখানেই আছাড় খেয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বাইরে লোকজনের ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "এখন আর কাঁদলে কী হবে বাবা? তোমার মতন ছেলের হাত থেকে মরে বেঁচেছে হতভাগী।"

রামু উঠে এল শঙ্করের কাছে।

"পুলিসে খবর দিতে হবে যে দাদাবাবু।"

আবার পুলিস।

শঙ্কর শুনেও শুনলে না কথাটা। তেমনি পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

খানিক বাদেই বাইরে কিসের যেন গোল-মাল উঠল। রামু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, দুজন কনেস্টবল লোক হাটাচ্ছে। পুলিস খবর পেয়ে গিয়েছে তাহলে।

ঝিলপাড়া থানার সেই জিপগাড়িখানা এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামলেন সেই দারোগাবাবু।

মনের অবস্থা তাঁর ভাল ছিল না। আদালত থেকে রীতিমত অপমানিত হয়ে এসেছেন তিনি। অপমানিত হয়েছেন যার জন্য, সেই তাকেই যে আবার এই অবস্থায় দেখবেন তা তিনি ভাবতেও পারেননি।

শঙ্করের মা আত্মহত্যা করেছে, আর শঙ্কর কাঁদছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ভারী জুতোর আওয়াজ শুনে শঙ্কর মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলে। সেও ভাবতে পারেনি যে সেই দারোগাবাবুই এসে দাঁড়াবেন তার মাথার কাছে। হাত বাড়িয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল শঙ্কর।

"কী হল দারোগাবাবু, কী হল দেখুন। আমার মা। আমার মা।"

কী বিচিত্র মানুষের মন। দুর্ধর্ষ এই থানা-অফিসারটির পাষাণ বদনাম চিরকালের। তাঁরও ছোট ছোট চোখ দুটো দেখা গেল চিক চিক করছে। শঙ্করের শিয়রের কাছে উবু হয়ে তিনি বসে পড়লেন; তারপর হাত বাড়িয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন, "শঙ্কর!"

শঙ্কর চমকে উঠল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। দেখলে, দারোগাবাবুর চোখে জল। বিশ্বাস করতে পারছিল না শঙ্কর। উঠে বসল।

দারোগাবাবু বললেন, "কেঁদো না শঙ্কর। চুপ কর। আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

অপ্রত্যাশিত এই সহানুভূতি।

শঙ্কর বড় বেশী বিচলিত হয়ে উঠল। আবার সে ভেঙে পড়ল কান্নায়। এত কান্না সে কখনও কাঁদেনি।

কয়েকদিন পরে, একদিন দেখা গেল, অশৌচ অবস্থায় শঙ্কর গিয়ে দাঁড়িয়েছে— কালীঘাটে তার শ্বশুরবাড়ির দরজায়।

কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে দরজা খুলে দিলে সমর। শঙ্করকে দেখেই সমর তাড়া-তাড়ি ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "মা, জামাইবাবু এসেছে।"

শঙ্কর তার পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির উঠোনে।

ইন্দ্রাণী বোধ করি ঠিক সেই সময় তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। সমরের কথা শুনে আবার ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর। ঢুকেই দোরের খিলটা দিলে বন্ধ করে। বড় আরশি-দেওয়া একটা আলমারি ছিল ঘরের ভিতর। সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী। সিঁথির সিঁদুরটা মোছবার চেষ্টা করলে কাপড়ের আঁচলটা তুলে নিয়ে। কিন্তু কী জানি কেন, হাতটা তার থর থর করে কেঁপে উঠল। পারলে না মুছতে। হঠাৎ তার কানে এল—শঙ্কর বোধ করি বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকছে, "মা! মা!"

মা বোধ হয় সমরের কথাটা শুনতে পাননি। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"কে?"

শঙ্করকে দেখবেন তা তিনি আশা করেননি। বললেন, "তোমার চিঠি আমি পেয়েছি।"

তারপর কী বলবেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন না। খানিক চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোমার মত ছেলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে এছাড়া ত আর কোনও উপায় ছিল না তোমার মায়ের। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কিছু বলবে?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না।"

বলেই সে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে-ছিল, আবার কী ভেবে ফিরে দাঁড়াল। বললে, "আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?"

মা বললে, "দেখা করে আর কী হবে বল! ইন্দ্রাণী!"

দোরের খিলটা ইন্দ্রাণী খুলে দিলে। ঠক করে একটা আওয়াজ হল। মা বললে, ওই ঘরে আছে।

ইন্দ্রাণী কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। খোলা একটা জানলার কাছে গিয়ে শিক ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কর দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। "তোমাকে আমি নিতে এসেছি ইন্দ্রাণী।"

ইন্দ্রাণী চুপ করে রইল।

"তুমি কি যাবে না?"

"না।"

শঙ্কর আবার বললে, "কখনও যাবে না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না।"

"আমার সঙ্গে তোমার—"

কথাটা শঙ্কর শেষ করতে পারলে না। অন্য কথা বললে। বললে, "তোমাকে নিয়ে আমি অন্য জায়গায় চলে যাব। তোমাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করব।"

ইন্দ্রাণী ম্লান একটু হাসলে।

"বিশ্বাস করছ না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না।"

শঙ্কর একটু কাছে এগিয়ে এল। বললে, "আমি ভাল হব ইন্দ্রাণী। তুমি বিশ্বাস কর।"

ইন্দ্রাণী কোনও কথাই বললে না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কর বললে, "আমি যদি ভাল হই, আমাকে তোমার স্বামী বলে পরিচয় দিতে যদি লজ্জা না হয়, বল, তখন তুমি আসবে?"

কী জবাব দেবে ইন্দ্রাণী?

বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ যাব। কিন্তু কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। বললে, "এখন কিছু বলতে পারব না। আপনি যান।"

'তুমি' না বলে 'আপনি' বললে ইন্দ্রাণী।

শঙ্কর আর দাঁড়াল না। বললে, "আমি চললাম।"

যাবার সময় শুধু বলে গেল, "কিন্তু মনে থাকে যেন ইন্দ্রাণী, আমি তোমার স্বামী।"

ইন্দ্রাণী জবাব দিলে, "থাক, আর স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।"

কথাটা শুনতে পেলে শঙ্কর।

কানে যেন তার বিষ ঢেলে দিলে।

সেই ইন্দ্রাণী!

একটি রাত্রির সেই নিবিড় পরিচয়। সেই দুটি দেহ-মন-প্রাণের ঐকান্তিক মিলনের পরমক্ষণ, সেই দুটি উন্মুখ হৃদয়ের দান-প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি—সবই কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল?

স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।

শহরের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে শঙ্করের কানে ক্রমাগত বাজতে লাগল ইন্দ্রাণীর মুখের সেই শেষ কথা কটি।

স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।

২

শঙ্কর একটা রেল-স্টেশনে গিয়ে নামল ট্রেন থেকে।

একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলে, "ময়নাবুনি কোন দিকে যাব?"

লোকটি বললে, "আসুন আমার সঙ্গে।"

শঙ্করের ন্যাড়া মাথায় তখন ছোট ছোট চুল গজিয়েছে। মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

মাঠের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ। লোকটির সঙ্গে শঙ্কর চলেছে ত চলেইছে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না!

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আর কতদূর?"

"আপনি নতুন আসছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ ভাই।"

লোকটি বললে, "এখনও ক্রোশ-দেড়েক পথ।"

বলেই সে বাঁ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে: "ওই যে জলা দেখছেন, ওই জলাটা পেরিয়ে, ওই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, ওইটে ময়নাবুনি। আমি এইদিকে যাব। আপনি চলে যান।"

এই বলে সঙ্গের লোকটি ডান দিকে রাস্তা ভেঙে চলে গেল।

শঙ্কর একা।

চলতে চলতে কিছুদূর গিয়েই দেখলে, রাস্তা ফুরিয়ে গিয়েছে। সুমুখে ধানের মাঠ আর জলা। সেই জলার ওপর দিয়েই দেখলে লোক চলছে। গরুর গাড়িও যাচ্ছে একটা।

সেই জলার ধারে দাঁড়িয়ে শঙ্কর ইতস্তত করছে। ভাবছে, নামবে কি নামবে না। একটি লোক—সেও বোধ হয় যাবে ময়নাবুনি গ্রামে—এসে দাঁড়াল তার পাশে। বললে, "ভাবছেন কী, পায়ের চটি জুতো খুলে হাতে নিন, আর এক হাত দিয়ে হাঁটুর কাপড়টা তুলুন একটুখানি, তারপর আসুন আমার পিছু পিছু।"

লোকটি নেমে পড়ল জলের ওপর। জল বেশী নয়। হাঁটুর নীচে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "ময়নাবুনি যাবার অন্য পথ নেই?"

"আজ্ঞে না। এইটেই পথ।"

শঙ্কর তার সঙ্গে জলাটা পেরিয়ে গেল। জলা থেকে উঠেই দেখলে কাদা। দু-একজন গ্রামের লোক কাদা বাঁচিয়ে চলেছে কোন-রকমে, কিন্তু একটা গরুর গাড়ি দেখলে কাদায় পড়ে আর উঠতে পারছে না কিছুতেই। কাদায় চাকা গিয়েছে ডুবে, গরু দুটো প্রাণপণে চেষ্টা করছে টেনে তোলবার, কিন্তু পারছে না।

গাড়োয়ান গরু দুটোকে মারছে নিষ্ঠুর-ভাবে, চাকায় হাত লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করছে, কিন্তু এতটুকু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গাড়োয়ান আর তার সঙ্গী—দুজনেই হায়রান হয়ে গিয়েছে।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে ব্যাপারটা। যে-লোকটি তার সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল, সে একবার জিজ্ঞাসা করলে, "যাবেন না?"

শঙ্কর বললে, "না। আপনি যান।"

লোকটি চলে গেল।

শঙ্কর দেখলে, নিরীহ গরু দুটো শুধু শুধু মার খাচ্ছে। বললে, "ওদের মারছ কেন অমন করে?"

গাড়োয়ান একবার তাকাল শঙ্করের দিকে। একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসলে শুধু।

যে-লোকটি চাকা মারছিল সে বললে, "শহর থেকে আসছেন বুঝি? কোথায় যাবেন?"

শঙ্কর বললে, "ময়নাবুনি।"

"এই ত ময়নাবুনি। যান। দাঁড়িয়ে কেন?"

গরুর পিঠে বাড়ি পড়ল। —"কোনও কাজের নয়। বসে বসে খাচ্ছে শুধু। হে হে হে হে—আর-একটু, আর-একটু। নাঃ, পারলে না।"

চাকাটা উঠেছিল একটুখানি। আবার কাদার ভিতর পড়ে গেল।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে লোকটার। হাত দিয়ে মুছলে ঘামটা। তারপর আবার শঙ্করের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, "এই কাজ আমরা হরদম করছি বাবু, আমরা জানি কত ধানে কত চাল।"

শঙ্কর তখন তার শার্টের একটা হাত গুটচ্ছে। বললে, "হাত লাগাব নাকি?"

গাড়োয়ান হেসে বললে, "পারবেন কেন বাবু?"

"দেখতে দোষ কী?" বলেই শঙ্কর তার জামার আস্তিন গুটলে, পরনের কাপড়টা আর-একটু তুললে, তারপর নেমে পড়ল কাদায়।

কিন্তু চাকায় শুধু হাত সে লাগালে না, একটা কাঁধও লাগালে গাড়ির মোটা বাঁশটায়।

কিন্তু একী? গাড়োয়ান দুজনেই কাজ বন্ধ করে দিয়ে দাঁত বের করে মজা দেখছে।

শঙ্কর বললে, "দাঁড়িয়ে দেখছ কেন? চালাও গরু দুটো।"

"পারবেন না বাবু, মিছিমিছি হাতে-পায়ে কাদা লাগাচ্ছেন কেন?"

বলতে বলতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা দুজন দু দিকে গরু দুটোকে চালাবার চেষ্টা করলে। —"চল্ ব্যাটা চল্। বাবু যখন বলছেন, ও'র মান রেখে—"

কথাটা শেষ হল না। শঙ্কর তার প্রাণপণ শক্তিতে কাঁধ দিয়ে গাড়িটাকে একটু তুলে ধরে চাকাটা দিলে ঠেলে। গাড়ি উঠে গেল কাদার উপর।

গাড়োয়ান দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শঙ্করের দিকে।

একজন জিজ্ঞাসা করলে, "কার বাড়ি যাবেন বাবু?"

"তারিণী মুখুজ্যের বাড়ি।"

একজন গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আর-একজন জবাব দিলে, "তেনাকে ত পাবেন না বাড়িতে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? কোথায় গেছে?"

"যায় নাই কোথাও। রাখহরি ঘোষালকে হারিয়ে দিয়ে তিনি নতুন 'পেছডেন' হয়েন

কিনা। বারোয়ারী তলায় 'মচ্ছব' লেগে গেছে দেখুন গিয়ে।"

"মচ্ছব? সে আবার কী?"

"মচ্ছব জানেন না? শহরের মানুষ কিনা, জানবেন কেমন করে?"

লোকটি বুঝিয়ে দিলে, "মচ্ছব মানে আনন্দ, ফুর্তি। বাজনা-বাদ্যি বাজছে, গাওনা হচ্ছে, ফুর্তি করছে, খাওয়া-দাওয়া চলছে। গাঁয়ে ঢুকতেই শুনতে পাবেন যান।"

গাঁয়ে ঢুকতেই সত্যি সত্যি শুনতে পেলে শঙ্কর।

একটু এগিয়ে যেতে দেখতেও পেলে।

দেখলে, বিস্তর লোক। বিরাট শোভা-যাত্রা। ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে, শিঙে বাজছে, কাড়া, নাকাড়া, পালক-বসান জয়-ঢাক—কিছুই বাদ যায়নি। এমন-কি কেনেস্তারা টিন পর্যন্ত গলায় ঝুলিয়ে বেমক্কা পিটিয়ে চলেছে কয়েকজন গ্রামের ছোকরা।

গ্রামের পথে পথে তারা নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে এসে দাঁড়িয়েছে ছোট্ট একটি ইঁট বের-করা দোতলা বাড়ির সামনে।

শঙ্কর একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলে, ওই বাড়িটিই রাখহরি ঘোষালের বাড়ি।

লোকগুলো গাইছে, না ছুই করছে। বিশ্রী রকমের একটা বেসুরো কোলাহল উঠছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে শুধু একটা ছড়া। সবাই মিলে সমস্বরে বলছে—

"বোল্ হরি বোল্
রেখো খেলে ঝোল!
হেরে ইল ভুট
এবার লেজ গুটিয়ে ছোট।"
ব্যাটা তল্পি-তল্পা তোল
নয়ত ঢালব মাথায় ঘোল।
বোল্ হরি বোল্॥"

লোকজনের ভিড় ঠেলে শঙ্কর আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। দেখলে, একটা চেয়ারের দু দিকে দুটো লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে তার উপর তারিণী মুখুজ্জেকে বসিয়ে কাঁধে নিয়ে নাচছে। তারিণীর গলায় ফুলের মালা।

তারিণী বললে, "এখানে কেন এলি?"

একজন বললে "রাখহরি দেখুক।"

রাস্তার ধারের দোতলার ঘরটায় রাখহরি তামাক টানছিল গড়গড়ায়। বাইরের গোলমাল, ছড়া-কাটার চমৎকার ভাষা—সবই সে শুনতে পাচ্ছিল সেখান থেকে। গড়গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভিতর। জানলা দিয়ে দেখলে একবার ব্যাপারখানা।

"বাবা!"

'অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল'

ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকালে।

জয়া এসে দাঁড়িয়েছে। রাখহরির মেয়ে। এইটিই তার একমাত্র মেয়ে। এই মেয়েটিই সম্বল। ছেলেপুলে নেই। কিন্তু এই এত বড় মেয়ে—এখনও সিঁথিতে সিঁদুর পড়েনি কেন কে জানে। অথচ বাপের পয়সা আছে।

জয়া বেশ জোয়ান মেয়ে। দু-ভরি সোনার কম একগাছা চুড়ি হয় না—এমনি চওড়া তার হাতের কব্জি। চাঁপা চাঁপা গায়ের রঙ, চোখ দুটি সুন্দর, দাঁতগুলিও দেখতে বেশ, কিন্তু তবু যেন মনে হয় কেমন যেন মন্দ-মন্দ কাঠ-কাঠ। বিয়ে বোধ হয় সেইজন্যেই হয়নি—এমনও হতে পারে।

জয়া বললে, "বাবা, শুনছ? ওরা কীরকম ছড়া বেঁধেছে তোমার নামে?"

রাখহরি বললে, "শুনছি।"

জয়া বললে, "এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল বাবা। এখানে মানুষে থাকে? ছি!"

রাখহরি বললে, "বাপ-চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যাব? ওদের ভয়ে? ভজুকে ডেকে দে। আমি দেখছি।"

ভজু এ-বাড়ির একজন অনুগত ভৃত্য বললেও চলে, দরোয়ান বললেও ভুল হয় না। এই গ্রামেই বাড়ি। ডোমদের ছেলে। বিয়েথা করেনি। এই বাড়িতেই পড়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।

রাখহরি বেরিয়ে গেল খোলা ছাতে। ছাতের ছোট আলসের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে "এ-সব কী হচ্ছে তোমাদের? বুড়ো মিনষে তারিণী, তোমার লজ্জা করছে না?"

তারিণী তার আগেই মুখটাকে তার ফিরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে।

রাখহরি আবার বললে, "বলি, থামাবে? তোমরা যাবে এখান থেকে?"

রাস্তা থেকে কে একজন বলে উঠল, "রাস্তাটা সরকারী রাস্তা। আমরা কেউ ত আপনার বাড়ির ভেতর ঢুকিনি।"

রাখহরি বললে, "তোমরা ঢোকনি, কিন্তু তোমাদের ওই আওয়াজটা ঢুকছে।"

একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কান বন্ধ করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল "কান বন্ধ করুন!"

ওদিকে ঠিক সেই সময়েই রাখহরির পিছনে এসে দাঁড়াল ভজু। বললে, "ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ নিয়ে আয় আমার বন্দুক। জয়ার কাছ থেকে দুটো টোটা চেয়ে আনবি।"

ভজু চলে গেল বন্দুক আনতে।

রাস্তার উপর ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল কার্তিক। কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরা।

তারিণী মুখুজ্যের ছেলে। কাঁধে চামড়ার ফিতে দিয়ে ঝোলানো একটি কমদামী ক্যামেরা আর হাতে একটি দোনলা বন্দুক।

কার্তিক বোধহয় শুনতে পেয়েছিল রাখহরির কথাটা। তাই সেও রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বললে, "বন্দুক আমাদেরও আছে।"

তারিণী তার চৌদলের উপর থেকে বলে উঠল, "কেতো! কী হচ্ছে?"

এই বলেই যারা তাকে কাঁধে তুলে নাচাচ্ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে বললে, "চল্ এখান থেকে। তোরা দেখছি ঝগড়া আরম্ভ করলি।"

বড় ছেলে মারা যাবার পর, এখন এই কার্তিকই তার প্রিয় পুত্র। বদরাগী ছেলে। বেশী বলবারও উপায় নেই।

এইতেই কার্তিক খেঁকিয়ে উঠল তার বাপকে। বললে, "তুমি চুপ কর বাবা।"

ওদিকে ভজু তখন রাখহরির দোনলা বন্দুকটা এনে তার হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরলে। রাখহরি বললে, "দে।"

বলে যেই সে বন্দুকটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, কার্তিক চেঁচিয়ে উঠল, "বন্দুকে হাত দেবেন না বলছি। মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

রাখহরি বন্দুকে হাত দিতে গিয়েও দিলে না। বললে, "তাই বলে তোমরা এমনি করে আমাকে অপমান করবে?"

কার্তিক বললে, "ভোটের দিনে আপনার লোকজন বাবাকে কম অপমান করেনি।"

রাখহরি বললে, "ভোটের সময় ওরকম হয়েই থাকে।"

"এই যে, হওয়া বের করছি।"

কার্তিক তার বন্দুকটা তুলে ধরে ঘোড়ায় হাত দিলে। আর-একটু হলেই সে দিয়েছিল চালিয়ে, কিন্তু হঠাৎ একটা হাত এসে দিলে বন্দুকের নলটা উপর দিকে তুলে! দড়াম্ করে আওয়াজ হয়ে গেল।

কার্তিক তাকিয়ে দেখলে, একটা অপরিচিত লোক তার বন্দুকের নলটা টেনে ধরে আছে। নলের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কার্তিক একটা হেঁচ্কা টান মেরে বললে, "ছেড়ে দাও।"

সবাই দেখলে ব্যাপারটা। আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান বাজনা থেমে গিয়েছে। দলের একটা লোক এগিয়ে এল, শঙ্করের কাছে। বললে, "কে হে তুমি লাট সায়েব?"

অনেকেই তখন ঘিরে ধরেছে শঙ্করকে। কিন্তু শঙ্করের নজর কার্তিকের দিকে। বললে, "এখুনি কী হয়ে যেত বল দেখি?"

"কী আবার হত! ও মরে যেত।"

বলিহারী জবাব! মরে যাওয়াটা যেন কিছু নয় তার কাছে।

শঙ্কর বললে, "আর তুমি? তোমার কী হত?"

কার্তিক বললে, "কচু হত।"

"এই কেতো!"

তারিণীর গলার আওয়াজ!

কার্তিক তাকালে তার বাবার দিকে। শঙ্করও তাকালে।

তারিণী বললে, "কী ঝামেলা করছিস? চ। তুমি কে হে? রাখহরি আনিয়েছে বুঝি তোমাকে ভাড়া করে?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। আমাকে কেউ ভাড়া করে আনেনি। আমি নিজেই এসেছি।"

"কার বাড়ি এসেছ?"

"কারও বাড়ি আসিনি। এইদিকে যাচ্ছিলাম, গোলমাল শুনে এইখানে চলে এলাম।"

"বাড়ি কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "বাড়ি বলে কিছু নেই আমার। যেখানে থাকি সেইখানেই আমার বাড়ি।"

কে একজন বলে উঠল, "তা আমাদের ব্যাপারে তুমি মাথা গলাচ্ছ কেন?"

শঙ্কর বললে, "আমার স্বভাব।"

তারিণীর দিকে তাকিয়ে একজন বললে, "আপনি ঠিক বলেছেন। এ-ব্যাটা রাখহরির ভাড়াটে গুণ্ডা না হয়ে যায় না।"

শঙ্কর বললে, "ভাল করে কথা বল। আমি গুণ্ডা নই।"

"না, গুণ্ডা নও?"

বলেই লোকটা এগিয়ে এসে ঠাস করে শঙ্করের গালে একটা চড় মেরে বসল।

ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন বলে উঠল, "দে ব্যাটার মাথাটা দু ফাঁক করে।"

সত্যি-সত্যিই লাঠি উঁচিয়ে একটা লোক এগিয়ে এল শঙ্করের দিকে। কিন্তু চোখের নিমেষে লাঠিটা তার হাত থেকে ঝটকা মেরে সে-এক অদ্ভুত কৌশলে কেড়ে নিলে শঙ্কর। রাগে সে তখন ফুলছে। সেই লাঠিটাই শঙ্কর তার গায়ের উপর বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আর-একজন লাঠিয়াল শঙ্করের মাথাটা লক্ষ্য করে চালালে এক লাঠি। শঙ্কর তার হাতের লাঠিটা ঘুরিয়ে নিয়ে সেই লোকটার কব্জির উপর সজোরে দিলে বসিয়ে। লাঠিটা তার হাত থেকে ছিটকে এসে পড়ল শঙ্করের পায়ের কাছে। পা দিয়ে লাঠিটা চেপে রেখে শঙ্কর বললে, "আর কে আছিস চলে আয়।"

লোকগুলো তখন সরে যেতে আরম্ভ করেছে। আগের লোকটা হাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গিয়ে কার্তিকের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "চালাও না বন্দুকটা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? উঃ, কোনো যদি ফট করে আমার সামনে এসে না দাঁড়াত ত' দিয়েছিলাম ব্যাটার মাথাটা ফাটিয়ে! উঃ! হাতটা ফুলে গেল। বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। কী লাগাই বল দেখি?"

কথাগুলো কার্তিকের কানে ঢুকল বলে মনে হল না। সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল শঙ্করের দিকে।

"কেতো, বাড়ি চ!"

বাপের কথা শুনে কার্তিকের যেন সম্বিৎ ফিরে এল। বললে, "হ্যাঁ, সেই ভাল। চল।"

তাদের পিছু পিছু সবাই চলে গেল। শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল একা।

এই তারিণী মুখুজ্যেই তার কাকা। আর এই কার্তিক তার ভাই। জীবনে তাদের সে এই প্রথম দেখলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তাদেরই কথা ভাবছিল। ভাবছিল, এবার সে কোথায় যাবে, কী করবে। এমন সময় পিছন থেকে কে যেন তার পিঠে হাত দিতেই শঙ্কর চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখলে, রাখহরি। বললে, "সাবাস!"

শঙ্কর রাখহরির মুখের দিকে তাকিয়েই মাথা নিচু করলে।

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাবে?"

শঙ্কর বললে, "যেখানে যাব ভেবে এসেছিলাম, এখন ভাবছি সেখানে আর যাব না।"

"কোথায় থাকবে?"

"একলা মানুষ, যেখানে হক পড়ে থাকব।"

রাখহরি বললে, "তোমার আপত্তি যদি না থাকে, আমার বাড়িতেও থাকতে পার।"

শঙ্কর একটু হাসলে। বললে, "কতদিন রাখবেন?"

"যতদিন তোমার খুশি।"

শঙ্কর তখনও চুপ করে রয়েছে দেখে রাখহরি বললে, "কী ভাবছ? দু-দশটা লোককে খেতে দিতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের পুকুরের মাছ, ঘরের গাইয়ের দুধ আর চাষের চাল—খাও না কত খাবে। তোমরা শহরের মানুষ—এর মর্ম তোমরা বুঝবে না।"

"চলুন, থাকব আপনার বাড়িতে।"

সামনের দোতলায় ছোট্ট একখানি ঘর দেওয়া হয়েছে শঙ্করকে। রাখহরি বলেছে, "এখানে থাকতে হলে বাড়ির ছেলের মতই থাকতে হবে তোমাকে। আমার নিজের বলতে ওই একটামাত্র মেয়ে—জয়া! জয়ার মা নেই।"

জয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শঙ্করের। রাত্রে সে এই ঘরে তার খাবার নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে এসেছিল এই গ্রামেরই একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। সে নাকি এ-বাড়িতে রান্নার কাজ করে।

পরের দিন সকালে রাখহরি এল তার খোঁজ খবর নিতে।

"রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খাবারদাবার কষ্ট হয়নি?"

"আজ্ঞে না। হবার জো নেই। আপনার মেয়েটি সে সব দিকে ওস্তাদ।"

রাখহরি একটু হাসলে। খুশীই হল কথাটা শুনে। বললে, "সংসারের সব-কিছু ওকেই ত দেখতে হয়। ওকে রেখে দিয়েছিলাম ওর মামার বাড়িতে। বাঁকুড়ায়। এখানে না আছে একটা ইস্কুল না আছে কিছু। একটামাত্র মেয়ে। এখানে থাকলে মুখ্খু হত। তা ভাগ্যিস বাঁকুড়ায় ছিল, তাই আই-এ পাস করেছে।"

শুনে ত শঙ্করের চক্ষু ছানাবড়া! মেয়েটা আই-এ পাস?

রাখহরি বললে, "আরও পড়াবার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু ওর মা মরে গেল। বাধ্য হয়ে এখানে এনে রাখতে হল।"

এখনও ওর বিয়ে দেননি কেন?—কথাটা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে হল শঙ্করের। কিন্তু লজ্জায় পারলে না জিজ্ঞাসা করতে। রাখহরিও কিছু বললে না।

এখন জয়ার কথা থাক, শঙ্করের সব চেয়ে বড় দরকার একবার শহরে গিয়ে নিজের কিছু জামাকাপড় কিনে আনার। কলকাতার বাড়িতে যৎসামান্য যা-কিছু ছিল, সব সে বিলিয়ে দিয়ে এসেছে বস্তির লোকজনকে।

"এখান থেকে শহর কতদূর?" জিজ্ঞেস করলে শঙ্কর।

রাখহরি বললে, "শহর এখান থেকে পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরে। কেন, যাবে নাকি?"

শঙ্কর বললে, "যেতে হবে।"

"কিন্তু তুমি শহুরে মানুষ, পায়ে হেঁটে পারবে যেতে?"

"কেন, ট্রেনে?"

"তার চেয়ে হেঁটে ভাল। এখান থেকে স্টেশন ত পাঁচ-ক্রোশ। তবে যেদিক দিয়েই যাও, আমাদের গ্রাম থেকে বেরিয়েই প্রায় দু-ক্রোশ জলা। এই রাস্তাটা পার হওয়া মুশকিল।"

শঙ্কর বললে, "আপনি ত এতদিন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ ছিলেন, এই রাস্তাটা তৈরি করতে পারেননি?"

রাখহরি বললে, "চেষ্টা করেছিলাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বলেছিল, আপনারা গ্রাম থেকে অর্ধেক দিন, বাকী টাকা আমরা দেব। ওই তারিণীশঙ্কর—এখন যে প্রেসিডেণ্ট হল—ওই চামারটাই দিলে সব মাটি করে।"

"শুনেছি ত ওঁর বেশ টাকাকড়ি আছে।"

"আছে মানে? বেশ ভাল টাকা আছে।"

রাখহরি বেশ ভাল করে চেপে বসল। বলল, "কথাটা উঠল যখন, তখন শোন। ওটা মানুষ নয়, ওটা চামার। ওর এক দাদা ছিল ভবানীশঙ্কর। বিষয় সম্পত্তি টাকা-কড়ি সে-ই সব করেছিল। লোকটা অকালে মরে গেল। বাস্, যেই মরা, তারিণীশঙ্কর লাগল তার বিধবা স্ত্রীর পেছনে। আর সে মেয়েটাও ছিল একটু বোকা, আর ভারি বদরাগী। দুজনের ঝগড়া যেদিন খুব চরমে উঠল সেইদিন সে সব-কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। খুব খানিকটা শাপ-শাপান্ত করলে; বললে, "ভগবান দেখবেন তোমাকে।" এই না বলে তার বাচ্চা ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল ভগবান জানেন। সেই যে গেল আর ফিরে এল না। তারিণীশঙ্করের ভালই হল। এইটিই সে চাচ্ছিল মনে-মনে। সেই যে একটা কথা আছে না—বাবা ম'লো ভালই হল, দুটো হুঁকোই আমার হল। তারিণীর হল তাই। সেই থেকে বড় ভাইয়ের স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসিয়ে নিজেই সব ভোগ দখল করছে।"

শঙ্কর বললে, "আচ্ছা, ওর সেই দাদার ছেলেটা যদি ফিরে আসে?"

রাখহরি বললে, "সে যে অনেক দিনের কথা। সে কি আর বেঁচে আছে ভেবেছ? বেঁচে থাকলে আসত না? নিশ্চয় আসত।"

শঙ্কর বললে, "ঠিক বলেছেন। সে বোধ হয় মরে গেছে।"

এমন সময় 'বাবু' 'বাবু' বলে কে একটা লোক বাইরে চীৎকার করছে মনে হল।

রাখহরি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বললে, "কে রে জিতু? ওপরে উঠে আয়।"

জিতু দোতলায় এসে খবর দিলে যে, গড়গড়ির মেলায় যে নাগরদোলাটা চলছিল তার একটা খাট্‌লা নাকি ভেঙে গিয়ে উপর থেকে ছিট্‌কে একেবারে নীচে পড়ে গিয়েছে।

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "কেউ মরেছে?"

জিতু বললে, "না মরেনি। তবে পট্‌লা ডোমের ছেলেটার ডান হাতটা বোধহয় ভেঙে গেছে।"

কথাটা শুনে রাখহরি আশ্বস্ত হল।

"তাই বল! যেরকম করে এলি, আমি ত ভাবলাম কী না কী হয়ে গেছে। যা, আমাদের কথা হচ্ছিল, এ সময় বিরক্ত করিসনি, যা।"

জিতু চলে যাচ্ছিল, শঙ্কর বললে, "শোন!"

জিতু ফিরে দাঁড়াতেই, শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "হাতখানা কি তার ভেঙে গেছে?"

জিতু বললে, "ভাঙবে না? কতদূর থেকে পড়েছে? হাতখানা একবারে এমনি লড়বড় করছে।"

নিজের হাতটা নেড়ে কী রকম লড়বড় করছে জিতু দেখিয়ে দিলে।

ব্যাপারটা রাখহরির ভাল লাগছিল না। বললে, "কী বকবক করছিস? যা।"

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বললে, "না না, যেয়ো না, দাঁড়াও।"

এই বলে সে রাখহরির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের ডাক্তারখানাটা কোথায়?"

"কী হবে?"

শঙ্কর বললে, "লোকটাকে ডাক্তার দেখাবেন না?"

রাখহরি বললে, "ডাক্তার পাবে কোথায় যে দেখাবে?"

"গাঁয়ে ডাক্তার নেই?"

"না। ক্রোশ তিন-চার দূরে বাজিৎপুরে একটা খোঁড়া ডাক্তার আছে। রুগী মারবার যম।"

শঙ্কর বললে, "তা হলে কী হবে?"

"হবে আবার কী?" রাখহরি বললে, "দ্যাখোগে যাও এতক্ষণ হয়ত চুন-হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে। বাঁচে ত ওতেই বাঁচবে, যায় ত ওতেই যাবে। ডাক্তারে কি কিছু করতে পারে বাবা?"

শঙ্কর অবাক হয়ে গেল রাখহরির কথা শুনে।

"কী বলছেন আপনি? ডাক্তারে কিছু করতে পারে না?"

রাখহরি বেশ জোর দিয়েই বললে, "না। করনেওলা—"

বলেই চোখ দুটো বুজে হাতটা সে ঊর্ধ্বে কড়িকাঠের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

তারপর চোখ খুলে আবার সে বলতে লাগল, "তা হলে শোন বাবা, কথাটা যখন উঠল তখন বলি। গত বছর, ঠিক এমনি সময়ে তারিণীর বড় ছেলেটার হল কলেরা। ওই যে দেখলে বাঁদরটাকে ওইটেরই বড়। গাঁয়ে ডাক্তার নেই। শহরে যাবার ভাল রাস্তা নেই, এ দিকে কাদা, ওদিকে কাদা, মাঝখানে ধানের ক্ষেত। একগাড়ি টাকা খরচ করে পালকিতে চড়িয়ে ডাক্তার ত আনলে! মস্ত বড ডাক্তার। কিন্তু কী হল? পারলে বাঁচাতে?"

শঙ্কর বললে, "ডাক্তার আসতে দেরি হয়েছিল নিশ্চয়ই।"

"হবে না? দেরি হবে না? এই জলকাদা ভেঙে শহর থেকে ডাক্তার আসা কি চারটিখানি ব্যাপার? এ-গাঁয়ে ডাক্তার আসা আর ভগবান আসা দুইই সমান। কিন্তু কী হল জান?"

শঙ্কর উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে, "কী হল?"

রাখহরি বললে, "তারিণীর টাকা খেয়ে

অত বড় একটা শিক্ষিত ডাক্তার যাবার সময় আমার নামে বদনাম দিয়ে গেল।"

"বদনাম দিয়ে গেল? আপনার নামে? আপনার সঙ্গে এর কী সম্বন্ধ?"

সম্বন্ধটা যে কী শঙ্কর তা সত্যিই বুঝতে পারছিল না। রাখহরি বুঝিয়ে দিলে। বললে, "সম্বন্ধ ওই মেলা। গড়গড়ির মেলাটা যে আমার। আর ওই মেলার জন্যেই, ডাক্তার বললে—কলেরা। তারিণী ঠিক তাই বিশ্বাস করে বসল। আবার আমার মেলা যে!"

এই বলে রাখহরি পরম বিজ্ঞ একজন দার্শনিকের মত গম্ভীর গলায় বললে, "মেলাও প্রতি বছর হয়, কলেরাও হয়, কিন্তু কই গ্রামের সবাই ত মরে না! যে মরবার সে মরে। এই ত এ-বছরও হয়েছে। মেলাও হয়েছে, কলেরাও হয়েছে। যাদের পরমায়ু নেই তারা মরছে।"

ঠিক সময়ে ডাক্তার ডাকতে পারলে কলেরায় যে মানুষ মরে না—শঙ্করের ছিল এই বিশ্বাস। মৃত্যু সম্বন্ধে রাখহরির এই ঔদাসীন্য দেখে শঙ্কর একটু বিস্মিত হল। বললে, "না না, এ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু করা উচিত।"

"কী করবে? মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে? পারবে? কখখনো পারবে না। পরমায়ু যাদের নেই তারা পটাপট মরবে। কলেরায় না মরুক, শুকনো ডাঙায় হোঁচট খেয়ে মরবে। এই যে তুমি—শহর থেকে এসেছ, লেখাপড়া-জানা একটা শিক্ষিত ছেলে—তুমিও কী বলবে, কলেরার জন্যে আমার ওই মেলাটা দায়ী? কখখনো না। চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে, সাধ্য কি যে কলেরা সেখানে প্রবেশ করে। এটা হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের লোকের কথা। কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না।"

শঙ্কর বললে, "আপনার এই মেলাটি আমি দেখব।"

"বেশ ত। যাও দেখে এস। এই যে তুমি শহরে যাবে বলছিলে, যাবার দরকার হবে না। আমার মেলায় সব আছে। খুব জমাটি মেলা।"

এই বলে জিতুকে ডেকে বলে দিলে, "বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

পথে যেতে যেতে অনেক কথাই জেনে নিলে শঙ্কর। গড়গড়ির মেলা নাকি এ-অঞ্চলে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মেলা। বহু দূরের গ্রাম থেকে লোকজন এই মেলায় আসে জিনিসপত্র কিনতে। শহরে যাবার প্রয়োজন হয় না।

শঙ্কর দেখলে, অনেকখানা জায়গা জুড়ে মেলা বসেছে। সত্যিই মেলাটা খুব বড়।

এক দিকে সরু একফালি মরা নদী, আর এক দিকে সারি সারি আখের ক্ষেত। জায়গাটা বেশ উঁচু, কাজেই জল কাদার বালাই সেখানে নেই।

তবে কোনও শ্রীও নেই, কোন শৃঙ্খলাও নেই। স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। যে যেখানে পেরেছে বসে গিয়েছে।

মেলায় ঢুকে শঙ্কর প্রথমেই জানতে চাইলে—নাগরদোলাটা কোথায়?

জিতু ভেবেছিল, শঙ্কর শহরের মানুষ, নাগরদোলায় কখনও চড়েনি তাই বোধ হয় চড়তে চায়। পুব দিকে তাকিয়ে বললে, "নাগরদোলায় আজ আর চড়তে পারবেন না বাবু, এখনও মেরামত হয়নি। ওই দেখুন চলছে না।"

শঙ্কর বললে, "না না, নাগরদোলায় চাপবার শখ আমার নেই। যে-লোকটার হাত ভেঙে গেছে আমি শুধু সেই লোকটাকে দেখতে চাই।"

জিতু বললে, "সে এখনও এখানে আছে বুঝি? বাড়ি চলে গেছে।"

শঙ্কর বললে, "চল তার বাড়িতেই যাব।"

জিতু বললে, "বাবুর বন্ধুলোক আপনি, এই জল-কাদায় আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই, তারপর বাবুর মার খাই আর-কি!"

"না না, মার খাবে না, চল।"

জিতু বললে, "আপনি নতুন এসেছেন, চেনেন না আমাদের বাবুকে। বেকায়দা হয়েছে কি চট্ করে হাত চালিয়ে দেবে। তার চেয়ে আপনি ততক্ষণ মেলা দেখুন, আমি চট্ করে খবর নিয়ে আসছি।

হাঁ-হাঁ করে নিষেধ করতে করতে জিতু ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমন সময় একটা লোকের কান্নার আওয়াজ শুনে শঙ্কর তাকিয়ে দেখলে, চাষী-গোছের একজন ছেলেমানুষের মত হো-হো করে কাঁদছে।

"কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?"

লোকটা বললে, "হেরে গেলাম বাবু, একদম হেরে গেলাম। ধান-বেচা টাকা নিয়ে মেয়েছেলের কাপড় কিনতে এসেছিলাম বাবু।"

"কিসে হেরে গেলে?"

লোকটা বললে, "খেলায়। ওই যে খেলা হচ্ছে ওইখানে। ওই খেলায়!"

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, মস্ত বড় একটা ছক পেতে জুয়াখেলা চলছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় জুয়া যারা খেলছে তাদের ভিতর বেশ জেঁকে বসে আছে তারিণীশঙ্করের ছেলে কার্তিক।

কার্তিক শুধু বসে বসে দেখছে না, জুয়া সেও খেলছে।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। সে তার পকেট থেকে টাকা বের করে ছকের উপর ধরলে। ঘুঁটি পড়ে গেল তারই ঘরে। যে-টাকা ধরেছিল তার দ্বিগুণ টাকা সে ফেরত পেলে। তার দেখা দেখি তারই ঘরে অন্যান্য সবাই টাকা ধরতে লাগল।

শঙ্কর দেখলে, কার্তিক যেন লোভ দেখিয়ে আর-সকলকে খেলতে বাধ্য করছে। শেষে ইচ্ছে করে হেরে যাচ্ছে নিজে। তার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হারছে।

এ-বিদ্যেটা শঙ্কর জানে। বুঝতে তার বাকী রইল না যে এই জুয়ার আড্ডায় কার্তিকের স্বার্থ আছে ষোল আনা। নইলে সে এরকমভাবে খেলবে কেন? ওইটুকু সময়ের ভিতর শঙ্কর দেখলে, কার্তিক জিতল মাত্র দশ টাকা আর হারল প্রায় তিনশ টাকা। আর এই তিন শ টাকার সঙ্গে জুয়া যারা খেলছিল তাদেরও প্রায় শ' দুই টাকা জুয়াড়ীর থলেতে ঢুকিয়ে দিলে।

একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এই জুয়ার আড্ডায় এসে ডাকলে, "দাদা!"

দাদা তার বোধ হয় জুয়া খেলছিল। বললে, "কী বলছিস?"

শীগ্গির এস। পিসি কেমন করছে দেখবে এস।"

দাদা বললে, "দেখতে হবে কেন, নিঘ্‌-ঘাৎ কলেরা। আমি গিয়ে কী করব?"

ছকে সে তখন একটা আধুলি ধরে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছে। অন্য দিকে মন দেবার সময় তার নেই।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, "যাবে না দাদা? সারাদিন শুধু জুয়াই খেলবে?"

দাদা এমনভাবে মুখটাকে তার খিঁচিয়ে উঠল যে, মেয়েটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

কে একজন জিজ্ঞাসা করলে, "তোদের পাড়ায় কজন ম'লো রে?"

"কাল থেকে চারজন মরেছে।"

"সারা গাঁয়ে তা হলে কজন হল?"

একজন বললে, "বারোজন।"

আর-একজন তাদের থামিয়ে দিলে। বললে, "থাম বাবা, থাম। মনের আনন্দে আমরা একটু খেলা করছি, এ সময় কলেরার কথাটা মনে করিয়ে দিস না।"

শঙ্কর সেখান থেকে সরে গেল। —একটা গ্রামে বারোজন লোক মরল কলেরায়! গ্রামে ডাক্তার নেই, শহর থেকে ডাক্তার আসবার পথ নেই। মরবার আগে এই লোকগুলির মুখে একফোঁটা ওষুধ পড়েনি। নিতান্ত অসহায়ের মত শুধু দৈবের উপর নির্ভর করে তারা ছটফট করে মরেছে। আশাহীন সান্ত্বনাহীন যারা বেঁচে আছে, তারাই বা কী সুখে বেঁচে আছে কে জানে।

শঙ্কর গ্রামের দিকে যাচ্ছিল।

ওদিকে তখন জিতু আসছে পটলার খবর নিয়ে। ডাকলে, "বাবু! বাবু!"

শঙ্কর থমকে থামল।

জিতু বললে, "ছোঁড়া এখনও বেঁচে আছে বাবু।"

বাস, আর-কিছু শোনবার দরকার নেই।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ফিরে এল নিজের আস্তানায়। প্রয়োজন ছিল রাখহরির সঙ্গে। জয়া বললে, তার বাবা নাকি দূরের কোন একটা গ্রামে গেছে বিশেষ দরকারে, ফিরতে রাত হবে।

আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল শঙ্কর। জয়া তাদের সেই রাঁধুনী-ছোকরাটিকে বললে, "বাবুকে খেয়ে যেতে বল। বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।"

তারপর বোধ করি শঙ্করকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটু জোরে জোরেই বললে, "সময়ে না-খেলে অমনি কুঁদো বাঘের মত শরীরটা থাকে কেমন করে কে জানে!"

শঙ্কর একটু হেসে বললে, "খাবার দিতে বল।"

"স্নানও নেই, কিছু নেই, কোথাকার ম্লেচ্ছ রে বাবা।"

শঙ্কর খেয়ে-দেয়ে আবার বেরিয়ে গেল। সোজা চলে গেল রাখহরির গড়গড়ির মেলায়।

সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে যখন সে ফিরে এল, দেখা গেল, তার হাতে একটা টিনের সুটকেস। কয়েকটা জামা-কাপড়, গামছা, সাবান কিনে এনেছে সে। এসেই ডাকলে, "ভজু!"

একটা ছেলে এসে জানালে, ভজু বাবুর সঙ্গে গিয়েছে। এখনও ফেরেনি।

শঙ্কর বললে, "তুই একটা কাজ করতে পারিস বাবা! এক বাটি সরষের তেল আনতে পারিস?"

"এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।" বলে তক্ষুনি সে এক বাটি তেল এনে নামিয়ে দিলে শঙ্করের হাতের কাছে। তেল মেখে গামছা আর সাবান নিয়ে শঙ্কর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ঘাট-বাঁধান পুকুর একটা ছিল বাড়ির পাশেই। সেই পুকুরে স্নান করে, সাঁতার কেটে যখন সে তার দোতলার ঘরটিতে ফিরে এল, দেখলে চারিদিক তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে সারা গ্রামে।

নতুন কিনে-আনা কোরা ধুতিটা পরে ভিজে কাপড়টা বাইরের রেলিংয়ে শুকতে দিয়ে শঙ্কর ঘরে ঢুকতেই দেখলে, লণ্ঠন হাতে নিয়ে জয়া দাঁড়িয়ে।

"ওবেলা আমার কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন তা হলে!"

শঙ্কর বললে, "শুনিয়ে শুনিয়ে বললে শুনতে হয় বই-কি!"

জয়া বললে, "তাই বলে সন্ধ্যেবেলায় ওই পুকুরটায় স্নান করতে ত কেউ বলেনি।"

"—কাল বেলা স্নান করব কেমন করে? কাপড়-গামছা কিছুই ছিল না যে!"

এতক্ষণে তার পরনের কোরা কাপড়টার দিকে জয়ার নজর পড়ল। বললে, "তা জানতাম না। ম্লেচ্ছটেচ্ছ অনেককিছু বলেছি, কিছু মনে করবেন না। অন্ধকার বারান্দায় বুঝি ভিজে কাপড়টা মেলে এলেন?"

"হ্যাঁ। আলো কোথায় পাব?"

জয়া বললে, "চাইলেই পাওয়া যায়।"

"তাই ভাবছিলাম।" বলেই শঙ্কর ভিজে গামছাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে গেঞ্জিটা গায়ে দিচ্ছিল। জয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার সেই অনাবৃত সুন্দর সুগঠিত দেহের দিকে। গেঞ্জিটা পরেই শঙ্কর চট্‌ করে একবার মুখ তুলে তাকালে। চোখে চোখে চোখ পড়ে গেল। লজ্জাটা কাটাবার জন্যই বোধ করি জয়া তার আগের কথার জের টেনে বললে, "কী ভাবছিলেন? লণ্ঠনটা কার কাছে চাইবেন?"

শঙ্কর বললে, "হ্যাঁ।"

বলেই সে বসল তার খাটের উপর। জয়া তার হাত থেকে লণ্ঠনটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জানলার একটা শিক ধরে। ঠিক এমনি করে আর-একজন একদিন দাঁড়িয়ে ছিল। চট্‌ করে কালীঘাটের সেই বাড়িটার কথা শঙ্করের মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল ঝিলপাড়ার সেই অবিস্মরণীয় রাত্রির কথা। সারাটা রাত কাটিয়েছিল তারা একই শয্যায়—সদ্য-বিবাহিত স্বামী আর স্ত্রী। মাঝখানে কী যে সব হয়ে গেল, সেই স্ত্রীই বললে, "থাক, আর স্বামীর পরিচয় তোমাকে দিতে হবে না।"

দুজনের দাঁড়াবার ভঙ্গিটুকু এক। জয়ার চেয়ে সে বয়সে ছোট। জয়ার চেয়ে সে অনেক অনেক বেশী সুন্দরী।

যাক তার সম্বন্ধে ভেবে কিছু লাভ নেই। ইন্দ্রাণীর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত। শঙ্কর জয়ার দিকে তাকালে। বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে বোস।"

জয়া কিন্তু বসলে না। বললে, "কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা আপনাকে বলি।"

শঙ্কর বললে, "বল।"

জয়া মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললে, "শুনেছিলাম, শরীরটা যাদের যত বেশী শক্ত, বুদ্ধিটা তাদের তত বেশী মোটা।"

"ও হ্যাঁ, শরীরটা যাদের যত বেশী— কী বললে? কার কথা বলছ?"

জয়া হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে, "কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছেন?"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি। আমার কথা বলছ।"

তেমনি হাসতে হাসতে জয়া বললে, "হ্যাঁ।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েদের হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারি না। কী তুমি বলতে চাও ভাল করে বল।"

জয়া জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বিয়ে করেছেন?"

"কী হবে তোমার সেকথা জেনে?"

"বাঃ রে, জানতে ইচ্ছে করে না?"

শঙ্কর বললে, "যদি বলি বিয়ে আমি এখনও করিনি!"

"বাস্‌, তা হলে আর করবেন না।"

"কেন?"

জয়া সে-এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললে, "না বাবা, বলব না, রাগ করবেন।"

শঙ্কর বললে, "না, তুমি বল। আমি রাগ করব না।"

"না, করবেন না? আপনার রাগ আমি দেখেছি। লাঠি মেরে একটা লোকের হাত ভেঙে দিয়েছেন আপনি।"

"সে যে আমার মাথা ভাঙতে এসেছিল।"

"হ্যাঁ, আপনার মাথা ভাঙা এত সহজ কি-না?"

শঙ্কর বললে, "ও-সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি আমাকে বিয়ে করতে কেন বারণ করলে তাই বল।"

জয়া বললে, "বাব্বাঃ, যেরকম কাঠ-কাঠ কথা আপনার, কোনও মেয়ে থাকতে পারবে না আপনার কাছে। পালাবে।"

শঙ্কর চমকে উঠল জয়ার কথা শুনে। বললে, "তুমি জানলে কেমন করে?"

জয়া বললে, "আমিও ত একটা মেয়েমানুষ।"

শঙ্কর বললে, "ভুল বলছ তুমি। মেয়েরা আমাকে ভালবাসে। আমি জানি।"

"জানলেন কেমন করে? বিয়ে ত করেননি।"

শঙ্কর আর বেশীদূর এগোতে চাইলে না। বললে, "পরে বলব। এখন তুমি আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াও দেখি!"

"চা খাবেন আপনি?" জয়া বললে, "তবে যে শুনলাম চা আপনি খান না!"

শঙ্কর বললে, "ভালবেসে এক-আধ পেয়ালা কেউ যদি দেয় ত খাই।"

"দিচ্ছি।" বলে সে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "ভালবাসা অত সস্তা নয়।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "মুড়ি আছে বাড়িতে?"

জয়া বললে, "নিশ্চয়ই আছে। খাবেন?" জবাবের জন্য অপেক্ষা না-করেই জয়া চলে গেল।

শঙ্করের ঘুম যখন ভাঙল, রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। সারা গ্রাম তখনও ঘুমচ্ছে। শঙ্কর তার কাপড়-গামছা নিয়ে পুকুরের বাঁধান ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। হাত-মুখ ধুয়ে সূর্যপ্রণাম করে প্রথমে শরীরটাকে

বেশ ভাল করে গরম করে নিলে। সূর্যপ্রণাম এক অভিনব পদ্ধতির ব্যায়াম। শঙ্কর তার ক্লাবের ছেলেদের খালি হাতে ব্যায়ামের এই পদ্ধতিটাই প্রথম শেখাত।

তারপর পুকুরে স্নান করে যখন সে উঠল, দেখলে—পুবের আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠছে। স্নিগ্ধ সুন্দর হাওয়া বইছে। চারিদিকে বিচিত্রবর্ণ ঘন সবুজের সমারোহ। পল্লীপ্রান্তের এই মনোরম পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শঙ্কর তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অপরূপ আনন্দের বিচিত্র আস্বাদ অনুভব করলে। সর্বাঙ্গ তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। চোখ দুটো অকারণে জলে ভরে এল।

শুধুই তার মনে হতে লাগল, এই উদার উন্মুক্ত বহিঃপ্রকৃতির মাঝখানে বাস করে এখানকার মানুষগুলি এত সংকীর্ণ কেন? মানুষে মানুষে কেন এত হিংসা, কেন এত বি দ্বে ষ? স্বার্থ-কলুষিত জঘন্য এক বিষাক্ত পরিবেশ, চারিদিকে শুধু দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ শোক আর মহামারী!

বাড়িতে যখন ফিরে এল শঙ্কর, সবাই তখন জেগে উঠেছে।

রা খ হ রি কা ল যেখানে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরতে তার অনেক রাত্রি হয়েছে। ছোট যে ছেলেটা কাল থেকে চাকরের কাজ করছে, তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললে, "বাবু এখনও ঘুমুচ্ছেন।" শঙ্করের হাত থেকে ভিজে কাপড়টা কেড়ে নিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে মেলতে মেলতে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে, "চা খাবেন বাবু?"

"চা এত সকালে কোথায় পাবি?"

ছেলেটা ফিক করে হাসলে। বললে "দেখুন না, আমি এনে দিচ্ছি।" বলেই সে শঙ্করের কাছে এগিয়ে এল। বললে, "দিদিমণি কি এখন উঠেছে? রাত থাকতে উঠে আমাকে তুলে দিয়ে বলেছে—উনুনে আগুন দে। চা এতক্ষণ হয়ে গেছে।"

"না, চা এখনও হয়নি।"

ছেলেটাও ফিরে তাকালে। শঙ্করও তাকাল। দেখলে, সিঁড়ি দিয়ে জয়া উঠে আসছে। তার হাতে একটা কাচের গ্লাস। গ্লাসের উপর একটা বাটি বসানো। সোজা সে শঙ্করের ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর গ্লাস আর বাটিটা নামিয়ে দিয়ে বললে, পশ্চিমা দারোয়ানের মত 'উঠ-বোস' করে এসে চা খেতে হয় না। এইটে খেয়ে নিন।"

শঙ্কর দেখলে, বাটিতে কতকগুলো ভিজে ছোলা, আদা আর নুন। কাচের গ্লাসে বোধ হয় শরবত। অবাক হয়ে তাকালে জয়ার মুখের দিকে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। সকালে উঠেই বোধ করি কুয়োর জলে স্নান করেছে। আঁটসাঁট করে রঙিন একখানি শাড়ি পরেছে। আগুনের মত লাল টকটক করছে জামার রঙ। আর ভিজে একপিঠ কালো চুল পিঠের উপর এলানো।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এসব জানলে কেমন করে?"

"দেখলাম যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমার

"না চা এখনও হয়নি"

ঘরের জানলা দিয়ে সবই ত দেখা যায়।"

জয়া বললে, "আমাদের বাড়িতে একজন দারোয়ান ছিল, সে ওই চাঁপাগাছটার তলায় খানিকটা গর্ত খ্‌ঁড়েছিল। ভজ্‌য়াকে নিয়ে ওইখানে সে কুস্তি করত আর সারা গায়ে মাটি মেখে—মোষের মতন—"

এই বলে এমন হাসি হাসতে লাগল যে, হাসির ধমকে কথাটা আর শেষ করতে পারলে না।

হাসির বেগ খানিকটা থামিয়ে বললে, "না বাবা, বলব না, রাগ করবেন।—আমি থাকলে আপনি খাবেন না দেখছি, আমি প্যালালাম।"

যেতে যেতেও জয়া দোরের কাছে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "বাবা উঠলে চা পাঠিয়ে দেব।"

রাখহরির উঠতে সেদিন বেশ দেরি হল। শঙ্করের ভিজে কাপড়টা তখন শ্‌কিয়ে গিয়েছে। শ্‌কনো কাপড়টা তুলে নিয়ে শঙ্কর তার ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াতেই মনে হল, কাছাকাছি কোন বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। কোন্‌ এক মায়ের ব্‌কফাটা কান্না। ছেলে মারা গিয়েছে। মনটা উদাস হয়ে গেল শঙ্করের। জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢ্‌কল রাখহরি।

"কীরকম? কোনও কষ্ট হয়নি ত?"

শঙ্কর ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আজ্ঞে না।"

রাখহরি বসল খাটের উপর। বললে, "কাল ফিরতে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। তিনটে লোকের কাছে টাকা পেতাম, তাও সব আদায় হল না।"

শঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। রাখহরি বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।"

হাতের কাপড়টা পাশে নামিয়ে রেখে শঙ্কর বসল।

"ম্‌খখানা তোমার ভারি-ভারি মনে হচ্ছে। কী ভাবছ?"

শঙ্কর বললে, "কান্নার আওয়াজ শ্‌নতে পাচ্ছেন?"

রাখহরি বললে, "এটা ত তোমাদের শহর নয়, গ্রাম। এখানে এক মাইল দ্‌রের কান্না এখান থেকে শ্‌নতে পাবে। এরকম কান্না আমরা রোজই শ্‌নি।"

শঙ্কর বললে, "রোজ রোজ এ-কান্না বোধ হয় বেড়েই যাবে।"

রাখহরি বললে, "বাড়্‌কগে। এ-শোনা আমাদের অভ্যেস আছে। কাল আমার মেলাটা কেমন দেখলে তাই বল।"

"ভাল।"

রাখহরি খ্‌শী হল কথাটা শ্‌নে। বললে, "এরকম মেলা এ-অঞ্চলে কোথাও হয় না। ছোট ছেলেটি পর্যন্ত জানে, গড়গড়ির মেলার কথা।"

শঙ্কর বললে, "মেলাটা তুলে দিন।"

রাখহরি তার ম্‌খের দিকে তাকালে। "কী বললে? মেলাটা তুলে দেব?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তুলে দেবেন। আপনার এই মেলার জন্যেই গাঁয়ে কলেরা হচ্ছে।"

রাখহরি সে-কথা সহ্য করতে পারলে না। বললে, "ব্‌ঝেছি। তারিণীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। হ্‌ঁ, ঠিক। তারিণীই তোমাকে শিখিয়েছে এই কথা।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কেউ আমাকে কিছ্‌ শেখায়নি। ভাল চান ত মেলাটা তুলে দিন।"

"তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?"

"আজ্ঞে না। ও কী কথা বলছেন? তাই কখনও পারি?"

রাখহরি বললে, "মেলাটা তুলে দেওয়া অমনি ম্‌খের কথা? ওই মেলা থেকে আমার ইনকাম চারটি হাজার টাকা। গেল-বছর পেয়েছিলাম পাঁচ হাজার টাকা। এটা আর তারিণীর সহ্য হচ্ছে না।"

শঙ্কর বললে, "মেলা তা হলে আপনি তুলবেন না?"

রাখহরি বললে, "না। তারিণী তোমাকে বিগড়ে দিয়েছে আমি ব্‌ঝতে পেরেছি।"

এই বলে রাখহরি উঠে দাঁড়াল। বললে, "খ্‌ব লোককে আমি বাড়িতে জায়গা দিয়েছি! আমারই খাবে, আর আমারই সর্বনাশ করবে? অত কাঁচা ছেলে আমি নই। তুমি আপনার পথ দেখ।"

রাখহরি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পাশের ঘর থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ওরে কে আছিস? তামাক দিয়ে যা।"

কারও কোন সাড়া না পেয়ে রাখহরি আবার চেঁচিয়ে উঠল, "কোথায় সব, মরেছে নাকি?"

জয়া চা পাঠিয়ে দিয়েছিল। একটা থালার উপর বসিয়ে দ্‌ পেয়ালা চা আর দ্‌টো বাটিতে ঘি দিয়ে ভাজা চিঁড়ে, আর নারকেলের কুচি। উপরে লঙ্কা আর চিনি ছড়ানো। খ্‌ব যত্ন করে তৈরি করেছিল জয়া।

ছেলেটা ফিরে এল একটা কাপ আর-একটা বাটি ফিরিয়ে নিয়ে। জয়া জিজ্ঞাসা করলে, "ও কী রে, ফিরিয়ে আনলি কেন? শঙ্করবাব্‌ খেলে না?"

"শঙ্করবাব্‌ নেই ত ওখানে।"

জয়া বললে, "যাঃ, বাবার ঘরে দেখেছিস?"

"বাব্‌ ত একাই বসে রয়েছেন।"

"ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, তুই দেখতে পাসনি।"

এই বলে জয়া নিজেই ছ্‌টল। ছেলেটাকে বললে "ও দ্‌টো তুই নিয়ে আয়।"

জয়া একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে দাঁড়াল তাদের বার-বাড়ির দোতলায়। শঙ্করের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই দেখলে, শঙ্কর নেই। বাইরের বারান্দায় দেখলে, সেখানেও নেই। তখন নজর পড়ল, ঘরের কোণের দিকে—নতুন কিনে-আনা টিনের স্‌টকেসটিও নেই।

জয়া পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলে, খ্‌ব আরাম করে নারকেল-চিঁড়ে চিবচ্ছে তার বাবা। বললে, "এগ্‌লো ভারি স্‌ন্দর হয়েছে ত! কই, এ-রকম ত কোনদিন করিস না?"

জয়া খ্‌শী হল কথাটা শ্‌নে। বললে, "ভাল হয়েছে? রোজই করে দেব।"

বলেই একট্‌ থেমে জয়া জিজ্ঞাসা করলে, "শঙ্করবাব্‌ কোথায় গেলেন বাবা?"

"চলে গেছে নাকি?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ। জিনিসপত্র কিচ্ছ্‌ নেই।"

রাখহরি বললে, "জিনিসপত্র ছিল নাকি কিছ্‌?"

"মেলা থেকে কাপড়-জামা কিনে এনেছিল যে!"

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "কিচ্ছ্‌ নেই?"

"না। কিচ্ছ্‌ নেই।"

"বেশ হয়েছে। যাকগে, মর্‌কগে। হতভাগা বলে কিনা—গড়গড়ির মেলাটা আপনি তুলে দেবেন কিনা বল্‌ন। আমার ওপর জ্‌ল্‌ম!"

জয়া বললে, "তা হলে তুমি কিছ্‌ বলেছ?"

"বলব না? কালকেই বাড়ি ছিলাম না, আর কালকেই ও তারিণীর দলে গিয়ে ভিড়েছে। আমার মেলাটি তুলে দিতে না পারলে তারিণীর ঘ্‌ম হচ্ছে না।"

জয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্‌নতে লাগল।

রাখহরি বললে, "তাই বলবার মধ্যে বলেছি—তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, আমারই খাবে আবার আমারই শত্র্‌তা করবে? তার চেয়ে কাজ নেই বাবা, তুমি আপনার পথ দেখ।"

জয়া আর কথা না বলে থাকতে পারল না। বললে "তা হলে তুমিই তাড়িয়েছ।"

"হাঁ, তাড়িয়েছি।"

বলে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চা খেতে খেতে রাখহরি বললে, "নইলে আমার বাড়িতে বসে কোনদিন আমার কী সর্বনাশ করে বসত বাবা, তার চেয়ে গিয়েছে ভালই হয়েছে।"

কথাটার কী যে ইঙ্গিত কে জানে। জয়ার পায়ের নীচের মাটিটা যেন সরে যেতে লাগল।

শঙ্কর সত্যি সত্যিই তারিণীশঙ্করের বাড়ী গিয়ে হাজির!

তারিণীশঙ্কর মন দিয়ে সব কথা শ্‌নলে শঙ্করের। তারপর বললে "বা বা বা, রাখহরি আচ্ছা চাল চেলেছে ত! তোমার কথা শ্‌নে

আমি আমার লোকজন দিয়ে মেলাটি ভেঙে দিই, আর রাখহরি আমার নামে মামলা করুক। তুমি ওইখানে থাক ওইখানে খাও, তুমি যে রাখহরির লোক সেকথা আমি জানি। আমি অত কাঁচা ছেলে নই।"

শঙ্কর বললে, "তাহলে আপনি লোক দিয়ে সাহায্য করবেন না আমাকে?"

তারিণীশঙ্কর বললে, "না বাপু, আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। নইলে রাখহরির মেলা ত আমি ভেঙে দিতেই চাই।"

তারিণীশঙ্করের সঙ্গে একজন সহচর প্রায় সব সময়েই থাকে। এই সহচরটির নাম নবদ্বীপ। জাতিতে ব্রাহ্মণ। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। অস্থিচর্মসার একটি কঙ্কাল বললেই হয়। আগেকার দিনে রাজরাজড়াদের সঙ্গে একজন বিদূষক থাকত। নবদ্বীপও সেই জাতীয়।

নবদ্বীপ বলে উঠল, "এই ত কথার মত কথা! দাও ভেঙে। রাখহরি ঠেলাটি বুঝুক। তাছাড়া এবছর ত তুমি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "না রে না, তুই থাম্।"

এই বলে তাকে সে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

নবদ্বীপ কিন্তু অত সহজে থামবার লোক নয়। বললে, "থামলাম। কিন্তু এই যে কলেরার ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছে চব্বিশ ঘণ্টা, উনি বলছেন—মেলাটি ভেঙে দিন, কলেরা থেমে যাবে। সেকথাটাও ত তোমার শোনা উচিত।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "জানি। আবার এও ত জানি—জোর করে মেলা ভাঙা বেআইনী কাজ।"

এইবার নবদ্বীপ বলবার মত কথা খুঁজে পেল। বললে, "মেলা ত তুমি ভাঙবে না, ভাঙব আমি। তুমি তোমার লোকজনকে বলে দাও। বাস, মামলা করে আমার নামে করবে।"

—"তুই বলছিস এই কথা? সেসময় সরে পড়বি না ত?"

—"সরে কখনও পড়েছি?" নবদ্বীপ বললে, "নিশ্চয়ই বলছি। আমি বলছি, এই যে ইনি বলছেন।"

বলেই সে শঙ্করকে দেখিয়ে দিলে।

শঙ্কর যদিও সেদিন তারিণীশঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তবু তার বীরত্বে সেদিন সে মুগ্ধ হয়েছিল বই-কি! চেয়ারে বসে বসে সবই সে দেখছিল। শঙ্কর অন্যায় কিছু করেনি। প্রিয়দর্শন শক্তিমান এই ছোকরাটিকে যদি সে নিজের দলে টেনে নিতে পারে ত মন্দ হয় না। তাছাড়া কার্তিকটা যেরকম উদ্ধত হয়ে উঠছে দিন-দিন, তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে এইরকম একটি মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

শঙ্করের আপাদমস্তক তারিণীশঙ্কর আর-একবার দেখে নিল। বললে, "রাখহরির মেলা তুমি যদি আজ ভেঙে দাও, রাখহরি তোমাকে নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবে, সেকথা ভেবে দেখেছ?"

শঙ্কর মুখ টিপে একটু হাসলে। বললে, তাড়িয়ে দেবে নয়, তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি লুকিয়ে কোন কাজ করতে চাই না। মেলা ভাঙার কথা তাঁকে আমি বলেছি। বলবামাত্র তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই দেখুন।"

বলে সে তার টিনের ছোট সুটকেসটি দেখিয়ে দিলে।

তারিণীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "এখন তাহলে তুমি থাকবে কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "যেখানে একটুখানি আশ্রয় পাব সেইখানেই থাকব, নয় ত চলে যাব।"

কথাটা শুনে তারিণীশঙ্কর উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "আমার একটা একতলা ভারি সুন্দর বাড়ি খালি পড়ে আছে। কার্তিকটা মাঝে মাঝে ওইখানে আড্ডা মারে। আমার এক দাদা ছিলেন, মারা গেছেন, সেই তিনি তৈরি করেছিলেন ওটা। সুন্দর বাগান ছিল ওখানে, এখন আর কিছু নেই। ওটার নাম তাই বাগানবাড়ি। সেই বাগানবাড়িতে ইচ্ছে করলে তুমি থাকতে পার। খাবারটা এইখান থেকেই যাবে।

নবদ্বীপ লাফিয়ে উঠল—"দাও বাগান-বাড়ির চাবিটা। আমি ওকে ওইখানে পুরে দিয়ে আসি। তারপর খাওয়-দাওয়া সেরে লোকজন নিয়ে গিয়ে—বাস্, রাখহরির মেলার গুষ্টির তুষ্টি করে দিয়ে আসব।"

ড্রয়ার থেকে চাবিটা বের করে নবদ্বীপের হাতে দিয়ে তারিণীশঙ্কর বললে, "কার্তিককে জানিয়ে দিস খবরটা।"

"দেব।" বলে শঙ্করকে নিয়ে নবদ্বীপ চলে গেল বাগানবাড়িতে।

কার্তিক কোথায় যেন গিয়েছিল তার ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে। বাড়ি ফিরেই শুনলে, রাখহরির মেলাটাকে ভেঙে দেবার হুকুম দিয়েছে তার বাবা। আর হুকুম দিয়েছে সেই লোকটাকে যে-লোকটা রাখহরির গুপ্তচর।

ক্যামেরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বন্দুক নিয়ে কার্তিক ছুটল। দোরের কাছে তার বাবার সঙ্গে দেখা।

—"গড়গড়ির মেলা ভাঙবার হুকুম দিয়েছ তুমি?"

—"হ্যাঁ দিয়েছি। মেলা না ভাঙলে কলেরা থামবে না।"

—"রাখহরি তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে?"

—"সে পথ আমি মেরে রেখেছি। তুই থাম।"

কার্তিক বললে, "ওই মেলায় আমার একটা 'বিজ্‌নেস্' চলছে তা জানো?"

তারিণী বললে, "তোর 'বিজ্‌নেস্' না গুষ্টির মাথা! সব জানি আমি। রাখহরির মেলায় জুয়ার আড্ডা বসাবি, কথায় কথায় বন্দুক চালাবি, ওই রাখহরিই তোকে কোনদিন পুলিশে ধরিয়ে দেবে।"

কার্তিক বললে, "দেবে! খুব বাহাদুর! আজ একটা খুনখারাপী হয়ে যাবে। আমি চললাম সেখানে।"

তারিণী ডাকলে, "কেতো! খবরদার বলছি মারামারি করিস না। আমি সামলাতে পারব না। কেতো! কেতো! কার্তিক!"

কার্তিক ফিরল না, ছুটে চলে গেল।

কার্তিক মেলায় গিয়ে দেখলে, সব শেষ। মাত্র কুড়ি পঁচিশজন লাঠিয়াল আধ ঘণ্টার ভেতর সবকিছু ছই ছত্রাকার করে দিয়েছে।

যে-লোকটা কার্তিকের জুয়ার 'বিজ্‌নেস্' চালাত, তার মুখ থেকেই কার্তিক সব-কিছু শুনলে।

কার্তিক জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের কিছু ক্ষতি হয়নি ত?"

"না বাবু।"

লোকটি বললে, "ক্ষতি যা-কিছু হয়েছে তা খাবারের দোকানগুলোর। ওই দেখুন না, কাউকে খেতে দিলে না—বললে, কলেরা হবে।"

কার্তিক দেখলে, রসগোল্লা, পানতুয়া, সন্দেশ ইত্যাদি সব ধুলোয় মাটিতে ছড়াছড়ি। কুড়ি-পঁচিশটা গেঁয়ো কুকুর পরমানন্দে সেগুলো খাচ্ছে আর মারামারি করছে। বাঁশ দিয়ে, খড় দিয়ে, টিন দিয়ে যেসব ঘর তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলো ভেঙে একেবারে তছনছ করে দিয়ে লোকগুলো চলে গিয়েছে। দোকানীরা তাদের জিনিসপত্র বাক্স প্যাটরায় তুলে বাঁধাছাঁদা করছে।

রাখহরি রাগে হাত-পা কামড়াবে। কিছুই আর তার করবার নেই। মেলা আর সে নতুন করে বসাতে পারবে না—এইসব কথা ভেবে কার্তিক মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করছিল। তাই সে এতক্ষণ আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়তেই তার লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "আজকে আমাদের ক্যাশ কত হয়েছিল?"

"পঁচাত্তর টাকা সাত আনা।"

"কই, দে।" কার্তিক হাত পেতে বসল।

লোকটি বললে, "বাঃ রে, তবে আর বললাম কী! সেই যে সুন্দরমত ছোকরাটি—তিনি পেথমেই এসে বললেন, আমি জানি এ-খেলা কার্তিকের। তুমি তোমার ঝাণ্ডা ছক গুটি তুলে নাও, আর টাকাকড়ি যা

আছে আমার হাতে দিয়ে দাও—লুটপাট হয়ে যেতে পারে। গুনে গুনে থলিসুদ্ধ তুলে দিলাম তেনার হাতে। প'চাত্তর টাকা সাত আনা। তারপর শেষে যখন চাইলাম, বললেন, আমি দিয়ে দেব কার্তিককে। এই ত যাচ্ছে এই দিকে। এখনও আখ-বাড়ি পেরোয়নি।"

কার্তিক রেগে উঠল। বললে, "আচ্ছা বোকা ত! ও বললে আর তুই টাকাগুলো তুলে দিলি ওর হাতে? ও-টাকা আর পাব ভেবেছিস? আমি জানি। সেই জন্যেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছি। চললাম। আমার সঙ্গে পরে দেখা করিস।"

কার্তিক বন্দুক হাতে নিয়ে ছুটল আখ-বাড়ির দিকে।

লোকটা ঠিকই বলেছিল। কার্তিক দেখলে, শঙ্কর আর নবদ্বীপ যাচ্ছে। লাঠিয়ালরা চলে গিয়েছে। শঙ্করের হাতে তারই টাকার থলি।

নবদ্বীপের ভয় সবচেয়ে বেশী। ঘন ঘন পিছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কী দেখছ?"

নবদ্বীপ বললে, "রাখহরি খবর এতক্ষণ পেয়ে গেছে, না কী বল?"

শঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, "তাই বুঝি দেখছ—লোকজন আসছে কিনা আমাদের মারতে?"

"তোমার কী বল! গায়ে তাগদ আছে, লড়ে যেতে পারবে।"

শঙ্কর বললে, "তুমি লড়তে না পার, পালাতে পারবে।"

"হ্যাঁ, তা পারব।"

বলে আবার সে যেই পিছন ফিরেছে, দেখলে বন্দুক হাতে নিয়ে কার্তিক আসছে সেই দিকে। বললে, "ওই দেখ কে আসছে।"

কার্তিককে দেখেই শঙ্কর থমকে দাঁড়াল। বললে, "টাকাটা কার্তিককে দিয়ে দিই।"

নবদ্বীপ কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে তার কঙ্কালসার দেহ নিয়ে কার্তিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, "খুব দেরি করে এলে কার্তিক। এই এত বড় বড় লেডিকেনি, সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি—এই লোকটা আমাকে খেতে দিলে না কিছুতেই, সব ছড়িয়ে দিলে মাটিতে, নেড়ি কুকুরগুলো গবাগব মেরে দিলে। তুমি থাকলে আমি কিন্তু ওর কথা শুনতাম না। পেট ভরে সন্দেশ খাব বলে এলাম ওর সঙ্গে, কিন্তু কিছুই হল না, শুধু মেলা ভাঙাই সার হল। অরে, একটা কথাও বলছ না, কী হল তোমার?"

নবদ্বীপ বক বক করে বকেই মরল শুধু। কার্তিক নীরবে শঙ্করের কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, "আমার টাকায় তুমি হাত দিলে কেন?"

পাষাণ মায়া

আলোকচিত্রী : আনল দত্ত

শঙ্কর অবাক হয়ে গেল তার রাগ দেখে। তার টাকা তাকেই সে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কার্তিকের মুখ-চোখ আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে সে উল্টো কথা বলে বসল। বললে, "কার টাকা?"

"আমার।"

শঙ্কর বললে, "না, এ-টাকা তোমার নয়। জুয়া যারা খেলছিল এ-টাকা তাদের।"

কার্তিক বললে, "বটে! এ-টাকা তুমি মেরে দিতে চাও?"

"বেওয়ারিশ টাকা, তুমি মারলেও মারবে, আমি মারলেও মারব।"

কার্তিক বললে, "গায়ে জোর আছে বলে তোমার এই অহঙ্কার, কিন্তু এইটে দেখেছ?"

বলেই তার হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে কার্তিক বললে, "এর কাছে গায়ের জোরের দাম এক কানাকড়িও নেই।"

নবদ্বীপ এতক্ষণ পরে বুঝতে পারলে তারা ঝগড়া করছে। বললে, "এ হে-হে-হে, তোমরা ঝগড়া আরম্ভ করলে যে? চল, বাড়ি চল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেক না। রাখহরির লোকজন সব হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে এসে পড়ল বলে!"

শঙ্কর নবদ্বীপের দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি বাড়ি যাও। আমাদের অনেক কথা আছে।"

"হ্যাঁ, সেই ভাল। তোমার সঙ্গে এসে আমার হল ত খুব! সন্দেশগুলো কাককে খাওয়ালে, কুকুরকে খাওয়ালে, তবু আমাকে খেতে দিলে না।"

গজ গজ করতে করতে নবদ্বীপ সত্যই চলে গেল।

শঙ্কর কার্তিককে বললে, "এস, এই-খানে। তোমাকে একটা কথা বলি।"

রাস্তার একদিকে আখের ক্ষেত, আর একদিকে উঁচু জমির উপর সারি সারি কয়েকটা আমের গাছ। একটা আম গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে শঙ্কর কার্তিককে বললে, "তুমি খুব বন্দুকের বড়াই কর, না? বন্দুক খুব ভাল চালাতে পার?"

"নিশ্চয়ই পারি। তুমি আমার টাকা দেবে কিনা তাই বল।"

একাকিনী

শিল্পী ঃ গোপাল ঘোষ

শংকর হেসে বললে, "এই নাও তোমার টাকা। গুনে দেখ পঁচাত্তর টাকা সাত আনা আছে। আমি তোমাকে দেবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

এই বলে থলিটা কার্তিকের হাতে দিয়ে বললে, "আচ্ছা, ওই যে দেখছ গাছের ডালে একটি আম ঝুলছে, তোমার ওই বন্দুক দিয়ে ওইটি পাড়তে পার?"

কার্তিক বসল গাছের তলায়। হাতের থলিটা নামিয়ে পকেট থেকে দুটি টোটা বের করলে।

শংকর বললে, "আগে টাকাটা গুনে নাও।"

"পরে গুনব।"

কার্তিক টোটা দুটো বন্দুকে পুরে গাছের ডালে যে আমটি ঝুলছিল, সেই দিকে বন্দুকটি তুলে ধরলে। যেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে সুবিধে হল না। আর-একটু সরে গিয়ে সুবিধামত একটা জায়গা বেছে নিয়ে হাঁটু গেড়ে পাকা শিকারীর মত বসে, দিলে বন্দুকটা চালিয়ে। জোর আওয়াজ হল। গাছ থেকে কয়েকটি আমের পাতা ঝরে পড়ল, কিন্তু আমটি পড়ল না।

কার্তিক তাকালে শংকরের মুখের দিকে।

শংকর বললে, "লজ্জা কিসের? আবার চালাও। কিন্তু আমটা ফাটিয়ে দিলে চলবে না। বোঁটায় মেরে আমটিকে ফেলতে হবে।"

"সে আবার কেমন করে হবে? কার্তিক বললে, "আমটা দুলছে যে।"

শংকর বললে, "থামুক। থামলে চালাবে।"

কার্তিক বন্দুকটা নামিয়ে নিয়ে বললে "মুখে অমনি বললেই হয় না। তুমি পার?"

শংকর বললে, "আমার ত বন্দুক নেই। তোমার বন্দুক রয়েছে, সব সময়েই দেখছি বন্দুক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বন্দুকের বড়াই করছ, তাই তোমাকে বলছি—এই আমটি যদি পাড়তে না পার ত বন্দুক নিয়ে আর ঘুরে বেড়িয়ো না।"

কথাটা শুনে রাগ হয়ে গেল কার্তিকের। বন্দুকটা নামিয়ে রেখে বললে, "বলা খুব সোজা! তুমি যদি নিজে পার, দেখিয়ে দাও, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।"

শংকর এইবার বসল গিয়ে তার পাশে। বললে, "সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

"কই, দেখি তা হলে একবার চেষ্টা করে।"

শংকর বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিমেষের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করে দিলে চালিয়ে। শব্দের সংগে সংগে আমটি টুপ করে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেল।

কার্তিক অবাক হয়ে চেয়ে রইল শংকরের মুখের দিকে।

বন্দুকের ভিতর থেকে টোটার পোড়া খোল দুটো বের করে নলে ফুঁ দিয়ে শংকর বললে, "চল, এবার বাড়ি যাই।"

কার্তিকের মুখের চেহারা তখন বদলে গিয়েছে। পকেট থেকে আর একটা টোটা বের করে শংকরের হাতে দিয়ে বললে, "এবার একটা উড়ন্ত পাখি মার। আমি অনেক চেষ্টা করেছি—পারিনি।"

"আমিই কি পারব? আচ্ছা, দাও, দেখি। কার্তিকের হাত থেকে টোটাটা নিয়ে বন্দুকে পুরতে পুরতে শংকর বললে, "না পারলে হেস না কিন্তু।"

নাম-না-জানা কয়েকটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল মাথার উপর দিয়ে। শংকর বন্দুকটা তুলেই একটা উড়ন্ত পাখিকে লক্ষ্য করে ঘোড়ায় হাত দিলে। প্রচণ্ড আওয়াজে পল্লীপ্রান্তর কেঁপে উঠল। পাখিটা ঝটপট করে পড়ল দূরে।

কার্তিক ছুটে গিয়ে শংকরকে জড়িয়ে ধরলে।

কার্তিকদের বাগানবাড়ির চেহারা গিয়েছে বদলে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ময়না-বুনি শক্তি কেন্দ্র'। নানান বয়সী গ্রামের ছেলেরা সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। সকাল-বিকেল দু বেলা চলছে নানান

রকমের ব্যায়াম। সন্ধ্যায় বসছে যাত্রাগানের আসর।

তারিণী বড়-একটা আসে না এদিকে। নবদ্বীপ সেদিন সন্ধ্যায় টেনে নিয়ে এল তাকে। শঙ্করকে বললে, "তা এ-সব করেছ ভালই করেছ।"

নবদ্বীপ বললে, "ভাল, না, ছাই! আমার ভাগনেটা ভাত-টাত খেতে পারত না, এখন দু বেলায় আধ সের চাল বেমালুম উড়িয়ে দিচ্ছে।"

তারিণী বললে, "তুইও লেগে পড় না! গায়ে গতরে একটু মাংস লাগবে।"

"সে কি আর জিজ্ঞাসা করিনি ভেবেছ? আমাকে বলেছে নেবে না।"

"কেন?"

"জানি না। ওই ওকেই জিজ্ঞাসা কর।"

জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হল না। কার্তিক বললে, "ধেৎ, ও যে গাঁজা খায়!"

নবদ্বীপ বললে, "ওই শোন!"

বলেই সে কথাটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। বললে, "দেখা হল রাখহরির সংগে। শঙ্করের ওপর কী রাগ! বলে, ওই ছোঁড়াটাকে গাঁ থেকে যদি না তাড়াই ত আমার নাম রাখহরি নয়। আর কী বললে জান? বললে, তারিণী কিছু করতে পারবে না, যদি কিছু করি ত আমিই করব।"

তারিণী বললে, "ও সব করবে! পাঁচ বছর ধরে একটা ইস্কুল করতে পারেনি।"

শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমরা বরং সেই চেষ্টা করলে পারতে। জল কাদা ভেঙে ক্রোশখানেক দূরে কামারহাটিতে ছেলেরা যেতে চায় না।"

শঙ্কর বললে, "তার আগে আমাদের প্রোগ্রাম একটা রাস্তা তৈরি করা।"

তারিণী বললে, "তার অনেক খরচ, অনেক হাঙ্গামা, সে তোমরা পারবে না।"

শঙ্কর বললে, "আপনি একটু দয়া করবেন, তা হলেই পারব।"

সত্যি সত্যিই রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয়ে গেল।

গ্রাম থেকে সোজা একটি রাস্তা শহরের রাস্তায় গিয়ে মিশবে। দড়ি ধরে মাপজোক করে তার প্রাথমিক আয়োজন শেষ হতে দেরি হল না। সারা গ্রামের ছেলেছোকরার দল সমবেত হল শক্তিকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে। সারি দিয়ে দাঁড়াল তারা। হাতজোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, শপথবাক্য উচ্চারণ করলে, তারপর প্রতিজ্ঞাপত্র সই করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই বিরাট কর্মযজ্ঞে। দুঃসাধ্য-সাধন-রত গ্রহণ করেছে তারা। ভগবান শক্তি দাও!

চমৎকার একটি গান রচনা করে দিয়েছে শঙ্কর। সেই গান গেয়ে গেয়ে তারা কাজ করতে লাগল।

নিতান্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বাদ গেল না। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে শিশু-বাহিনী। ছোট ছোট বালতিতে জল নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রান্ত কর্মীদের মুখের কাছে তারা তুলে ধরছে পিপাসার জল।

জয়া সেদিন পুকুরের পাড়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এল এদের কাজ। বাড়িতে এসেই বললে,

"বাবা, দেখেছ?"

"কী দেখব?"

"ছেলেরা কেমন রাস্তা তৈরি করছে।"

রাখহরি বললে, "ও আর দেখতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝতে পেরেছ বাবা?"

রাখহরি বললে, "এখান থেকে চলে গিয়ে আমার মেলা ভেঙে দিয়ে যে বেআইনী কাজ ও করেছে তার জন্য ওকে আমি জেলে পুরে দিতে পারতাম তা ও জানে। এখনও সে ভয় ওর আছে। তাই লোক-দেখান একটা ভাল কাজের ছুতো করে লোক-জনকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, উদ্দেশ্য ওর মন্দ নয়।"

জয়া বললে, "তা হক বাবা, তবু দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

রাখহরি রাগ করে বললে, "তোরা দেখগে যা। কাঠবিড়ালী সাগর বাঁধছে! ও কিছু হবে না শেষ পর্যন্ত। এই আমি বলে রাখলাম।"

জয়া চলে যেতেই বিশ্বনাথ এল।

সেদিন পুকুরের পাড়ে একটা গাছের তলায়...

রাখহরির প্রতিবেশী বিশ্বনাথ। বললে, "বসে বসে ঘুমচ্ছ তুমি রাখহরি, এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল।"

রাখহরি হাসতে লাগল। বললে, "কী সর্বনাশ?"

বিশ্বনাথ বললে, "সারা গাঁয়ের সর্বনাশ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো কেউ বাপ-মায়ের কথা শুনছে না। কী জাদুমন্ত্রে যে ভুলিয়েছে ওই ছোঁড়াটা কে জানে! ওকে তুমি জব্দ করে দিতে পারছ না?"

রাখহরি বললে, "শুনেছি ওরা রাস্তা তৈরি করছে। তুমি দেখেছ?"

বিশ্বনাথ বললে, "দেখেছি মানে? এই ত সেখান থেকেই আসছি। তা বাহাদুরি আছে ছেলেগুলোর। রাস্তা অনেকখানি করে ফেলেছে।"

রাখহরি বললে, "দাঁড়াও না! রাস্তা যেদিক দিয়েই যাক, আমার জমির ওপর দিয়েই যেতে হবে। তারিণীর ছেলেটা সেদিন এসেছিল বলতে। দিক না একবার আমার জমিতে—"

কথাটা বিশ্বনাথ তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, "চারকুড়োর জমি কার? তোমারই ত?"

"হ্যাঁ আমার।"

"বাস, হয়ে গেছে।" বিশ্বনাথ বললে, "তোমার জমির ওপর দিয়েই নিয়ে গেছে রাস্তাটা।"

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "কতটা আন্দাজ গেছে?"

"তা দু হাত আড়াই হাত হবে। তোমার জমির আল-বরাবর।"

রাখহরি বললে, "আচ্ছা। তুমি এখন যাও, আমি দেখছি।"

পরের দিন সকালে কাজ করতে গিয়ে ছেলেরা থমকে দাঁড়াল। শঙ্কর, কার্তিক—দুজনে ছিল সবার আগে। দেখলে, তৈরি রাস্তা ভেঙে অনেকখানি জায়গা একেবারে ছই ছত্রাকার করে দেওয়া হয়েছে।

শঙ্কর কার্তিকের মুখের দিকে তাকালে। কার্তিক বললে, "আমি বুঝেছি এ কার কাজ। চললাম আমি, ওকে একবার দেখছি।"

কার্তিক চলে যাচ্ছিল, শঙ্কর তার হাতটা চেপে ধরলে।

"না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও শঙ্করদা। আমাদের এত কষ্টের তৈরি রাস্তা এমনি করে ভেঙে দেবে?"

শঙ্কর বললে, "ভাঙুক।"

"তুমি জান না শঙ্করদা, লোকটা শয়তানের একশেষ। তোমাকে না জানিয়ে সেদিন রাত্রে আমি ওর পায়ে ধরে বলে এসেছিলাম। বলেছিলাম, সবাই দিয়েছে, এইটুকু জমি আপনি ছেড়ে দিন। আমাকে ও নিজের মুখে বলেছিল—নাওগে। আর এখন কিনা আমাদের গড়া কাজ দিলে ভেঙে!"

শঙ্কর বললে, "ভাঙুক। আজ ভেঙেছে, কালও হয়ত ভাঙবে, কিন্তু পরশু আর ভাঙতে পারবে না। হাত কাঁপবে। ওরা ভাঙুক। আমরা গড়ে যাই। দেখি শেষ পর্যন্ত কে জেতে!"

কার্তিক বললে, "রাখহরিকে কিছু বলব না?"

শঙ্কর বললে, "বলবি দেখা হলে। বলবি, এ রাস্তা একা আমাদের নয়, আপনারও। এরকম করে ভাঙবার হুকুম আপনি দিলেন কেমন করে তাই ভাবছি।"

কার্তিক বললে, "ধেৎ, অত মোলায়েম করে বললে কোন কাজই হবে না।"

শঙ্কর বললে, "হবে। ও'র একটা ছেলে যদি আমাদের সঙ্গে থাকত, তা হলে বোধ হয় একাজ উনি করতে পারতেন না।"

কার্তিক বললে, "ওর ছেলেই নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটা ধাড়ী মেয়ে—জয়া।"

কিন্তু ছেলে যার আছে, সে কী করলে? কার্তিকের বাবা তারিণীশঙ্কর সেদিন বসেছিল তার বাইরের ঘরে।

নবদ্বীপ বললে, "রাস্তাটা বাবু মন্দ করছে না। এ'টের ওপর কাপড় তুলে জলে-কাদায় এবার আর গপাং গপাং করে যেতে হবে না। ছোঁড়ারা কাজটা ভালই করছে, না, কী বল?"

তারিণীশঙ্কর বললে, "করবেই ত!" পুত্র-গর্বে একটু গর্বিত হল। বললে, "কেতো যে-কাজে হাত দেয় সে-কাজ ও শেষ না করে ছাড়ে না।"

বলতে বলতেই কার্তিক ঘরে ঢুকল। বললে, "বাবা, দখিন মাঠে আমাদের যে জমি আছে, এবার তার ওপর দিয়ে রাস্তাটা যাবে কিন্তু।"

নবদ্বীপ বললে, "বেশ ত। যাক না।"

তারিণী তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, "তুই থাম।"

"থামলাম।" বলে নবদ্বীপ চুপ করে রইল।

তারিণী এইবার কার্তিককে নিয়ে পড়ল। বললে, "তুই কী রকম ছেলে রে? নিজের ক্ষতি নিজে করবি? তুই ত দলের চাঁই, তোর কথা সবাই শুনবে। রাস্তাটা রাখহরির জমির ওপর দিয়ে নিয়ে যা।"

কার্তিক বললে, "ওর জমি যতটা নেবার নিয়েছি বাবা। রাস্তাটা সোজা নিয়ে যেতে হবে ত!"

"তার কি কোনও বাঁধাধরা নিয়ম আছে নাকি? বেঁকেই না হয় গেলি?"

কার্তিক এবার বোধ হয় রাগ করলে। বললে, "তার মানে—জমি তুমি দেবে না?"

তারিণী বললে, "না, ও-জমি আমি দেব না। জলার ধারের ও-জমি আমার ডাকলে সাড়া দেয়। বেঁকে যেতে না পার, রাস্তা তৈরি বন্ধ করে দাও।"

বিদূষক নবদ্বীপ বলে উঠল, "সেই ভাল। বন্ধ করে দাও। চিরদিন আমরা জলে কাদায় হেঁটেছি বাবা, এখনও হাঁটব।"

"তুমি থাম।" বলে রেগেই চলে গেল কার্তিক।

নবদ্বীপ বললে, "রেগে গেল যে?"

তারিণী বললে, "তা যাক।"

ওদিকে আর-এক সমস্যা। বেলমার ডাঙা থেকে কাঁকর আর পাথর আনতে হবে। গরুর গাড়ি চাই।

ময়নাবুনির প্রত্যেকটি মানুষ চাষী গৃহস্থ। এক-আধখানা বাড়ি ছাড়া প্রায় সব বাড়িতেই গরুও আছে, গাড়িও আছে। আর প্রত্যেক বাড়ির ছেলে আছে শঙ্করের দলে। সবাই 'শক্তি কেন্দ্র'র সদস্য। গরুর গাড়ির অভাব হল না। তিরিশ জোড়া গরুর গাড়ি বেরিয়ে এল ময়নাবুনির রাস্তায়।

কাজ বন্ধ রইল দুদিন। শঙ্কর আর কার্তিক দুজনেই সেই গরুর গাড়ি চড়ে বেলমা গেল। বেলমার ডাঙার যিনি মালিক তাঁর অনুমতি চাই।

অনুমতি পেতে দেরি হল না। কাঁকর-পাথরের প্রকাণ্ড ডাঙা। ডাঙার মালিক বৃদ্ধ শশধরবাবু তখন শুনেছেন যে, ময়না-বুনির ছেলেরা একজোট হয়ে নিজেরাই রাস্তা তৈরি করছে। শঙ্কর আর কার্তিকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "এইত চাই! কাঁকর পাথর আমি নিশ্চয়ই দেব, কিন্তু দড়ি ধরে মেপে কেটে নিতে হবে বাবা। এলোপাথাড়ি যেখানে-সেখানে গর্ত করে নিলে চলবে না। গাড়ি ত আনছ অনেক, কিন্তু কাটবার লোক কোথায়?"
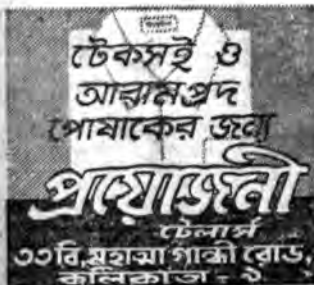
শঙ্কর বললে, "আপনি দেবেন।"

হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি।—"আরে, আরে, এ বলে কী? আমি দেব?"

কার্তিক বললে, "এইটুকু সাহায্য আপনি করুন আমাদের। তারপর আপনার কী উপকার করতে হবে বলবেন। আমরা সবাই মিলে এসে করে দিয়ে যাব।"

"উপকার?" শশধরবাবু বললেন, "রাস্তা তৈরি শেষ হলে আমাকে জানিও। তোমাদের সবাইকার নেমন্তন্ন রইল। পেট ভরে একদিন খেয়ে যাবে আমার বাড়িতে। তা হলেই আমার উপকার করা হবে।"

চমৎকার মানুষ শশধরবাবু। নিজের খরচে গাড়ির পর গাড়ি কাঁকর পাথর বোঝাই করে দিতে লাগলেন।

এমন একদিন নয়।

দিনের পর দিন।

আর এদিকে তারিণীশঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে বসেছে—জমি সে কিছুতেই দেবে না।

শঙ্কর বললে, "জমি যখন উনি কিছুতেই দেবেন না, তখন আমরা যদি তাঁর অমতেই রাস্তাটা সোজা ওই জমির ওপর দিয়েই নিয়ে যাই, কী হয়?"

কার্তিক বললে, "তুমি চেনো না আমার বাবাকে, তাই একথা বলছ।"

শঙ্কর বললে, "কেন? উনি কি তোর নামে মামলা করবেন, না, রাস্তাটা ভেঙে দেবেন?"

"না, মামলাও করবে না, রাস্তাও ভাঙবে না, জমির শোকে আমার মাথা ভাঙবে, নয়ত নিজের মাথাটাই ভেঙে ফেলবে।"

শঙ্কর বললে, "তা হলে কি রাস্তাটা বেঁকিয়ে নিয়ে যাব হরি মোড়লের জমির ওপর দিয়ে?"

কার্তিক বললে, "না, তা হয় না। রাখহরি আমাদের গায়ে থুতু দেবে। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমাদের।"

"তা হলে উপায়?"

কার্তিক বললে, "উপায় একটা আছে। বাবাকে আমি চিনি। টাকা দিয়ে জমিটা কিনে নেব বাবার কাছ থেকে।"

"টাকা পাবি কোথায়? এখন উনি আমাদের গরজ বুঝে বেশী টাকা চাইবেন।"

"যত বেশীই চান—এক হাজার টাকার বেশী হবে না।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "হাজার টাকা আছে তোর?"

"তার চেয়েও কিছু বেশী আছে। গড়-গড়ির মেলায় আমি জুয়ার কারবারে লাভ করেছি আড়াই হাজার টাকা।"

কার্তিক বললে, "গাঁয়ের লোকের টাকা গাঁয়ের কাজে লেগে যাক।"

শেষ পর্যন্ত তাই হল।

কিন্তু হল একটু অভিনব উপায়ে।

তারিণীশঙ্কর কী যেন লিখছিল বসে বসে। সুমুখে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল।

ঘরে ঢুকল শঙ্কর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

মুখ তুলে শঙ্করকে দেখেই তারিণী বলে উঠল, "জানি তুমি কী জন্যে এসেছ। ও-জমি আমি দেব না। কেতোকে ত আমি বলে দিয়েছি। আমার মুখে দু কথা নেই। এতে তোমাদের রাস্তা হক আর না-হক।"

শঙ্কর বসল সুমুখের মোড়াটা টেনে নিয়ে। বসতে বসতে জোরের সঙ্গেই বললে, "আজ্ঞে না, রাস্তা আমাদের হবেই।"

কথাটা শুনে তারিণী আনন্দিত হল। বললে, "বুঝেছি। তা হলে রাখহরির জমির ওপর দিয়েই রাস্তাটা নিয়ে যাবে ঠিক করলে? ভাল, ভাল। ও পরামর্শ আমি দিয়েছি। বেশ চ্যাটালো করে নিয়ে যাবে। যাক না একটু বেঁকে। রাস্তা ত!"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না, বেঁকে যাবে না। রাস্তা সোজাই যাবে। আমরা ঠিক করেছি—আপনার জমির যা দাম হয়, আমরা দিয়ে দেব।"

তারিণী একটু বিস্মিত হল কথাটা শুনে। বিস্মিত হবার কথাই। কেতোর মুখে শুনেছে তাদের টাকা নেই, এমনকি কাঁকর পাথর কাটাইয়ের খরচের জন্যে বেলমার শশধরের হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে এসেছে তারা—সে-কথাও তার কানে এসেছে।

তারিণী ভাল করে তাকালে শঙ্করের দিকে। কথাটা শুনেছে ত ঠিক?

"দাম দিয়ে দেবে? ওই জমির? পারবে কেন হে? ও-জমি আমার সবচেয়ে সরেস জমি—ডাকলে কথা কয়। ওর দাম তোমরা দিতে পারবে কেন?"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "দাম কত হবে?"

তারিণী একটু ভাবলে। ভেবে বললে, "কেতোর মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে যেন যে-কটা মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তাটা তোমরা নিয়ে যাচ্ছ, সব মিলিয়ে বিঘে-দুইয়েক হবে। তা এই দু বিঘের দাম আমি একটি হাজার টাকার এক পয়সা কম নেব না।"

কথাটা শোনামাত্র শঙ্কর তার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে গুণতে লাগল।

এতগুলো নোট শঙ্করের হাতে দেখে তারিণীর চোখ ত ছানাবড়া!—"এত এত টাকা কোথায় পেলে হে? চুরি ডাকাতি করলে নাকি কোথাও?"

সে-কথায় কানই দিলে না শঙ্কর। গোনা শেষ করে নোটের তাড়াটা তারিনীর হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, "গুনে নিন।"

তারিণী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল ঠিক মনে করতে পারলে না। একটি হাজার টাকা নগদ। যে-জমিটার উপর ছোঁড়ারা দড়ি ফেলছে সেটা দু বিঘে ত হবেই না, তা ছাড়া ও-জমিতে ধানও ভাল হয় না। তারিণী নোটের তাড়াটা বেশ করে ঠুকে ঠুকে সমান করে নিয়ে কাঠের হাত-বাক্সটার উপর নামালে, তারপর বাঁ হাত দিয়ে চেপে, ডান হাতের আঙুলে থুতু লাগিয়ে, সে এক অদ্ভুত উপায়ে পট্ পট্ শব্দ করতে করতে নিমেষের মধ্যে গুণে ফেললে নোটগুলো। একখানা নোট তাড়া থেকে টেনে বের করে লণ্ঠনের আলোয় তুলে ধরে দেখলে, নকল কিংবা অচল কিনা! কিন্তু এই এতগুলো নোটের ভিতর মাত্র একখানা নোট দেখলে চলবে না। তাসের মত আঙুল দিয়ে ফর ফর করে উল্টে যেতেই হঠাৎ তার নজর পড়ল একখানা নোটের উপর। টেনে সেই নোটখানা বের করে আবার আলোর সামনে তুলে ধরলে তারিণীশঙ্কর। দেখলে, তার সাদা অংশে টকটকে লাল কালিতে লেখা : রাখহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। নোটখানা চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ নোটগুলো তোমরা কোথায় পেলে বলতে হবে।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না, ও-কথাটা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।"

"কেন হে? তোমরা আমার ছেলের মত, তা ছাড়া টাকা বলে কথা। জিজ্ঞাসা করব না?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। বারণ আছে।"

তারিণী এবার যেন লাফিয়ে উঠল, "বারণ আছে? তা হলে ত শুনতেই হবে।"

শঙ্কর কিছুতেই বলতে চায় না।—"আজ্ঞে না, শুনে কাজ নেই। শেষকালে যদি চটে যান!"

"না না চটব না। তুমি বল।"

শঙ্কর বললে, "কথাগুলো যে ভাল নয়! এই যেমন ধরুন, আপনি চামার, আপনি ছোটলোক, আপনি কেপ্পন, আপনি জোচ্চোর,—কী নন আপনি?"

কথাগুলো শ্রুতিমধুরও নয়, প্রীতিকরও নয়, তবু শুনলে তারিণী। শুনতে শুনতেই মুখের চেহারা তার অন্যরকম হয়ে গেল। রাগে তার শরীরটা মনে হল যেন কাঁপছে। বললে, "কে বলেছে এই সব কথা?"

"এই দেখুন, আপনি চটে যাচ্ছেন! এই জন্যেই আমি বলতে চাইনি।"

তারিণী জেদ ধরে বসল : "না, তোমাকে বলতেই হবে। বল কে বলেছে।"

শংকর এতক্ষণ পরে বললে, "বলেছেন রাখহরিবাবু।"

তারিণী চিৎকার করে উঠল, "রেখো বলেছে?"

শংকর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছে। আরও যে-সব কথা বলেছে—সেগুলো মুখে উচ্চারণ করা যায় না। কানে আঙুল দিতে হয়। বলেছে—জমির দাম না পেলে ও চামার কখনও এক ছটাক জমি ছাড়বে না। এই বলে এই নোটগুলো আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, এবার ওই চামারটার মুখের ওপর এইগুলো ছুঁড়ে মেরে দাওগে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"ঠিক হওয়াচ্ছি!" বলেই নোটগুলো শংকরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তারিণী বললে, "ধর। তাই ত বলি, ও-হারামজাদা ছাড়া নোটের ওপর নাম কে লিখে রাখবে? নোটগুলো যেন ওর বাপ্‌তি সম্পত্তি। দেখ, তুমি এক্ষুনি চলে যাও ওর কাছে।"

শংকর বললে, "যাব?"

তারিণী বললে, "নিশ্চয় যাবে। গিয়ে ওই নোটগুলো রেখোর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে দেবে। তারপর যেরকমভাবে ও আমাকে গালাগালি দিয়েছে তার তিনগুণ গালাগালি ওকে শুনিয়ে দিয়ে বলবে—তারিণী মুখুজ্যে কখনও রেখোর টাকার তোয়াক্কা করে না। যাও।"

শংকর একটু বিপদে পড়ল। বললে, "যাচ্ছি। কিন্তু আপনার জমিটার কী হবে? টাকা ত উনি ওই জমির জন্যেই দিয়েছেন।"

তারিণী বললে, "তুমি আচ্ছা বোকা ত? টাকাগুলো ওর মুখের ওপর ফেলে দিয়ে ওকে শুনিয়ে দিয়ে আসবে—শুধু জমি কেন, তোমাদের ওই রাস্তা তৈরি করবার যাবতীয় যা কিছু খরচ—সব হাম দেগা। তারিণী মুখুজ্যে চুনো পুঁটি নেহি হ্যায়।"

শংকর খুশী হয়ে উঠে দাঁড়াল।—"আমি এক্ষুনি ওকে অপমান করে দিয়ে আসছি দেখুন। আমি জানি লোকটা ভাল নয়। নইলে দেখলেন না, আমি ওর কাছে দুটো দিন থাকতে পারলাম না! মেলাটা ভেঙে দিলাম।"

"এই সুযোগে তুমি তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।"

শংকর বললে, "ঠিক বলেছেন। কার্তিককে তখন বললাম, আমি যাব না লোকটার কাছে। কার্তিক কিছুতেই ছাড়লে না। বললে, "বাবা যখন জমিটা দেবেই না, তখন রাখহরির কাছে হাত আমাদের পাততেই হবে।"

তারিণী বললে, "কেতোটা ছোটলোক।"

ছোটলোক কেতো অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল তার বাপের কথাবার্তা। হাসি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না সে। যেই দেখলে শংকর উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কার্তিক একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

শংকর এসেই নোটের তাড়াটা তার হাতে দিয়ে বললে, "নে, রাখ।"

কার্তিক বললে, "খুব ভাল অভিনয় করেছ শংকরদা!"

শংকর বললে, "নোটের ওপর রাখহরির নামটা কী জন্যে লিখে রেখেছিলাম এখন বুঝতে পেরেছিস?"

"পেরেছি। এবার যাও একবার রাখহরির বাড়িতে। টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

শংকর বললে, "তোর টাকা। তুই যা।"

কার্তিক বললে, "যাব, যদি না আবার আমাদের রাস্তা ভাঙতে যায়!"

শংকর বললে, "এ কদিন যখন যায়নি, তখন আর বোধ হয় যাবে না।"

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই দিনই রাত্রে রাখহরির দলবল গিয়ে হাজির। দিন-পাঁচেক আগে যে-জায়গাটা তারা ভেঙে ফেলেছিল, গিয়ে দেখলে, সেটা আবার মেরামত করে নিয়েছে ছেলেরা। রাস্তাটা আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থেমেছে একেবারে তারিণীশংকরের জমির মাথায়। রাখহরি এবার নিজে যায়নি, বিশ্বনাথকে পাঠিয়েছে। বিশ্বনাথ তার ভাইকে সঙ্গে নিয়েছে। আর নিয়েছে দশজন মজুর। প্রত্যেকের হাতে গাঁইতি আর টাম্‌না। দুটি মাত্র লণ্ঠন। একটি বিশ্বনাথের হাতে, আর একটি তার ভাইয়ের হাতে।

বিশ্বনাথ তার হাতের লণ্ঠনটি তুলে ধরে মজুরদের হুকুম করলে, "ওই যে ছোট একটা গাছ রয়েছে রাস্তার ধারে, ওইখান পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে হবে।"

তার ভাই বললে, "দশজনের ভেতর তোরা ছজন গাঁইতি চালা, আর বাকী চারজন কাঁকর মাটি তুলে তুলে ওই মাঠের ওপর ছড়িয়ে দে।"

লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কেউ আর এগিয়ে গেল না।

বিশ্বনাথ বললে, "নে, তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তাড়াতাড়ি ভেঙে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যা।"

তবু কেউ যেতে চায় না!

"বুঝেছি। বেশী টাকা নেবার মতলব? আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা চেয়েছিলি, পঁচিশ টাকাই দেব।"

ডোমন্ বাগদী এগিয়ে গেল। গিয়েই ঝপ করে একটা জায়গায় হাতের গাঁইতিটা দিলে বসিয়ে।

বিশ্বনাথ বললে, "সাবাস! এই ত চাই!"

ডোমন আবার তার গাঁইতিটা তুলে ধরলে, কিন্তু তুলে ধরে আর নামাতে পারলে না।

"কী হল? মা-কালীর মতন হাতটা তুলেই রইলি যে।"

ডোমন চলে এল। "না বাবু, এ-কাজ পারব না। ভাল লাগছে না।"

বিশ্বনাথ বলে উঠল, "মাথা-পিছু পাঁচ টাকা করে দেব। নে, লাগা।"

কে একজন বলে উঠল, "ধেৎ! চল রে চল্!"

বিশ্বনাথ এবার এগিয়ে এল একটা লোকের কাছে। বললে, "পাঁচ টাকাতেও হাত উঠছে না?"

লোকটা বললে, "না বাবু, টাকার জন্যে নয়। আমরা পারব না। এ-কাজ আগে বললে আসতাম না আমরা।"

এই বলে একে একে সবাই চলে গেল।

বিশ্বনাথ আর তার ভাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় বাইরের অন্ধকারটা মনে হল যেন আরও জমাট বেঁধে রয়েছে। ঝিঁঝিঁপোকা আর ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে ক্রমাগত। দূরে গ্রামপ্রান্তে একটা কুকুর কেঁদে উঠল যেন। বিশ্রী কান্না। বিশ্বনাথের ভাই বললে, "চল দাদা, রাখুদাকে বলিগে, এখানে আর মিছেমিছি দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?"

বিশ্বনাথ বললে, "চল। কিন্তু এই ব্যাটা ছোটলোকদের কীরকম বাড় বেড়েছে দেখেছিস? মুখের ওপর বলে দিলে—পারব না!"

সংবাদের জন্য রাখহরি বোধ করি উদ্‌গ্রীব হয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করছিল। বিশ্বনাথকে আসতে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে "কী খবর?"

বিশ্বনাথ লণ্ঠনটা হাত থেকে নামিয়ে বসল একটা খাটের উপর। বললে, "উঁহু, ওদের দিয়ে হবে না। গেল দশটা টাকা।"

রাখহরি এই খবরটাই যেন শুনতে চাইছিল। হাসতে হাসতে বললে, "পারলে না?"

বিশ্বনাথ বললে, "না। ব্যাটারা পারব না বলে পালিয়ে গেল।"

"যাক্ গে। ওদের দিয়ে হবে না। ওটা উড়িয়ে দিতে হলে ডিনামাইট দরকার।"

বিশ্বনাথ বললে, "যা দরকার তাই কর।"

"তাই করব। তুমি এখন যাও। আমার কাজ আছে।"

জয়া বোধ হয় তার বাবাকে ডাকতে এসেছিল খাবার জন্যে। বিশ্বনাথ চলে যাবার পরেই সেও অন্ধকারে গা ঢেকে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। বাবাকে আর ডাকলে না।

ছি-ছি, ডিনামাইটের কথা তার বাবা ভাবছে কেমন করে? লোকটা তার মেলা

ভেঙে দিয়েছে। শঙ্করের উপর রাগ হবার কথাই। তারও রাগ হয়েছিল এখান থেকে না-বলে চলে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু মেলা ভেঙে দেবার পরেই যখন গ্রামের কলেরা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আর রাগ-অভিমান কিছু রইল না শঙ্করের উপর।

সাবান দিয়ে সেদিন মাথা ঘষেছিল জয়া। চুলগুলো শুকবার জন্যে ছাদে গিয়েছিল। আলসের কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নজর পড়ল রাস্তাটার দিকে। ত্রিশ-চল্লিশ জোড়া গরুর গাড়ি ক্রমাগত কাঁকর আর পাথর ফেলে চলছে। ওদিকে গ্রামের ছেলেরা কাজ করছে। গ্রামের মজুরও রয়েছে কিছু কিছু। মাটি কাটার কাজটা ছেলেরা হয়ত ঠিক পারে না। তাই জনমজুর লাগিয়েছে টাকা দিয়ে। কিন্তু নিঃসম্বল, টাকা কোথায় পেলে?

অনেক দূরে কাজ করছে তারা। তাল-পুকুরটা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। এত দূর থেকে মানুষগুলিকে ঠিক চেনা যায় না। জয়ার চোখ খুঁজছিল শুধু শঙ্করকে। হাজার মানুষের মাঝেও তাকে চিনতে ভুল করবে না জয়ার চোখ। ওই ত শঙ্কর। হাতাকাটা একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিজেও কাজ করছে ছেলেদের সঙ্গে। রাস্তা এগিয়ে চলেছে।

জয়ার চুল শুকিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তবু সে ছাত থেকে নামতে পারলে না। মেয়েদের নেয় না কেন? গ্রামে ত অনেক মেয়ে আছে—যারা শুধু ভাত রাঁধে আর পড়ে পড়ে ঘুমোয়। জয়া অজান্তেই শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ফেললে।

নীচে থেকে রাখহরি ডাকলে, "জয়া! চা হয়েছে?"

জয়া চমকে উঠল। এতক্ষণ নীচে নেমে গিয়ে চা তৈরি করা উচিত ছিল তার। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দেখলে, চাকরটা উনন ধরিয়ে জল গরম করছে।

চমৎকার দেখাচ্ছে জয়াকে। চুলগুলো পিঠের উপর ছড়ানো, আঁটসাঁট জামার উপর গাছকোমরবাঁধা রঙিন শাড়ি। বাবাকে তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিয়ে বললে, "বাবা, তুমি সেদিন বলছিলে ওদের রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তারিণী ওর জমির ওপর দিয়ে রাস্তাটা যেতে বোধ হয় দিলে না।"

রাখহরি বললে, "তারিণীকে আমি চিনি না? আমি দিলাম বলে তারিণী দেবে ওর জমি নষ্ট করতে? রাস্তার কাজ ত এখন বন্ধ আছে।"

"চা খেতে খেতে তুমি একবার আসবে আমার সঙ্গে?"

"কোথায়?"

"ছাতে।"

"চল।"

"কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বলছিলে..."

জয়া তার বাবাকে ছাতে নিয়ে গিয়ে আঙুল বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে বললে, "কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বলছিলে, দেখ।"

রাখহরি দেখলে, তারিণীর জমির উপর দিয়েই রাস্তাটা এগোচ্ছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিল রাখহরি।

জয়া বললে, "আর তুমি ভাবছ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবে।"

রাখহরি হঠাৎ যেন চমকে উঠল।—"তুই কোথায় শুনলি?"

জয়া বললে, "শুনেছি। তুমি একবার ভেঙে দিয়েছ, আবার ভেঙে দিতে চাও। এ-কথা সবাই জানবে, সবাই শুনবে।"

রাখহরি বললে, "না রে না, ও আমি এমনি বলেছিলাম বিশ্বনাথকে।"

"ফের যদি ওই কথা বলতে আসে বিশ্বনাথ ত আমি ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব বাবা, তুমি তখন আমাকে যেন কিছু বোল না।"

রাখহরি চুপ করে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। একটি কথাও বললে না।

চাকরটা ডাকলে, "দিদিমণি!"

"ওমা ওকে এখনও চা দিইনি।"

এই বলে খালি কাপ-ডিশটা রাখহরির হাত থেকে নিয়ে জয়া নীচে নেমে গেল।

সেদিন সকালে কাজে যাবার সময় ছেলেদের সোজা রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়ে শঙ্কর কার্তিককে বললে, "আয়, আমরা একটু ঘুরে যাই।"

"কোনদিকে ঘুরে যাবে?"

"আয় না তুই আমার সঙ্গে।"

বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখ দিয়ে গিয়ে, রসিক মোড়লের বাড়ির পাশ দিয়ে যেই বাঁ দিকের রাস্তায় পা দিয়েছে শঙ্কর, কার্তিকের বুঝতে বাকী রইল না কোনদিক দিয়ে সে যেতে চায়।

খানিকটা গিয়ে কার্তিক বেঁকে বসল। বললে, "তুমি একাই যাও, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কেন, তোর রাস্তা ত আর ভাঙেনি।"

"সুবিধে পায়নি তাই ভাঙেনি। একবার যে ভাঙতে পারে, আবার ভাঙতেই-বা তার কতক্ষণ!"

শঙ্কর বললে, "সেই জন্যেই যাচ্ছি ওই পথে। যদি দেখা হয় ত কী বলে শুনব।"

কার্তিক বললে, "দেখা যদি না হয়?"

"দেখা না হলে চলে যাব।"

কার্তিকের হঠাৎ মনে পড়ল জয়ার কথা। হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "জয়ার সঙ্গে দেখা হলে কী করবে? সে যদি ডাকে?"

এবার শঙ্কর একটু বিপদ পড়ে গেল। সেও মনে মনে সেই কামনাই করছিল। রাখহরির সঙ্গে দেখা হক তা সে চায় না। সেও চায় জয়াকে একটিবার দেখতে। আর সেই জন্যই তার এ-পথে আসা।

কিন্তু মানুষ যা চায় সব 'সময়' তা হয় না।

রাখহরির বাড়িটা তার পার হয়ে চলে গেল। কারও সঙ্গেই দেখা হল না।

হঠাৎ পেছনে ডাক শুনে থমকে থামল শঙ্কর।

কার্তিক বললে, "তোমাকে ডাকছে, যাও।"

শঙ্কর দেখলে বাইরের দিকের ছোট ছাতটার উপর রাখহরি দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "শোন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

কার্তিক আবার বললে, "যাও, শুনে এস।"

"তুই যাবি না?"

"না।" কার্তিক চুপি চুপি বললে, "অমনি তোমার জয়াকে দেখে এস।"

শঙ্কর হেসে তার গায়ে একটা চড় মেরে বললে, "যাঃ!"

শঙ্কর ভেবেছিল রাখহরি তাকে মেলা ভাঙার কথা কিছু বলবে। হয়ত বা তিরস্কার করবে। কিন্তু কিছুই সে করলে না। সাদরে অভ্যর্থনা করে বললে, "বোস।"

শঙ্কর বসতে বসতে বললে, "একটু তাড়াতাড়ি বলুন। কাজ আছে।"

রাখহরি বললে, "আমার বাড়ি একটু বসলেও কি তারিণী চটে যাবে?"

শঙ্কর দেখলে এই সুযোগ। বললে, "আজ্ঞে না। আপনাদের দুজনের ভেতরে ভেতরে যে এত রেশারেশি তা জানতাম না। যাকগে ও-সব কথা থাক, এখন বলুন, মেলাটা ভেঙে দিয়ে আমি ভাল কাজ কাজ করেছি কিনা। কলেরা একদম থেমে গেছে।"

রাখহরি বললে, "সে-কথা বলবার জন্যে আমি তোমাকে ডাকিনি। আমি জিজ্ঞাসা করছি—এই যে তোমরা রাস্তা তৈরি করছ, এত এত গাড়ি, এত এত কুলি মজুর টাকা পয়সা পাচ্ছ কোথায়?"

"এই দেখুন, আবার সেই কথা এসে পড়ল।"

শঙ্কর বললে, "সেদিন একটা চাঁদার খাতা তৈরি করেছিলাম। ভেবেছিলাম কিছু চাঁদা তুলে খরচ চালাব। খাতার প্রথমেই লিখেছিলাম আপনার নাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারিনি। তারিণীবাবুর কাছে খাতাটা নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আগে আপনি কিছু চাঁদা দিন।' খাতার পাতাটা উলটেই তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন!"

"কেন?"

শঙ্কর বললে, "ওই যে আপনার নাম লিখেছিলাম সবার ওপরে। তারিণীবাবু খচাং করে আপনার নামটা কেটে দিলেন।"

রাখহরির মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর?"

শঙ্কর বললে, "তারপর আর না শোনাই ভাল। বললেন, খাতাটাই বরবাদ হয়ে গেল। রেখোটা চামার ছোটলোক, জোচ্চোর—"

জিব কেটে শঙ্কর বললে, "এ-হে-হে-হে, আপনাকে এ-সব কথা বলা আমার অন্যায় হচ্ছে।"

রাখহরি বললে, "না না অন্যায় হয়নি। তুমি বল। আমি শুনব।"

শঙ্কর বললে, "সেসব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবেও না, সব কথা গুছিয়েও বলতে পারব না। বললেন, কোন ভাল কাজের জন্যে ও-ছোটলোকের কাছ থেকে তোমরা একটা আধলা পয়সাও বের করতে পারবে না, এই না বলে খাতার ওপরে আপনার নামটা যেখানে ছিল, সেইখানে চড় চড় করে নিজের নামটা লিখে বাকী সব নাম দিলেন কেটে। বললেন, কারও কাছে যেতে হবে না। তারিণী মুখুজ্যে বেঁচে থাকতে কেপ্পন কঞ্জুষ রাখহরির কাছে ভিক্ষে চাইতে হবে না। তোমাদের রাস্তা তৈরির সব খরচ আমি দেব।"

রাখহরি হেঁটমুখে চুপ করে সব শুনলে, তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালে শঙ্করের দিকে। বললে, "হুঁ। তারিণী বলেছে, আমি কৃপণ, কঞ্জুষ, আমি ছোট-লোক, আমি চামার! কোন ভাল কাজে আমি একটা আধলা পয়সাও দেব না।"

শঙ্কর বললে, "এই দেখুন, আপনি চটে যাচ্ছেন।"

রাখহরি হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। বললে, "হ্যাঁ, চটছি, নিশ্চয়ই চটছি। দেখ, তোমার ওই চামার ছোটলোক তারিণী মুখুজ্জোকে বলে দিও—না থাক। কিছু বলতে হবে না। তোমাকে পেয়েছে একটা কাজের লোক, তাই এ-সুযোগ ও হাতছাড়া করতে চায় না। কিছু টাকা খরচ করে তোমাদের দিয়ে ওই রাস্তাটা তৈরি করিয়ে নিয়ে খুব ঘটা করে একটা মিটিং করবে, সেই মিটিং-এর সভাপতি হবে এস ডি ও, আর না-হয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সেইখানে তোমাকে দিয়ে বলাবে—যে কাজ রাখহরি ঘোষাল করতে পারেনি, সেই কাজ তারিণী মুখুজ্যে কারও কোন সাহায্য না নিয়েই করে ফেললেন। জনহিতকর কাজের জন্যে এত বড় স্বার্থত্যাগ, এ-রকম বদান্যতা—এই রকম সব বড় বড় কথা বলিয়ে রায়-বাহাদুর, নয়ত রায়সাহেব হবার মতলব। ও-সব আমি বুঝি।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। এখন রায়-বাহাদুর, রায়সাহেব নেই, এখন দিশী খেতাব চলবে।"

"ওই একই কথা। দেখ, তুমিই না বলেছিলে—গাঁয়ে ভাল ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, বিনা চিকিৎসায় লোক মরে যায়—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে-কথা আমাকে বলতে হবে কেন, আপনি সবই ত জানেন।"

"জানি, সবই জানি।" রাখহরি বেশ দম্ভের সঙ্গেই বললে, "এবার ওই চামারটাকে ভাল করে জানিয়ে দেব—রাখহরি ঘোষাল ভাল কাজে খরচ করতে জানে। বলি ও হতভাগা তেরো, গ্রামের সব লোক যদি চিকিচ্ছে অভাবে মরেই যায় ত তোর ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে কে? শোন, তোমাদের ওই রাস্তার ধারে আমার বিঘে-দশেক জায়গা আছে, ওইখানে আমি একটা ডাক্তারখানা—মানে হাসপাতাল করে দেব। তারিণী মুখুজ্যেকে দেখিয়ে দেব—রাখহরি ঘোষাল ভাল কাজে খরচ করতে পারে। রাখহরি ওর মতন মুখ্যু নয়।"

তারিণীর কানে গিয়ে কথাটা উঠল। শুনলে রাখহরি তাকে নাকি মুর্খ বলেছে।

রাখহরির এক পিসেমশাই ছিলেন বর্ধমানের উকিল। তাঁরই বাড়িতে থেকে রাখহরি বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল। এই তার অহঙ্কার। গ্রামের মধ্যে কলেজে-পড়া লোক একমাত্র রাখহরি। তার উপর বাঁকুড়ায় মামার বাড়িতে থেকে মেয়েটা তার আই এ পাস করেছে।

সেদিক দিয়ে তারিণীর কিন্তু অহঙ্কার করবার কিছু নেই। নিজে যদি-বা ঘরের খেয়ে বেলুমার ইস্কুলে পড়েছিল কিছুদিন, ছেলে কার্তিক আবার ইংরেজীতে নামটা পর্যন্ত সই করতে পারে না।

তারিণীর রাগ হল শুধু শঙ্করের কাছে কথাটা ফাঁস হয়ে গেল বলে। শুনে অবধি সে চেঁচাতে লাগল, "ওরে হতভাগা রেখো, গাঁসুদ্ধ সবাই ত মুখ্যু। পারিস সেই মুখ্যুদের লেখাপড়া শেখাতে? সে-কাজ রাখহরির হিম্মতে হবে না। হয় যদি ত হবে এই তারিণী মুখুজ্জোর পয়সায়। তা হলে শোন শঙ্কর, ছেলেদের ইস্কুল একটা আমাদের গাঁয়ে হবেই। আমি করব একটা মেয়েদের ইস্কুল। তুমি যেখানে রয়েছ, আমার ওই বাগানবাড়ির পাশে একতলা যে-বাড়িটায় আজকাল আমার খামারবাড়ি, ওই বাড়িটা মেরামত করিয়ে রঙচঙ করে দিলেই ত বাস, ফাস্টক্লাস ইস্কুল হয়ে যাবে। লাগাও তুমি এই কাজ। রাস্তাও তৈরি হক, ওটাও চলুক।"

কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, রাখহরি সত্যি-সত্যিই কাজ আরম্ভ করে দিলে তার ডাক্তারখানার। উত্তর দিক থেকে গ্রামে ঢুকতেই নতুন যে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তারই পাশে ভিত খোঁড়া হল। ভিত খোঁড়ার দিন সামান্য একটুখানি আয়োজন করেছিল রাখহরি। একজন পুরোহিত এল ভিত-পুজো করবার জন্যে। জনগণের কল্যাণ-কামনায় উৎসর্গ করা হল এই দাতব্য চিকিৎসালয়। রাখহরির মৃতা স্ত্রীর নামে নাম দেওয়া হল সরোজিনী সেবা সদন।

জয়ার আজ আনন্দের সীমা নেই। লাল চওড়া পাড় গরদের শাড়ি পরেছে। মাথার চুল খোলা। সর্ব অঙ্গে তার শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতা।

কার্তিক আছে রাস্তার কাজে। শঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছে এইখানে। জয়া আজ শঙ্করের পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছে—এই-তেই তার আনন্দ।

পুজো শেষ হল। জয়া শাঁখ বাজালে।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। জয়া হাসতে হাসতে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর বললে, "আজ তোমাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছে। বেশ কেমন দেবদাসী-দেবদাসী মনে হচ্ছে!"

জয়া বললে, "রক্ষে করুন! মানুষের দাসী হতে পারি না, দেবতার দাসী! কী যে বলেন!"

"না না সত্যি বলছি, কেমন যেন পূজারিণী পূজারিণী ভাব।

জয়া বললে, "যাক, আপনাকে আর সত্যি বলতে হবে না। আপনি মিথ্যের রাজা।"

শঙ্কর ভাবলে, জয়া রসিকতা করছে। সেও তেমনি হাসতে হাসতে বললে "যাক, আজ একটা নতুন কথা শুনলাম।"

জয়া বললে, "আজ আপনাকে একটি প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে। করব? নেবেন আমার প্রণাম?"

"বাঃ রে, মিথ্যের রাজাকে প্রণাম করবে?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ, করব। মিথ্যে দিয়ে আপনি একটা কাজের মত কাজ করেছেন। কার্তিকের বাবাকেও বুঝি এমনি করে তাতিয়েছেন?"

শঙ্কর এবার হাসতে গিয়েও হাসতে পারলে না। বুদ্ধিমতী এই মেয়েটির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

জয়া বললে, "না ও-রকম করে তাকাবেন না। ও-চাউনি আমি সহ্য করতে পারি না।" বলেই সে মাথা নামিয়ে চট করে পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করলে শঙ্করকে।

মাথার চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুখের উপর, হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে জয়া উঠে দাঁড়াল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এ-সব জানলে কেমন করে?"

জয়া বললে, "বাবার মনটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম, তারপর আপনি এসে কাজ হাসিল করে ফেললেন।"

রাখহরিকে সেইদিকে আসতে দেখে শঙ্কর চুপিচুপি বললে, "চুপ। তোমার বাবা আসছেন।"

রাখহরি ডাকলে, "শঙ্কর, এইবার ডাক তোমার ছেলেদের। খাবার হয়ে গেছে। খেয়ে নিক।"

জয়া শঙ্করের কাছ থেকে সরে গেল না তার বাবাকে দেখে। বরং দিব্য সহজ কণ্ঠে বললে, "আপনাকে ডাকতে হবে না, আমি ডাকি।"

শঙ্কর বলে উঠল, "তুমি ডাকবে কেন?"

জয়া বললে, "গ্রামের ছেলেরা রাখহরির বাড়িতে খিচুড়ি মাংস খেয়ে এল—তারিণীবাবুর কাছে এইটেই সাংঘাতিক খবর। তার ওপর আপনি নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ালেন—এ-বদনাম আপনার হয় কেন? আমিই ডাকি।"

বলেই সে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে দাঁড়াল, বাবা না শুনতে পায় এমনিভাবে চুপিচুপি বললে, "কী মিথ্যে দিয়ে তারিণীবাবুর কাছে এইটেকে চাপা দেবেন ভেবে ঠিক করে নিন।"

জয়া যা বলেছিল ঠিক তাই হল।

হাসপাতাল না ছাই, ওষুধ বিক্রি করে লাভ করবার মতলবে রাখহরি ছোট একটা ডাক্তারখানা করবে হয়ত। তারই ভিত খোঁড়া হল। তা হক। তাই বলে রাস্তা তৈরি করছে গ্রামের যে-সব ছেলে, তারা গিয়ে রাখহরির বাড়িতে পাতা পেতে খিচুড়ি আর মাংস খেয়ে এল—সে আবার কী রকম কথা? শঙ্কর রাজি হল কেমন করে?

নবদ্বীপ বললে, "আমি দাঁড়িয়েছিলাম তালপুকুরের কাছে। তা আমাকে একবার ডাকলেও না। মাংসটা খুব ভাল হয়েছিল, আবার শুনছি নাকি এক-একজনে এই এত-এত—"

শুনতে রাখহরির ভাল লাগছিল না। কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেতো খেয়েছে?"

নবদ্বীপ বললে, "না না, কার্তিক খাবে না রাখহরির বাড়িতে। তাই খেতে পারে কখনও?"

"কেন পারে না? হ্যাঁ বাবা, আমি খেয়েছি, শঙ্করদা খেয়েছে।"

বলতে বলতে কার্তিক এসে দাঁড়াল।

নবদ্বীপ বললে, "এই দেখ, একা তাহলে আমিই বাদ পড়লাম।"

শঙ্কর এল হাসতে হাসতে। বললে, "না, তুমি বাদ পড়বে না। এবার যেদিন পোলাও-মাংস খাওয়াবে সেই দিন তোমাকে ডাকব। যাও দেখি তুমি এখান থেকে, একটু সরে যাও। আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে।"

এই বলে নবদ্বীপকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে শঙ্কর বললে, "বাছাধন এবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাখহরি ভেবেছে, রাস্তাটা তৈরি করিয়ে আপনি সরকার থেকে একটা খেতাব-টেতাব পেয়ে যাবেন। কাজেই সেও একটা কিছু করতে চায়।"

"কী করবে?"

"বলছে ত—হাসপাতাল করব।"

তারিণী বললে, "হাসপাতাল করবার টাকা আছে?"

শঙ্কর বললে, "তা আমি কেমন করে বলব বলুন!"

তারিণী বললে, "কয়েক পাঁজা পোড়ানো ইঁট ওর আছে, শহর থেকে নাহয় সিমেণ্ট আনলে, লোহা আনলে, রাজমিস্ত্রী আনলে, —বিল্ডিং না হয় হল। কিন্তু শুধু বিল্ডিং হলেই ত হবে না।"

"আজ্ঞে না, ওষুধপত্র চাই, ডাক্তার চাই, নার্স চাই—"

"মাসে মাসে কমপক্ষে—"

"পাঁচ হাজার টাকা ত চাইই।"

তারিণী বললে, "ওই টাকা ও খরচ করে যেতে পারবে?"

শঙ্কর বললে, "সরকারী সাহায্য ছাড়া এ-সব কাজ হয় না। আর নাহয় একসঙ্গে লাখ পাঁচেক টাকা কি লাখ-দশেক টাকা যদি সরকারের হাতে তুলে দেয়, তা হলে হতে পারে।"

তারিণী বললে, "ব্যাটা মরেছে।"

শঙ্কর বললে, "ওই জন্যেই ত যখন বললে—তোমাদের খাওয়াব, তখন আর বাধা দিলাম না। দু-দুটো বড় বড় খাসি কাটলে। ভাবলাম, ওর যত খরচ হয় ততই ভাল।"

তারিণী খুব খুশী হল। বললে, "যত পার দাও খসিয়ে।"

শঙ্কর বললে, "আপনার ত একবার খরচ করে দিলেই বাস্, আর খরচ করতে হবে না। আপনি শুধু দেখুন বসে বসে।"

তারিণী জিজ্ঞাসা করলে, "আমার ইস্কুলের কী হল? মেয়েদের ইস্কুল?"

শঙ্কর বললে, "ভেবে দেখলাম ও-সব হবে না।"

"কেন হবে না? রাখহরি যে আমাকে মুখখু বলেছে!"

"বলুক মুখখু।" শঙ্কর বললে, "কে মুখখু দুদিন পরে বুঝতে পারবেন। রাখহরিবাবু হাসপাতাল করছেন, হাসপাতালে রুগীর অভাব হবে না। আর বেশী রুগী হওয়া মানেই বেশি খরচ।"

তারিণী বললে, "আমার ইস্কুলে ছাত্রীর অভাব হবে না। আর বেশী ছাত্রী মানেই বেশী ইনকাম।"

শঙ্কর হেসে উঠল। বললে, "তার আগে ভেবে দেখুন—সব মেয়েরা ইস্কুলে আসবে না। যারা আসবে তারা অ আ ক খ জানে না। তাদের নিয়ে ইস্কুল খোলা চলে না। বড়জোর প্রাইমারি পাঠশালা একটা খুলতে পারেন।"

"তাও ত বটে!"

তারিণী বললে, "এ-কথা ত আমি ভাবিনি।"

"কাজেই সে-কথা এখন ভাবতে হবে না। আপনি রাস্তাটা আগে শেষ করুন। শহরের সঙ্গে এই গ্রামের যোগাযোগটা সহজ হয়ে যাক, তখন দেখবেন আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তারিণীর মনের মধ্যে কিন্তু একটা কথা খিচ্ খিচ্ করতে লাগল।—রাস্তার আগে রাখহরির ডাক্তারখানাটা যদি শেষ হয়ে যায়, আমার মাথাটা কিন্তু তা হলে হেঁট হয়ে যাবে।

শঙ্কর বললে, "ও'র ডাক্তারখানার ডাক্তার ত হেঁটে হেঁটে আসবে না। আপনার রাস্তার ওপর দিয়েই তাঁকে আসতে হবে গাড়িতে চড়ে।"

তারিণী কিন্তু শঙ্করের কোন কথাই শুনলে না। বললে, "তা হক। তোমার শহরের রাস্তা যেমন হচ্ছে হক, ওর ডাক্তারখানার কাজ যেমন চলছে চলুক, আমি 'তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়' তৈরি করবই।"

শঙ্কর বললে, "করুন। পাঠশালা হবে।"

"তা হক।"

শঙ্কর বললে, "একজন মাস্টারনী ত চাই।"

"আসবে। কালই আমি কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেব।"

"এত দূরে গ্রামের চাকরি নিয়ে সহজে কেউ আসতে চাইবে না।"

তারিণী বললে, "বেশী টাকা মাইনের লোভ দেখাব। থাকা-খাওয়ার খরচ লাগবে না।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েদের মাইনে থেকে যা পাবেন তাতে আপনার মাস্টারনীর মাইনে দেওয়া চলবে না। নিজের বাড়ি থেকে দিতে হবে।"

"রাখহরি যদি একটা হাসপাতালের খরচ চালাতে পারে আমি একটা মাস্টারনীর মাইনে দিতে পারব না?"

"নিশ্চয়ই পারবেন।" বলে শঙ্কর সেখান থেকে সরে গেল। বাইরে অপেক্ষা করছিল কার্তিক। তার নিত্য-নতুন শখ। সে যখন নিতান্ত ছোট ছিল, তার বাবা তাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল শহরে। সেখানে কার্তিক দেখেছিল ছেলেরা ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। কার্তিক ঝোঁক ধরেছিল সে ওইরকম ব্যাণ্ড বাজাবে। তারিণী কিনে দিয়েছিল ব্যাণ্ড বাজাবার সাজ-সরঞ্জাম। পাড়ার ছেলেদের জড়ো করে খুব উৎসাহের সঙ্গে কিছুদিন ধরে কার্তিক খুব ঢাক পেটাল।

গত কয়েকদিন থেকে কার্তিকের শখ হয়েছে আবার ব্যাণ্ড পার্টি গড়ে তুলবে। বোসবাগান ক্লাবে শঙ্করও এ-কাজ অনেক করেছে।

অবশ্য ব্যাণ্ড-পার্টি গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যও একটা ছিল। নইলে শঙ্কর কখনও এ-ব্যাপারে সম্মতি দিত না। প্রতিদিন সকালে ছেলেরা যখন রাস্তা তৈরির কাজে বেরোয়, তখন দুজন ছেলেকে সারা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ছুটে বেড়াতে হয়—প্রত্যেককে ডেকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করবার জন্যে। শঙ্কর বলেছিল "এতে সময় নষ্ট হয় অনেক। রোজ রোজ তোমাদের ডাকতে হবে কেন?"

একটা ছেলে বলেছিল, "আমাদের কারও বাড়িতে ত ঘড়ি নেই যে, সময় দেখে বেরুব।"

কার্তিক বললে, "ঠিক আছে। কাল থেকে ব্যাণ্ডের বাজনা শুনলেই তোমরা বারোয়ারীতলায় এসে হাজির হবে।"

সেইদিন থেকে আবার ব্যাণ্ড পার্টি তৈরি হল। প্রতিদিন সকালে আবার ব্যাণ্ড বাজতে লাগল।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে সারা গ্রামের ছেলেরা আর কুলি মজুরেরা যখন সারি দিয়ে তালে তালে পা ফেলে কাজে যায়, দেখতে মন্দ লাগে না।

টাকা থাকলে সবই সম্ভব।

এদিকে রাস্তা এগিয়ে যাচ্ছে, ওদিকে রাখহরির হাসপাতালের কাজ চলছে

আবার আর-একদিকে তারিণী আরম্ভ করে দিয়েছে বাড়ি মেরামতের কাজ। তারিণী-শঙ্কর-বালিকা-বিদ্যালয় সে সবার আগে খুলে দেবে।

ময়নাবুনি গ্রামখানাই যেন কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

গ্রাম থেকে বেরতে হলে এখন আর জলকাদা ভাঙতে হয় না। রেল-স্টেশন পর্যন্ত গাড়ির চলার পথ একরকম শেষ হয়ে গিয়েছে। রাস্তাটা এখন চলেছে শহরের দিকে এগিয়ে।

রাস্তার সুখে কিনা কে জানে, তারিণী আর রাখহরি—দুজনেই ট্রেনে চড়ে ঘন ঘন শহরে যেতে লাগল। পাছে একই দিনে গেলে ট্রেনে কি শহরে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়, তাই একদিনে দুজনে কখনও যায় না। তারিণী যেদিন যায়, রাখহরি সেদিন বাড়িতে থাকে, আবার রাখহরি যেদিন যায়, তারিণী সেদিন গ্রাম ছাড়ে না।

একদিন দেখা গেল, তারিণীর খামার-বাড়ির চেহারা গিয়েছে বদলে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একতলা বাড়ির বড় বড় খান-চারেক ঘর চুনকাম করা হয়েছে, দরজা-জানালায় রঙ দেওয়া হয়েছে। ছুতোর মিস্ত্রীরা চেয়ার বেঞ্চি তৈরি করছে। আর সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো রঙিন একটি সাইন-বোর্ড। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়।"

শঙ্কর একদিন তারিণীকে জিজ্ঞাসা করলে, "গ্রামের সবাইকে বলেছেন—মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাবার কথা?"

তারিণী বললে, "তুমি বলেছিলে সবাই হয়ত মেয়ে পাঠাবে না। কিন্তু আমি কি দেখলাম জান? ইস্কুলটা দু বেলা বসাতে হবে। প্রত্যেকটি বাড়ির ছোট-বড় সব মেয়ে ত আসবেই, এমন-কি, বাড়ির বউ যারা, ছেলেমেয়ের মা যারা—তারাও বলছে লেখা-পড়া শিখবে।"

শঙ্কর বললে, "তবে আর কি! এবার তাহলে একজন মাস্টারনী যোগাড় করুন। কলকাতার দুটো বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিন।"

তারিণী দুখানা খবরের কাগজ বের করে দেখালে।

"এই দেখ, বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছি। আরও তিনটে রবিবার বেরুবে। রাখহরির হাসপাতালের আগে আমাকে এই ইস্কুল খুলতেই হবে।"

"খুলুন।"

শঙ্কর চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তারিণী তার হাতখানা টেনে ধরলে। যেতে দিলে না। বললে, "কেমন? আমি তা হলে একাই সব করতে পারি?"

শঙ্কর বললে, "তা পারেন।"

"হেঁ-হেঁ", বল সেই কথা।"

অর্থাৎ তিনি যে একজন করিতকর্মা মানুষ, অপরের সাহায্য ছাড়াই সব কাজ করতে পারেন, রাখহরি তার তুলনায় নিতান্ত অর্বাচীন, এই কথাটাই বারংবার শুনতে চান।

শঙ্কর মনে মনে হাসলে। বললে, "নিশ্চয়ই। আপনার মত মানুষ—সত্যি বলছি, আমি আর দেখিনি।"

ভারি খুশী হল তারিণী। বললে, "তবে হ্যাঁ, তুমি যদি না আসতে আমাদের গ্রামে, তা হলে, হয়ত এইরকম কাজ করবার—ইয়ে, মানে ইয়েটা পেতাম না।"

থাক আর নিজের প্রশংসা শুনে কাজ নেই। শঙ্কর আবার চলে যাচ্ছিল। তারিণী আবার বললে, "শোন।"

শঙ্কর ফিরে দাঁড়াল।

তারিণী বললে, "তোমাদের সাহায্য ছাড়া রাখহরি এক পা এগোতে পারবে না। সাহায্য কর, মানে বুঝতে পেরেছ?"

বলেই চোখ টিপে একটুখানি হেসে চুপিচুপি বললে, "মোটা রকমের কিছু দাও খসিয়ে! হাসপাতাল করার ঠ্যালাটা বুঝুক।"

"সে-কথা আর বলতে হবে না। আপনি শুধু দেখুন বসে বসে।"

"আমার আগে যেন কিছু না হয়!"

শঙ্কর বললে, "তাই হয় কখনও! এই ত সবে বাড়ির ছাত পড়ছে।"

"তা হলেও খুব তাড়াতাড়ি করলে ব্যাটা।"

শঙ্কর বললে, "টাকাটা কীরকম খরচ হচ্ছে দেখুন!"

কথাটা শুনে তারিণী সে এক অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল। পৈশাচিক আনন্দের হাসি।

শঙ্কর সেদিন রাস্তায় কাজ করছিল, রাখহরি এসে দাঁড়াল তার কাছে। বললে, "তোমার সঙ্গে আজকাল দেখাই হয় না, তাই একবার এলাম তোমার কাছে।"

শঙ্কর বললে, "দেখা না হলেও আপনার সব খবরই আমি রাখি।"

"কী খবর রাখ, কই, বল ত শুনি!"

শঙ্কর বললে, "এই যেমন ধরুন, আপনি ঘন ঘন শহরে যাচ্ছেন।"

রাখহরি বললে, "কী জন্যে যাচ্ছি তা ত জান না?"

"আজ্ঞে না, তা কেমন করে জানব বলুন!"

"তা হলে শোন, ওই ছাতিমগাছটার তলায় একটু বসি গিয়ে।"

এই বলে রাখহরি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাতিমগাছের ছায়ায় নিজেও বসল। শঙ্করকেও বসালে। বললে, "তোমাকেই বলছি, এ-কথা আর-কাউকে যেন বোলো না।"

শঙ্কর বললে, "না, বলব না। তবে আপনার সন্দেহ যদি হয় ত বলবেন না।"

রাখহরি তবু বললে। বললে, "তখন ত ঝোঁকের মাথায় বলে বসলাম—হাসপাতাল করব। তারপর জয়া আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, হাসপাতাল করবার মত টাকা তোমার আছে বাবা? সেই দিন যেন চৈতন্য ফিরে এল। সত্যিই ত, এ আমি করছি কী! গেলাম শহরে আমার চেনা একজন উকিলের কাছে। মন্মথ-উকিল খুব নাম-করা বড় উকিল। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আরম্ভ করে সরকারী সব বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম। প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, বলেছিলেন—হাসপাতালটা সরকারের হাতে তুলে দিতে পারেন কি না, দেখবেন বলে-কয়ে। তার পর যাই আর ফিরে আসি—তাঁর সময়ই হয় না। পরশু গিয়ে দেখি— মন্মথবাবুর ছেলের জন্মদিন। বাড়িতে লোকজন দেখে ফিরে আসছিলাম মন্মথবাবু বললেন, বসুন। বসিয়ে খুব খাওয়ালেন প্রথমে। খাইয়ে বললেন, ব্যবস্থা সবই করেছি। সরকারের হাতেই তুলে দিতে পারব। কী করতে হবে আর-একদিন এসে জেনে যাবেন। কিন্তু তার আগে এখান থেকে সিভিল সার্জেন নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আসবেন কেমন করে? ট্রেনে চড়ে?"

রাখহরি বললে, "সে-কথাও বললাম। কিন্তু স্টেশন থেকে গরুর গাড়িতে আসতে হবে শুনে বললেন, না, তা হবে না। বলেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তারিণীবাবু যে-রাস্তাটা তৈরি করাচ্ছিলেন, সেটা শেষ হবে কবে? বললাম, শেষ হয়ে এসেছে, আর বেশী দেরি নেই। মন্মথবাবু বললেন, তবে আর কী? শেষ হলে জানাবেন। আমরা সবাই মিলে গিয়ে দেখে আসব মোটরে চড়ে। এই বলে তারিণীর প্রশংসায় মন্মথবাবু একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনিও ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কিন্তু দেখুন, উনি কেমন একটা কাজের মত কাজ করলেন। সত্যি বলতে কী, আমি সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, আপনি জানেন না তাই তারিণীর প্রশংসা করছেন। তারিণী কিছু করেনি। করেছে শঙ্কর। মন্মথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, শঙ্কর কে? আমি বললাম তোমার সব কথা। মন দিয়ে সব শুনলেন তিনি। আমি বললাম, ভারী সুন্দর ছেলে। যদি দেখতে চান ত আমি একদিন নিয়ে আসব এখানে। যাবে?"

শঙ্কর বললে, "যেতে পারি। রাস্তাটা আগে শেষ হক।"

এই বলেই শঙ্কর উঠে যাচ্ছিল। রাখহরি বললে, "দাঁড়াও, আসল কথাটাই ত এখনও

বলা হল না। মন্মথবাবুর ছেলের জন্মদিনে তাঁর এক শালীর ছেলে এসেছিল কলকাতা থেকে। সাহেবী-পোশাক-পরা বড়লোকের ছেলে। খুব মন দিয়ে তোমার কথাগুলো শুনলে। তারপর আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কী নাম বললেন? শঙ্কর? শঙ্কর মুখার্জি? বললাম, হ্যাঁ। বেশ গাট্টা-গোট্টা চেহারা—গুণ্ডার মত দেখতে, কপালে একটা কাটা দাগ আছে? বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু গুণ্ডা কী বলছেন? সুন্দর, সুপুরুষ। ছোঁড়াটা তার মুখটা বেঁকিয়ে আমাকে ভেংচি কেটে বললে, সুন্দর! সুপুরুষ!—কোত্থেকে সে এসেছে বলতে পারেন? বললাম, জানি না। কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি। ছোঁড়াটা বললে, জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না। শঙ্কর ফেরারী আসামী। কলকাতা থেকে পালিয়ে এইখানে এসে জুটেছে। কত লোককে খুন করেছে, কত লোকের টাকা মেরেছে। আমারই ত হাজার চার-পাঁচ মেরে দিয়েছে। আমি ওকেই খুঁজছিলাম। ভালই হল সন্ধান পেয়ে গেলাম।

"বললাম, বেশ ত। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। গিয়ে দেখুন—যাকে খুঁজছেন, এ-লোকটি সেই লোক কি না। আমার বাড়িতে থাকবেন, আপনার কোনও কষ্ট হবে না। আমি শঙ্করের সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেব। দেখেশুনে আবার কাল চলে আসবেন।

"অনেক করে বললাম। কিছুতেই এল না। বললে, যাব একদিন নিশ্চয়। তবে এখন নয়।

"বললাম, আপনার নামটি বলুন। গিয়ে বলব শঙ্করকে।

"তখন কী বললে জান? বললে, না না, এখন কিছু বলবেন না। এই যে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে এ-কথাটাও এখন চেপে যাবেন। আমার নাম শুনলেই পালাবে ওখান থেকে।

"এই বলে ছোঁড়াটা উঠে গেল সেখান থেকে। দেখলাম বেশ খানিকটা দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে লাগল। পাইপ টানবার জন্যেই বোধ করি মেসো-মশাইয়ের কাছ থেকে চলে গেল।

"মন্মথবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার আত্মীয়?

"মন্মথবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমার এক শালীর ছেলে। আমার ছেলের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, কাল এসেছে। ওর কোনও কথা বিশ্বাস করবেন না। টাকাকড়ি বেশ রেখে গিয়েছিল বাপ। এরই মধ্যে প্রায় শেষ করে আনলে।

"জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম? মন্মথবাবু বললেন, নরেন।"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি।"

"চেন তা হলে?"

শঙ্কর বললে, "খুব চিনি।"

তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম সব শেষ হয়ে গিয়েছে। দুখানা ঘরে সারি সারি বেঞ্চি পাতা হয়েছে, হাই বেঞ্চি পাতা হয়েছে, চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড—যেখানে যেমনটি প্রয়োজন, সেইখানে ঠিক তেমনটি সাজানো। এমন কি, নতুন শিক্ষিকা যিনি আসবেন, তাঁর থাকবার ঘর, রান্নার জায়গা, খাট বিছানা, আসবাবপত্র—এমন কি, জলের কুঁজোটি পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে তারিণী।

এবার মাস্টারনী এলেই হয়!

দরখাস্ত এসেছে অনেকগুলো। এখনও আসছে। বক্স-নম্বর দেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজের আপিস থেকে তাড়া তাড়া দরখাস্ত পাঠিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু দরখাস্ত আসবার বিরাম নেই।

দরখাস্তের তাড়াটা শঙ্করের হাতে তুলে দিয়ে তারিণী বললে, "এই দেখ কত দরখাস্ত। এর ভেতর থেকে বেছে বেছে জন-চারেক মেয়েকে আসতে বল। তাদের মধ্যে যে ভাল হবে তাকে বেছে নিও। একদিনে ত আসতে বলবে না। কাজেই সময় লাগবে।"

চিঠির কাগজও ছাপিয়েছে তারিণী। 'তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়' ছাপা কাগজের একটি প্যাড আর চারটি খামও দিয়ে দিলে শঙ্করের হাতে।

কতকগুলো দরখাস্ত বাংলায় লেখা, কিন্তু বেশীর ভাগ ইংরেজীতে। সেদিক দিয়ে শঙ্করের একটু বিপদ আছে। হাতে করে নিলে দরখাস্তের তাড়াটা। নিয়ে চলে গেল রাস্তার কাজে।

কার্তিককে বললে, "তুই কাজ দেখ, আমি ততক্ষণ এইগুলো দেখি।"

বলেই শঙ্কর গিয়ে বসল রাস্তার ধারে সেই ছাতিমগাছের তলায়।

দরখাস্তগুলো শঙ্কর উলটেপালটে দেখলে। বাংলায় লেখা দরখাস্ত যে-কটি ছিল পড়ে ফেললে। ইংরেজীতে লেখাগুলো যে একেবারে পড়তে পারলে না তা নয়। সবই প্রায় একই রকম লেখা। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি-এ পাস-করা সবরকম মেয়েই আছে। কী রকম মেয়ে আসবে কে জানে! দরখাস্তের পাতা উলটোতে উলটোতে হঠাৎ তার ইন্দ্রাণীর কথা মনে পড়ল। লেখাপড়া-জানা মেয়েগুলো অহঙ্কারী হয়—এই ছিল তার ধারণা। কিন্তু জয়াকে দেখে সে ধারণা তার বদলে গিয়েছে।

জয়ার কথা মনে হতেই শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। কার্তিককে বললে, "আমি আসছি। চিঠি আজকে ডাকে না দিলে দেরি হয়ে যাবে।"

রাখহরির বাড়ি গিয়ে হাজির হল শঙ্কর। চাকর বললে, "বাবু বাড়ি নেই।"

কিন্তু বাবুর কাছে সে যায়নি। গিয়েছে যার সন্ধানে, তার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও শঙ্কর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ
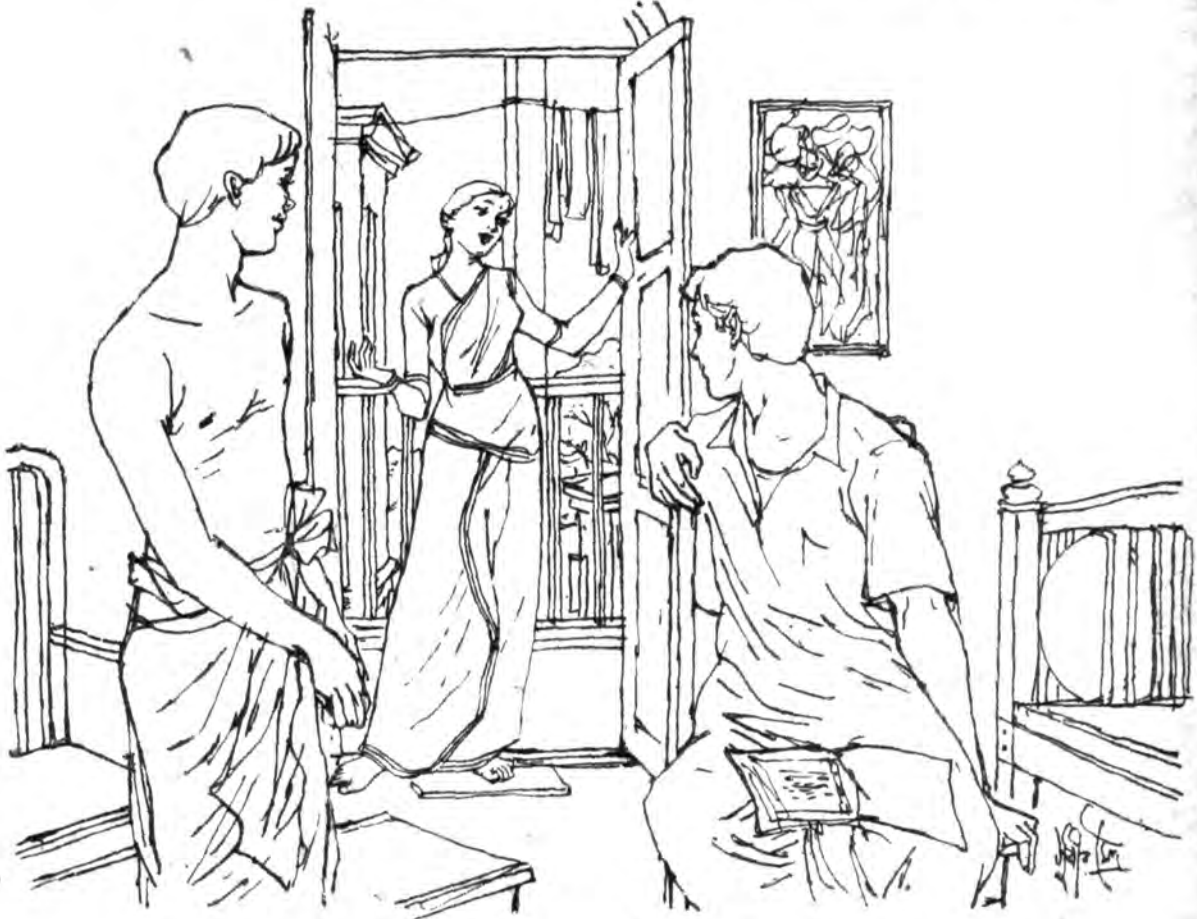
"বলতে হবে না। আমি এসেছি।"

করছিল। বললে, "একটা দোয়াত আর কলম দিতে পারিস?"

চাকরটা বললে, "দিদিমণির কাছে আছে। চেয়ে আনব?"

"দিদিমণি কী করছে রে?"

"সেলাই করছে।"

শঙ্কর বললে, "আচ্ছা, আমি ওই ওপরের ঘরে বসি, তুই গিয়ে চুপি চুপি বল—শঙ্করবাবু একটা দোয়াত-কলম চাইলে।"

চাকরটা ভিতরে চলে গেল।

যে-ঘরখানা তাকে দেওয়া হয়েছিল, শঙ্কর সেই ঘরে গিয়ে দেখলে, সব তেমনই আছে, শুধু তার খাট থেকে বিছানাটা তুলে রাখা হয়েছে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শঙ্কর চুপ করে বসল।

চাকরটা ফিরে এসে খবর দিলে, "দিদিমণি বললে দোয়াত-কলম নেই।"

এ-রকম জবাব শঙ্কর আশা করেনি। ভেবেছিল, তার নাম শুনলে সে নিজেই ছুটে আসবে। লজ্জায় সে আর মুখ তুলতে পারলে না। দরখাস্তের ফাইলটা নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবছিল, এখানে আসা বোধ হয় তার উচিত হয়নি।

চাকরটাকে বললে, "দিদিমণিকে বলিস আমি চলে গেছি।"

"বলতে হবে না। আমি এসেছি।"

বলতে বলতে জয়া এসে দাঁড়াল। এসেই প্রথমে ভোলা চাকরকে বললে, "যা তুই ঠাকুরের কাছে যা।"

শঙ্কর সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে বসেছিল, জয়াকে দেখতে পায়নি।

জয়া বললে, "তা আসাই বা কেন, চলে যাওয়াই বা কেন? দোয়াত কলম আমার সত্যিই নেই। এই নিন।"

বলে জয়া তার দামী ফাউন্টেন-পেনটি শঙ্করের হাতের কাছে নামিয়ে দিলে।

শঙ্কর বললে, "তা এতই দয়া যখন করলে তখন আর একটু দয়া তোমাকে করতে হবে। এই চেয়ারটায় বোস, বলছি।"

"দাঁড়িয়েও শুনতে পাব। বলুন।"

শঙ্কর বললে, "জানতে এসেছিলাম, তোমার বাবা কবে শহরে যাবেন।"

"সে-কথা আমার চেয়ে আমার বাবা ভাল জানেন।"

"তা হলে তোমার বাবা যখন আসবেন তখনই আসব। আজ চলি।"

জয়া বললে, "কিন্তু বাবার শহরে যাওয়ার সঙ্গে দোয়াত কলমের সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন?"

শঙ্কর বললে, "আমার চোখটা খারাপ হয়েছে। শহরে গিয়ে ডাক্তারকে দেখিয়ে চশমা নিতে হবে। অথচ এই দেখ তারিণীবাবু এই ফাইলটা আমাকে দিলেন। বললেন, এর ভেতর থেকে চারটি মেয়েকে পছন্দ করে একজন একজন করে আসতে লিখে দাও। তোমার কাছে দোয়াত কলম চেয়ে পাঠিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। ফাইলটা উলটে দেখি ঠিকানাগুলো ঠিক পড়তে পারছি না।"

জয়া বললে, "বুঝেছি। তারিণীবাবুর মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারনীদের ফাইল।"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ত মেয়েরা আসবার আগে চশমা আপনার নিশ্চয়ই চাই।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েরা আসবার আগে বলছ কেন?"

জয়া বললে, "মেয়েদের পছন্দ করবার ভারটাও ত আপনারই ওপর পড়বে। চশমা

ছাড়া তাদের ভাল করে দেখতে পারবেন না ত!"

শংকর ঈষৎ হেসে জয়ার মুখের দিকে তাকালে।

শংকরের হাসিটি বড় চমৎকার!

মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গিনীর মত জয়া তার উদ্যত ফণা গুটিয়ে নিলে। চেয়ারটা টেনে তার উপর ভাল করে চেপে বসে বললে, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেল। আপত্তি যদি না থাকে ত আপনার হাতের ওই ফাইলটা একবার দেখতে চাই।"

এইটিই শংকর চাইছিল। ফাইলটি তৎক্ষণাৎ তার হাতে তুলে দিয়ে বললে, "চারটে মেয়ে এর থেকে দাও না বেছে!"

"শুধু নাম আর হাতের লেখা দেখে? কিন্তু জানেন ত, ঝাঁটার মুড়োর মত চুল, নাম কিন্তু মণিকুন্তলা। পেত্নীর মত চেহারা, নাম জয়ারানী—"

আর কী যেন সে বলতে যাচ্ছিল, শংকর বললে, "এটা ভুল বললে। জয়ারানীর নাম হওয়া উচিত ছিল বিজয়িনী।"

জয়া শুধু একবার তার আয়ত চোখ দুটি শংকরের মুখের দিকে তুলেই আবার নামিয়ে নিলে। বললে, "কাজ নেই বাবা, আমি শুধু নাম আর বিদ্যের বহরটা বলে যাব। আপনি পছন্দ করুন।"

বলেই জয়া একে একে বলে যেতে লাগল। "আরতি সান্যাল। আই-এ। হাতের লেখা বিশ্রী। চলবে না।

"সুমতি ঘোষ। বি-এ। হাতের লেখা মাঝামাঝি, ভালও নয়, মন্দও নয়। কী করব বলুন!"

শংকর বললে, "উলটে যাও, আরও আছে।"

জয়া আবার বললে, "জ্যোতির্ময়ী ঘোষ। ম্যাট্রিকুলেশন। বিশ্রী হাতের লেখা। মমতা পাকড়াশী—আই-এ। চলবে না। সুলেখা বোস। দেখুন দেখুন। নাম সুলেখা, অথচ হাতের লেখার ছিরি দেখুন।"

এই বলে ফাইলটা শংকরকে দেখাতে গিয়েও দেখালে না। বললে, "ওহো, আপনি যে চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। শুনুন, আবার পড়ি। মীরা দাসী। বি-এ। হাতের লেখা ভাল। দাসী চলবে?"

শংকর বললে, "দাগ দাও।"

ফাউণ্টেন পেনটি খুলতে খুলতে জয়া আবার বললে, "দাসী চলবে। দাগ দিলাম। তারপর, সবিতা সরকার। ম্যাট্রিক। নাঃ, চলবে না। শংকরী চট্টোপাধ্যায়—বি-এ। একে আপনার মনে ধরা উচিত। শংকর, শংকরী, মুখোপাধ্যায় আর চট্টোপাধ্যায়।"

শংকর বললে, "না, চলবে না। উলটে যাও।"

জয়া হাসতে হাসতে বললে, "শুনুন শুনুন, বিধুমুখী মিত্র। ধেৎ, বিধুমুখী নাম ভাল নয়।"

শংকর বললে, "দেখ জয়া, দরকার মাত্র একটি মেয়ের। পড়াবে ত অ আ ক খ। যাকে হক আসতে লিখে দাও। ভাল না হয়, বিদেয় করে দেব। তারপর আর-একজনকে ডাকব।"

জয়া বললে, "অসম্ভব। মেয়েদের বিদেয় করা অত সহজ নয়। আপনি ত পারবেনই না। আমি পারি।"

শংকর বললে, "তোমাকে ইস্কুলের সেক্রেটারি করে দেব।"

"তারিণীবাবুর ইস্কুলের আমি হব সেক্রেটারি? আপনার বদনামের আর কিছু বাকী থাকবে না।"

জয়া বললে, "আবার পড়ি, শুনুন। সৌদামিনী রক্ষিত। না। এই দেখুন, এ-নামটা পড়াই যাচ্ছে না। তারপর রানীবালা বোস, জ্যোৎস্না ঘোষ। শুধু নামগুলো পড়ে যাচ্ছি। প্রণতি মুখার্জি। অপর্ণা নন্দী। সুবর্ণ বিশ্বাস। ইন্দ্রাণী দেবী। নন্দিতা—"

শংকর বললে, "এইটা কী নাম বললে?"

"নন্দিতা শ্রীমানী।"

"না না, তার আগে।"

জয়া বললে, "সুবর্ণ বিশ্বাস, অপর্ণা নন্দী, ইন্দ্রাণী দেবী।"

শংকর বললে, "ইন্দ্রাণী দেবী? পদবী নেই?"

জয়া বললে, "না। আই-এ-পাস। হাতের লেখাটি মন্দ নয়।"

"ঠিকানা?"

জয়া বললে, "কালীঘাট, কোলকাতা।"

শংকর বললে, "বাস্, হয়ে গেছে। একেই আসতে লিখে দাও।"

তারিণীশংকর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাপা প্যাড আর একটি খাম জয়ার হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরে শংকর বললে, "সাত দিন সময় দিয়ে, আসছে রবিবার সকালের ট্রেনে আসতে লিখে দাও।"

"কে লিখবে? আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি।"

"আমার হাতের লেখা খুব খারাপ।"

"তুমি ত চাকরির দরখাস্ত করছ না।"

জয়া হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "বাংলায়, না ইংরিজীতে?"

শংকর বললে, "বাংলায়। রাত্রি নটায় হাওড়ায় চড়বে, জংশন স্টেশনে ট্রেন বদলাবে এক ঘণ্টা পরে, তারপর সারা রাত ট্রেনে এসে সকালে নামবে তোমাদের এই স্টেশনে। গরুর গাড়ি থাকবে। তাইতে চড়ে সোজা চলে আসবে তোমার কাছে। আমি সেদিন কোথাও পালাব। তুমি দেখেশুনে আলাপ পরিচয় করে ঠিক করে রাখবে। আমি চুপি চুপি এসে জেনে যাব চলবে কিনা। যদি চলে ত নিয়ে যাব তার আস্তানায়, যদি না চলে ত এইখান থেকেই বিদেয় করে দেব।"

জয়া বললে, "বেশ ত বলে গেলেন গড় গড় করে! তারপর বাবা যখন শুনবে মেয়েটি তারিণী মুখুজ্যের ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তখন?"

শংকর বললে, "উনি কিছু বলবেন না। তুমি বলবে শংকর আমাকে বলেছে। তার আগেই আমি তোমার বাবাকে সব বলে রাখব।"

চিঠিখানা জয়া লিখতে আরম্ভ করলে।

শংকর তখন ভাবছে—কে এই ইন্দ্রাণী? ঠিকানা লিখেছে কালীঘাট। আই-এ-পাস। এতদিনে আই-এ-পাস করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে সুদূর এই পাড়াগাঁয়ে সে চাকরি করতে চাইবেই-বা কেন? সুন্দরী ওই যুবতী মেয়েকে মা তার একা একা এই পল্লীগ্রামে থাকবার জন্যে ছেড়েই-বা দেবে কেন? সে ইন্দ্রাণী নয় হয়ত। হয়ত-বা ওই নামের আর-একটি মেয়ে। কালীঘাট অঞ্চলে থাকে। টাকা-পয়সার অভাবে আর বেশিদূর হয়ত পড়তে পারেনি। সংসারে অভাব অত্যন্ত বেশী। আই-এ-পাস মেয়ে খাওয়া-থাকার খরচ লাগবে না, তার ওপর দেড়শ টাকা মাইনে পাবে। এর জন্যে সবরকম বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করতে পারে—সেরকম দরিদ্র মেয়ের সংখ্যা আমাদের দেশে বড় কম নেই। কিন্তু সত্যই যদি তার সেই ইন্দ্রাণী হয়? জীবনের রহস্য বোঝা ভার। জীবন-দেবতা হয়ত-বা আবার এক নতুন খেলা খেলতে চান তার সংগে।

জয়ার চিঠি লেখা শেষ হল। খামের উপর ঠিকানাটা লিখে জয়া খামখানি শংকরের হাতে দিয়ে বললে, নিন। আপনার সেক্রেটারির কাজ করলাম। চিঠিখানা পড়ে দিতে হবে নাকি?

শংকর বললে, "না।"

বলেই হঠাৎ তার কি মনে হল, বললে, "ঠিকানাটা পড়ত।"

জয়া পড়লে, "শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী। তিন নম্বর গোবিন্দ সেন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।"

মনে মনে হাসলে শংকর। ছি ছি, নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল সে? ঠিকানা ত আলাদা! এক নামের দুটি মেয়ে কি কালীঘাটে থাকবে না? এক পাড়ায় থাকা ত দূরের কথা, অনেক সময় এক-বাড়িতে থাকে।

শংকর যেন নিশ্চিন্ত হল।

চিঠিখানি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে শংকর ভাবলে, ভালই হল, ইন্দ্রাণী থাক তার

অহঙ্কার নিয়ে। যে-জীবন সে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে এসেছে, তার আর জের টেনে লাভ নেই। ইন্দ্রাণী তার জীবনে এসেছিল যেন অভিশাপ হয়ে। ইন্দ্রাণীকে খুশী করবার জন্যই তাকে মিথ্যাচার করতে হয়েছিল। তারই জন্য তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মা তার আত্মহত্যা করেছে শুধু তারই জন্যে। সুতরাং ভালই হয়েছে—এ-ইন্দ্রাণী তার বিয়ে-করা স্ত্রী ইন্দ্রাণী নয়।

শঙ্কর আবার তার রাস্তা তৈরির কাজে লেগে গেল।

কিন্তু সেদিন থেকে ইন্দ্রাণীর চিন্তা যেন তাকে নিষ্কৃতি দিলে না।

দিবারাত্রি সে শুধু ইন্দ্রাণীর কথা ভাবে। রূপলাবণ্যবতী রাজেন্দ্রাণীর মত সদ্যো-বিবাহিতা সেই তন্বী-তরুণী সব-কিছুকে আড়াল করে তার চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ায়। জ্বালাময়ী সে বহ্নিশিখা তাকে যেন ঠিক পতঙ্গের মত টানতে থাকে।

কয়েকদিনের মাত্র কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনার স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তার জীবনে। বিয়ের রাতের সেই শুভদৃষ্টি! সেই দুটি আয়ত চোখের রহস্যময় এক অপরূপ সৌন্দর্য! বিদ্যুতের মত একটি মুহূর্ত মাত্র। চোখ সে লজ্জায় নামিয়ে নিয়েছিল তক্ষুনি। কিন্তু আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সে দুটি চোখ। কথা কয়েছিল। . হেসেছিল।

বিবাহের পর, বাসরে ভেবেছিল পরিচয় হবে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর বন্ধুরা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। শুধু চোখে চোখে দেখা, আর চোখে চোখে কথা।

পরের দিন কুশণ্ডিকা।

সেদিনও শুধু একটুখানি স্পর্শের রোমাঞ্চ।

তারপর ঝিলপাড়ার সেই ভাড়া-বাড়িতে তাদের বোঝাপড়া। উদ্যতফণা ভুজঙ্গিণীকে বশ মানানো সারারাত ধরে।

বশ কি সে সত্যই মেনেছিল?

বোধ হয় না।

যেটুকু মেনেছিল, সেটুকু শুধু তার গায়ের জোরে।

ইন্দ্রাণীকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিল, ইন্দ্রাণী কিন্তু তার সে ভালবাসা গ্রহণ করেনি।

তাকে সে বোঝবার সময়ও পায়নি, বুঝতে পারেওনি।

ইন্দ্রাণী যদি তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে না যেত, তার মা তাহলে এমন করে আত্মহত্যা করত না। তার এই সর্বনাশের জন্য ইন্দ্রাণীই দায়ী।

অনুতপ্ত হয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত তার অশৌচ অবস্থায় ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল। বলেছিল, তুমি যেমনটি চাও আমি তেমনি হব। তারই কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যাকে সে ভালবাসতে চায়, সেই তারই কাছে চেয়েছিল একটুখানি মনের আশ্রয়।

ইন্দ্রাণী তখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

শঙ্কর বলেছিল, "আমি তোমার স্বামী।"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "স্বামীর পরিচয় আপনাকে দিতে হবে না। আপনি যান।"

কিন্তু কি বিচিত্র মানুষের মন! সেই ইন্দ্রাণীর কথা ভেবে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। শিক্ষয়িত্রীদের দরখাস্তের ভিতর থেকে কোথাকার কে-এক ইন্দ্রাণীর নামটি শোনবামাত্র জয়াকে বললে, আর-সবাইকে বাদ দিয়ে তুমি একেই আসতে বল। এরও বাড়ি কালীঘাট শুনে শঙ্করের প্রথমে স্থির বিশ্বাস হয়েছিল—এ তারই সেই ইন্দ্রাণী। তারপর নিশ্চিন্ত হল ঠিকানা দেখে।

যে-ইন্দ্রাণী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে আর-একটিবার শুধু দেখবার আগ্রহ শঙ্কর দমন করলে। যে তার স্বামিত্বের দাবি স্বীকার করেনি, তাকেই বা সে স্ত্রীর অধিকার দেবে কেন?

সে যে-ইন্দ্রাণীই হক, তার সঙ্গে শঙ্করের কোনও সম্বন্ধ নেই।

মন থেকে ইন্দ্রাণীর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শঙ্কর সেদিন রাখহরির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে, "শহরে যাবেন বলেছিলেন, যাবেন না?"

"হ্যাঁ, শুনেছিলাম ডাক্তারকে তুমি চোখ দেখাতে যাবে।"

"কোথায় শুনলেন?" জিজ্ঞাসা করলে শঙ্কর।

"জয়া বলছিল।"

শঙ্কর বললে, "হ্যাঁ চলুন, রবিবার সকালে যাই। ভোরের ট্রেনে।"

"সেই ভালো। চোখ দেখিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব আমার সেই উকিল-ভদ্রলোকের বাড়িতে।"

কথাটা শঙ্করের মনে ছিল না। বললে, "কেন?"

রাখহরি বললে, "মনে নেই? সেই যে কি নাম বললে! বীরেন নাকি, তোমার চেনা সেই ছোঁড়াটা—"

শঙ্কর বললে, "নরেন।"

"হ্যাঁ, তাকে দু' কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে এস। হতভাগা যা-তা' বলছিল তোমার নামে।"

"ঠিক বলেছেন। চলুন।"

শঙ্কর বললে বটে, কিন্তু নরেনের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা তার ছিল না। পুরোনো দিনের অপ্রীতিকর স্মৃতি সে তার মন থেকে মুছে ফেলতেই চায়। কিন্তু রহস্যময় সে অদৃশ্য জীবন-দেবতার এ কি বিচিত্র খেলা কে জানে!

শঙ্কর ভয় পেলে না। বললে, "তাহলে এই কথা রইল। রবিবার আপনি ঠিক হয়ে থাকবেন। শেষ রাত্রে আমি আপনাকে এসে তুলে নেব।"

রাখহরির সঙ্গে শহরে এল শঙ্কর।

"চল তোমার চোখের ডাক্তারের কাছে আগে যাই।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না, আগে চলুন আপনার উকিলের বাড়ি। আদালতে চলে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।"

রাখহরি হো হো করে হেসে উঠল। বললে, "আজ রবিবার। ভুলে গেলে নাকি?"

কিছুই সে ভোলেনি। বললে, "তাহলে চলুন, আপনার আর-একটা কাজ সেরে নিন আগে। সিভিল সার্জেনের বাড়ি চলুন। এই কাজটাই সবচেয়ে বড় কাজ।"

রাখহরি বললে, "তোমার চোখ দেখানোর কাজটা বুঝি সবচেয়ে ছোট কাজ? আচ্ছা শঙ্কর—"

বলেই সে তার পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললে, "নিজের কাজটা বুঝি কাজই নয়? তুমি পরের কাজ করতে এত ভালবাসো!"

"পরের কাজ কোন্‌টা বলছেন?"

"আমাদের গ্রামে এসে অবধি যা তুমি করছ?"

শঙ্কর বললে, "কিছুই ত করিনি। যা করছেন আপনারাই করছেন।"

রাখহরি বললে, "আমরা পুরুষানুক্রমে বাস করছি এই গ্রামে। কিন্তু কই, এতদিন ত করিনি! এ-মন তুমি কোথায় পেলে?"

"আমার মায়ের কাছে!"

মার কথা মনে হতেই শঙ্করের চোখ দুটো জলে ছল ছল করে এল। অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললে, "এ আমার মার আদেশ।"

"সে মা বুঝি তোমার মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বাবা?"

"তারও আগে। তাঁকে আমার মনেও পড়ে না।"

কথাটা বলেই শঙ্করের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এমন গম্ভীর হল যে, রাখহরি সে-মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও কথা বলতে ভরসা পেলে না।

শহরের যে-পথ ধরে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল, সে-পথে লোকজন কম। একদিকে বড় বড় বাড়ি। আর একদিকে প্রকাণ্ড একটা পার্ক। পার্কের ধারে ধারে বড় বড় গাছ, আর গাছের ছায়ায় বেঞ্চি পাতা।

রাখহরি বললে, "খেয়ে এসে তোমার সঙ্গে

আমি হাঁটতে পারছি না শংকর। এস এই বেঞ্চে একটু বসি।"

"বসুন।"

দুজনেই বসল। শংকরের কোনও কাজ নেই। সে শুধু পালিয়ে এসেছে ময়নাবুনি থেকে। পালিয়ে এসেছে তারিণীশংকর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর ভয়ে। ইন্দ্রাণী যার নাম। জয়ার উপর ভার দিয়ে এসেছে তাকে আদর-অভ্যর্থনা করবার। এতক্ষণ সে এসে গেছে নিশ্চয়ই। কোন্ ইন্দ্রাণী কে জানে!

চিন্তায় বাধা পড়ল।

রাখহরি কি যেন বলবার জন্য অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল। শংকর বুঝতে পারলে। মনে হল সেইজন্যই সে বসল। হাত বাড়িয়ে আবার রাখহরি তার কাঁধের উপর হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার বলতে কেউ নেই, না?"

শংকর বললে, "না।"

রাখহরি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

শংকর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

রাখহরি বললে, "তোমার মত আমার যদি একটা ছেলে থাকত!"

অস্বস্তি যেন আরও একটু বাড়ল শংকরের। এ আবার কি কথা?

স্নেহের কাঙাল মন মানুষের একটুখানি স্নেহের আশ্রয় চায় বই-কি!

কিন্তু আশ্চর্য তার মনের গঠন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, সে-হাত ধরতে গিয়ে মনে হল যেন তার হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে। কিসের এ কুণ্ঠা?

শংকর তার মনের কাছ থেকে কোনও জবাবই পেলে না।

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "বিয়ে-থা করে সংসারী হতে তোমার ইচ্ছে করে না শংকর?"

"থাক ও-সব কথা। চলুন।"

এই বলে শংকর উঠতে যাচ্ছিল, রাখহরি তার হাতটা ধরে ফেললে। বললে, "বল। তোমাকে বলতেই হবে।"

শংকর বললে, "একটা পয়সা যে রোজগার করে না, তার আবার সংসারী হওয়া! চলুন যাই।"

"ধর, রোজগারের কথা তোমাকে যদি ভাবতে না হত, তাহলে ইচ্ছে করত কিনা, তাই বল।"

"আচ্ছা, এ-কথা জানবার আগ্রহ আপনার কেন হল বলুন ত? বেশ ত আছি আমি। আপনারা সবাই আমাকে ভালবাসেন—"

কথাটা শংকরকে শেষ করতে দিলে না রাখহরি। বললে, "তোমার যদি মত থাকত, তাহলে জয়ার সঙ্গে তোমার আমি বিয়ে দিতাম।"

শংকর চমকে উঠল কথাটা শুনে। অবাক হয়ে একটুখানি থেমে মুখ তুলে চাইলে। বললে, "একটি ছেলে শুনেছিলাম বিলেত গেছে, ফিরে এলে জয়ার বিয়ে হবে।"

"ঠিকই শুনেছিলে। কিন্তু সে-ছেলে আর এসেছে! এক বছর পরে ফিরে আসার কথা। আজ তিন বছর হল এল না। বাপের কাছে এখন আর টাকাও চায় না, চিঠিপত্রও লেখে না।"

"আসবে, আসবে। আপনি ভাববেন না। উঠুন।"

রাখহরি আবার তাকে টেনে বসিয়ে দিলে। "তুমি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ আমার কথাটা। তুমি আমাকে বল। আমি নিশ্চিন্ত হই।"

শংকর ম্লান একটু হাসলে। হেসে বললে, "দু' চারদিন আমাকে ভাববার সময় দিন।"

"তা বেশ, তুমি আমাকে ভেবেই বোল!"

এই বলে রাখহরি উঠল। শংকরও উঠল।

রাখহরি বললে, "শহরে যদি বাস করতাম, এতটা ভাবতাম না। কিন্তু আমাদের গ্রামের সমাজ—কত রকমের কত কথা আমার কানে আসে, আমি গ্রাহ্যই করি না।"

শংকর দু চারদিন সময় চাইলে ভেবে দেখবার। ভাবনা কিন্তু তার মনে তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিয়ে সে করতে চায়নি। মা যদি তার বিয়ের কথা না তুলত, আর বস্তির সেই মেয়েটির মোটর-ড্রাইভার মামা যদি তার মাকে অপমান না করত, তাহলে বিয়ে হয়ত সে করত না। ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করে তার কম শিক্ষা হয়নি। আবার বিয়ে? জয়া চমৎকার মেয়ে, স্নিগ্ধ একটি দীপশিখার মত, ইন্দ্রাণীর মত উগ্র নয়। কিন্তু কি জানি হয়ত ছাই-চাপা আগুনের মত—দপ করে জ্বলে উঠতেই-বা কতক্ষণ! বিয়ের পর যাচাই করে বাজিয়ে যখন দেখতে চাইবে, —দেখবে, যাকে সে বিয়ে করেছে সে লেখাপড়া জানে না, এক পয়সা রোজগার করে না, তখন সেও ঠিক ইন্দ্রাণীর মত তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইবে কিনা, তাই-বা কে জানে!

আবার হয়ত ভালও হতে পারে। মেয়েদের সঙ্গে কতটুকুই-বা তার পরিচয়! এমনও হতে পারে, জয়া হয়ত ভিন্ন ধাতুতে গড়া। হয়ত-বা দোষ-গুণ সমেত গোটা মানুষটাকে সে ভালবাসতে জানে।

মেয়েদের ভালবাসা অসাধ্য সাধন করতে পারে। স্বামীকে মনের মত করে গড়ে তুলে এই পৃথিবীতে সুখের স্বর্গ রচনা করা তার স্বারাই সম্ভব।

শংকরের চিন্তায় বাধা পড়ল। রাখহরি বললে, "এই ত সরকারী বড় ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার। আমি একবার দেখা করে আসি। তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর।"

অপেক্ষা অবশ্য বেশীক্ষণ করতে হল না। সুখবর নিয়ে ফিরে এল রাখহরি। বললে, "তোমার রাস্তাটা শেষ হতে আর কতদিন লাগবে শংকর?"

শংকর বললে, "আমরা ত এখন গরুর গাড়ি চলবার রাস্তাটার কাছে এসে পড়েছি। সেইটেকে পাকা করে শহরে যাবার রাস্তাটার সঙ্গে মিশিয়ে দেব। তাহলেই আমাদের কাজ শেষ।"

"সেটা কতদিনে হবে?"

শংকর বললে, "তা মাসখানেক লাগতে পারে।"

রাখহরি বললে, "তাহলেই এই শহর থেকে সোজা মোটর গাড়ি চলে যাবে আমাদের গ্রামে। কি বল?"

"জিপগাড়িগুলো এখনও যেতে পারে।"

রাখহরি বললে, "না, রাস্তাটা শেষ হক। আমারও ত সময় চাই।" বাড়িটা শেষ করে ওষুধপত্র দিয়ে সাজিয়ে চারটে বেডের ব্যবস্থা করে সরকারের হাতে তুলে দেব। সেই ব্যবস্থাটাই উনি করে দেবেন বললেন।"

এই বলে রাখহরি শংকরকে নিয়ে গেল সেই উকিলের বাড়িতে। ভদ্রলোক সমাদর করে বসালেন তাদের।

শংকরকে দেখিয়ে রাখহরি বললে, "এরই কথা হচ্ছিল সেদিন। এরই নাম শংকর।"

হাত তুলে শংকর নমস্কার করলে। মন্মথবাবু নমস্কার করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন শংকরের মুখের দিকে। শুধু মুখের দিকে নয়, সুগঠিত সুন্দর তার সারা দেহের দিকে। তারপর বললেন, "বাঃ! চমৎকার! আপনার কথা সব শুনেছি আমি।"

শংকর একটুখানি হাসলে। হাসিটি আরও সুন্দর!

মন্মথবাবু তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

শংকর বললে, "শুনেছেন কার কাছ থেকে?" রাখহরিকে দেখিয়ে বললে, "এ'র কাছ থেকে, না আপনার আত্মীয় পাকপাড়ার নরেনের কাছ থেকে?"

মন্মথবাবু বললেন, "আরে দূর দূর, ওটা হচ্ছে গিয়ে একনম্বরের বখাটে ছোকরা। একটা সত্যি কথা বলে না, মস্ত চালিয়াৎ। বড়লোকের একটি মাত্র ছেলে, টাকাকড়ি দু হাতে ওড়াচ্ছে আর চাল মেরে মেরে বেড়াচ্ছে। ওর কথা বিশ্বাস করতে আছে? রামঃ!"

রাখহরি বললে, "একবার ডাকুন না তাকে। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

মন্মথবাবু বললেন, "সে কি আছে নাকি এখানে? পরের দিনই পালিয়েছে কল-

কাতায়। আবার একদিন হুট করে এসে হয়ত হাজির হবে। নতুন একটা মোটরবাইক কিনেছে, আমাকে বলে গেল, তাইতে চড়ে একদিন সোজা কলকাতা থেকে এখানে এসে বাইকটা আমাকে দেখিয়ে যাবে।"

শংকর বললে, "আসুক, তারপর একদিন আসব।"

"আসতে পারেন, কিন্তু কখন আসে তার ত কোনও ঠিকঠিকানা নেই। আর এলে যে আপনাকে খবর দেব তারও কোনও ব্যবস্থা নেই।"

রাখহরি বলে উঠল, "আমার ঠিকানায় একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিতে পারেন।"

"সে পোস্টকার্ড আপনার হাতে গিয়ে পেঁাছবে, তারপর উনি আসবেন, ততদিন সে থাকবে বুঝি?"

শংকর বললে, "মোটরবাইক নিয়ে আসবে ত! বলবেন—যাও, ময়নাবুনি গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এস।"

"যাবার রাস্তা কোথায়?"

রাখহরি বললে, "রাস্তা ত হল বলে। ওইটিই ত শংকরের কীর্তি। ডাক্তারবাবু সোজা এখান থেকে মোটর নিয়ে যাবেন আমাদের গ্রামে। আমার ডাক্তারখানা দেখে আসবেন। সেদিন কিন্তু আপনাকেও যেতে হবে।

"আমার সময় হবে কি?" মন্মথবাবু বললেন।

শংকর বললে, "সময় একটু করে নেবেন। সেইদিন শহর থেকে প্রথম মোটর গাড়ি যাবে ময়নাবুনি গ্রামে। ডাক্তারখানা, রাস্তা, মেয়েদের ইস্কুল—আপনাদের মতন মানুষের পায়ের ধুলো না পড়লে"—

রাখহরি তার কথাটা যেন লুফে নিলে। বাঃ, বেশ কথা বলেছে ত শংকর। কথাটা তারই বলা উচিত ছিল।

বললে, "না না আপনার কোনও কথা শুনব না। আমি নিজে এসে আপনাদের নিয়ে যাব। আপনি না থাকলে আমার ডাক্তারখানার কোনও ব্যবস্থাই হত না।"

শংকর বললে, "নরেন যদি সেদিন আসে ত খুব ভাল হয়।"

"তারিখটা আমাকে আগে জানাবেন। আমি নরেনকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেব। তবে সত্যি কথা বলতে কি, সে-ছোড়াটার আসা আমি পছন্দ করি না। বুঝলেন?" এই বলে মন্মথবাবু হাসতে লাগলেন। শংকরও হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, "আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।"

"আচ্ছা তাই বলব।" মন্মথবাবু বললেন, "নরেন তোমাকে যে-সব কথা বলেছে, সে-সব তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই।"

শংকর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনেছি।"

মন্মথবাবু বললেন, "তার জন্যে তুমি যেন মন খারাপ কোর না। ছোঁড়াটা অমনিই। কারও ভাল দেখতে পারে না। যেই শুনেছে তুমি এখানে এসে একটা কাজের মত কাজ করছ, বাস্, অমনি যা-তা বলতে লাগল তোমার নামে।"

"আপনার চেয়ে আমি বোধহয় ওকে ভাল করে চিনি। আজ তাহলে আসি। নমস্কার।"

শংকরকে বোধহয় মন্মথবাবুর খুব ভাল লেগেছিল। বললেন, "শহরে এলেই এখানে এস যেন।"

"আসব।"

রাখহরি বললে, "চল এবার তোমার চোখের ডাক্তারের কাছে যাই।"

"চলুন।" বলে শঙ্কর বাইরে বেরিয়ে এসেই বললে, "না থাক। আজ আর ডাক্তারের কাছে যাব না।"

"না না ও কি কথা? চোখকে কখনও অবহেলা করতে নেই।"

শঙ্কর বললে, "অবহেলা করছি না বলেই যাচ্ছি না। গেলেই এখুনি চশমার ব্যবস্থা করে দেবে। আর একবার যদি চশমা পরি, চিরজীবন ধরে পরতে হবে। তার চেয়ে দেখি যদি এমনিই সেরে যায়।"

রাখহরি বুঝলে তার যুক্তিটা। মন্দ বলেনি। চশমা ব্যবহার না করেও ত অনেকের সেরে যায়।

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে এখন আমাদের কী কাজ?"

"স্টেশনে যাওয়া।" শঙ্কর বললে, "বিকেলের ট্রেনটা যদি ধরতে পারি তাহলে রাত্রি আটটা নাগাদ আমরা বাড়ি পৌঁছতে পারব।"

আটটায় পৌঁছতে পারলে না অবশ্য। ন'টা বাজল।

পল্লীগ্রামের রাত্রি ন'টা মানে সব চুপচাপ। চুপচাপ নয় শুধু ময়নাবুনি শান্তিকেন্দ্র। মানে তারিণীশঙ্করের বাগানবাড়িটা। শঙ্কর আর কার্তিকের আস্তানা।

রাখহরির গাড়িটা গিয়ে দাঁড়াল তার বাড়ির দরজায়। শঙ্কর কিন্তু তার আগেই নেমে গেছে। রাখহরির অনুরোধ সত্ত্বেও তার বাড়িতে সে আসেনি। বলেছে, "খেতে দেরি হলে ওঁরা রাগ করেন।"

রাগ অবশ্য কেউ করে না। অ্যালুমিনিয়ামের একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে শঙ্করের খাবার বাগান-বাড়িতে দিয়ে যায়। আজকাল কার্তিকের খাবারও আসছে সেখানে। আসবার অবশ্য কারণ আছে। দুজনে একসঙ্গে বসে খাবার লোভ শুধু নয়, লোভ আর-একটা জিনিসের। মুরগী বা মুরগীর ডিম তারিণীশঙ্করের বাড়ির ত্রিসীমানায় যাবার জো নেই। অথচ এখানে ও সবের দাম খুব সস্তা। স্টোভ জ্বালিয়ে কার্তিক নিজের হাতে রান্না করে শঙ্করের সঙ্গে বসে বসে খায়।

সেদিনও কার্তিক সেই ব্যবস্থাই করেছিল। ঘরের ভিতর একটা হ্যাজাক জ্বলছে। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো টিম টিম করে জ্বলে বলে কার্তিক একটা 'হ্যাজাক' আনিয়েছে শহর থেকে।

সেই হ্যাজাকের আলো জানলার পথে রাস্তায় এসে পড়েছে। মনে হল যেন কার্তিক একা নেই, তার সঙ্গে আরও লোকজন রয়েছে। শঙ্কর কিন্তু বাগানবাড়ির ফটকটা পেরিয়ে এসে তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থম করে দাঁড়িয়ে পড়ল। চৌকাঠের কাছে। ঘরে কার্তিক নেই, হ্যাজাকের সুতীব্র আলোকে স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা গেল, বসে রয়েছে মাত্র দু জন স্ত্রীলোক,—একজন রাখহরির কন্যা জয়া, আর একজন তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নবাগতা শ্রীমতী ইন্দ্রাণী।

শঙ্কর যা ভেবেছিল ঠিক তাই। এবার আর তার কোনও সন্দেহই রইল না।

সেই ইন্দ্রাণী! পরনে কালো চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, তেমনি কালো পাড়-দেওয়া সাদা ব্লাউজ। মাথায় একমাথা চুলের এলো খোঁপা। পায়ে স্লিপার। গয়না বলতে হাতে মাত্র দুগাছা চুড়ি, কানে দুটি হীরের মত সাদা পাথর।

ইন্দ্রাণীকে যেন আগের চেয়েও বেশী পরিচ্ছন্ন, আগের চেয়েও বেশী সুন্দরী দেখাচ্ছে। এত সুন্দরী যেন তার না হলেও চলত।

শঙ্করকে দেখেই জয়া বলে উঠল, "এই নিন আপনার ইন্দ্রাণী দেবী। বেশ লোক যাহক! আমার ওপর বোঝাটি চাপিয়ে দিয়ে নিজে কেমন সরে পড়লেন!"

সর্বনাশ! ইন্দ্রাণী কি তাহলে সবকিছু বলে দিয়েছে নাকি?

শঙ্কর তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

কিন্তু সে-ভুল তার ভাঙতে দেরি হল না। জয়া বললে, "এঁরই কথা বলছিলাম। ইনিই শঙ্করবাবু।"

ঘরে ঢোকবার সময়েই একবার সে শঙ্করকে দেখে নিয়েছে। জয়ার কথাটা শুনে আর-একবার চোখ তুলে তাকালে।

চোখে চোখ পড়ে গেল এতক্ষণে। ইন্দ্রাণীর দুটি কালো চোখের উপর পড়ল শঙ্করের দুটি চোখ।

ইন্দ্রাণী চোখ নামিয়ে নিলে। শঙ্করও বাধ্য হল চোখ ফিরিয়ে নিতে। বিদ্যুতের মত একটা শিহরণ যেন তার সর্বাঙ্গে বয়ে গেল।

কিন্তু কেন? যে-মেয়ে তার সমস্ত অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তাকে দেখে তার কেন এ চঞ্চলতা? টেবিলের উপর মেয়েদের দরখাস্তের ফাইলটা পড়ে ছিল, শঙ্কর সেইটে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মনে হল তার হাতের আঙুলগুলো যেন কাঁপছে।

হঠাৎ তার পায়ের উপর হাত পড়তেই শঙ্কর চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখলে, ইন্দ্রাণী তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে।

হাতটি মাথায় ঠেকিয়েই আবার সে জয়ার পাশে গিয়ে বসল।

জয়া বললে, "কেমন করে দরখাস্তর জবাব দেওয়া হয়েছিল বললাম ওকে। সুন্দর সুন্দর নাম দেখে দেখে—"

বলতে বলতে জয়ার সে কি হাসি।

হাসতে হাসতে বললে, "ইন্দ্রাণী নামটাই ওঁর পছন্দ হল সব চেয়ে বেশী। যেই শোনা আর বললেন—বাস্ একেই আসতে বল।"

ফাইলের পাতা ওলটাতে ওলটাতে সেদিকে না তাকিয়েই শঙ্কর বললে, "দুজনের বুঝি খুব ভাব হয়ে গেছে।"

হাসির ধমক তখন একটু থেমেছে জয়ার। বললে "হ্যাঁ। খুব।"

শঙ্করের মুখে কিন্তু হাসি নেই। ইন্দ্রাণীও কী যেন ভাবছে।

জয়া ইন্দ্রাণীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "আ-মর্। গোমড়া মুখ করে বসে আছে দ্যাখ! কী ভাবছ?"

ইন্দ্রাণীর মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। এ যেন হাসতে হয় বলে হাসা।

জয়া বললে, "জানেন শঙ্করদা, গরুর গাড়িতে জীবনে এই ও প্রথম চাপলে। গাড়ি থেকে যখন এসে নামল, ভেবেছিলাম, আমারই মতন হবে হয়ত ধিঙ্গি এক কুমারী মেয়ে। ও মা! দেখি—না, সিঁথিতে সিঁদুর। এত সুন্দর মুখ কিন্তু কী গম্ভীর রে বাবা! কথা কইতে ভয় করছিল। তার পর ধীরে ধীরে মুখ খুললে। মা মারা গেছে। ছোট একটি ভাই আছে কলেজে পড়ছে, তার খরচ পাঠাতে হয়। টাকার খুব দরকার, তাই চাকরির জন্যে এই দূর পাড়াগাঁয়ে এসেছে। আর কি বলছিল জানেন শঙ্করদা?"

শুনতে শুনতে শঙ্কর বোধকরি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। নীচের দিকে মুখ করে মিছেমিছি ফাইলের পাতাগুলো তখনও সে উলটে চলেছে। বললে, "উঁ?"

ইন্দ্রাণী হাত বাড়িয়ে চুপি চুপি জয়ার গায়ে একটা ঠেলা মারলে।

জয়া কিন্তু তার বারণ শুনলে না। বললে, "বলছিল, চাকরিটা আমার হবে ত ভাই?"

"তুমি কী বললে?"

বললাম, "ভারী ত চাকরি! ধাড়ি ধাড়ি মেয়েদের অ আ ক খ পড়াতে হবে। চাকরিটা তোমারই বরং পছন্দ হলে হয়!"

শঙ্কর মুখ না তুলেই বললে, "হুঁ।"

জয়ার কথা বোধকরি তখনও শেষ হয়নি। বললে, "শঙ্করদা সেরকম মনিব নন। চাকরি তোমার হবে।"

শঙ্করের ইচ্ছে করছিল, জয়াকে জিজ্ঞাসা করে—সে তার দাদা হল কখন থেকে? কিন্তু ইন্দ্রাণীর সামনে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছেটা দমন করে বললে, "মনিব আমি কেন হব? মনিব তারিণীবাবু।"

জয়া বললে, "থামুন। সে-কথা আর কাউকে বলবেন। কেন? একে বুঝি পছন্দ হচ্ছে না? আর একটা নাম খুঁজে বের করে দেব? দিন ফাইলটা।" বলেই সে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, "সেই থাকমণি দাসী না কি নাম একটা দেখেছিলাম যেন।"

বাইরে জানলার কাছে ভজু এসে দাঁড়াল। ডাকলে, "দিদিমণি!"

সবাই তাকালে সেইদিকে। ভজুর এক

হাতে লাঠি, এক হাতে একটা লণ্ঠন। বললে, "বাবু আমাকে পাঠালেন দিদিমণি। বাড়ি চল।"

"হ্যাঁ, যাই," বলে জয়া উঠল, "আমি কেমন বসে বসে গল্প করছি দ্যাখো! ওদিকে বাবা এসে বসে আছে। শঙ্করদা, আপনি যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, আমি করে দিয়েছি। এবার আমার ছুটি।"

এই বলে জয়া উঠে দাঁড়াল।

শঙ্কর এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালে জয়ার দিকে। বললে, "ও'র থাকবার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, সব—সব দেখিয়েছি। কিন্তু শেয়ালের ডাক শুনে উনি চমকে চমকে উঠছেন। ওখানে—ও'র ওই কোয়াটারে উনি থাকবেন কেমন করে একা একা?"

শঙ্কর বললে, "বিশু হালদারের মেয়েটাকে রেখে দেব ও'র কাছে। দুবেলা দুটি খেতে পেলেই কাজকর্ম করে দেবে। বেচারার কেউ কোথাও নেই।"

জয়া বললে, "আপনি সব ঠিক করেই রেখেছেন তাহলে। আজ চলি।"

"হ্যাঁ যাও।" শঙ্কর বললে, "শত্রুশিবিরে এসেছ। বাবা একজন দরোয়ান পাঠিয়েছেন লাঠি হাতে দিয়ে। ও'কে আজ তোমার কাছে নিয়ে গিয়েই রাখ।"

জয়া বললে, "তবে কি ভেবেছেন ওকে আপনার কাছে ছেড়ে দিয়ে যাব?"

এই বলে সে এক অদ্ভুত হাসি হেসে ইন্দ্রাণীর হাতে ধরে বললে, "এস।"

যেই তারা বেরিয়ে যাবে, দোরের কাছে কার্তিক এসে তাদের পথ আটকে দিলে। "এ কী ব্যাপার? জয়ারাণী আমাদের এখানে?"

"কেন? তোদের এখানে আসতে নেই নাকি?"

কার্তিক ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। হাত জোড় করে একটি নমস্কার করলে। বললে, "ও বুঝেছি। আপনিই বুঝি আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হয়ে এলেন?"

জয়া বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। এলেন। হাঁ করে আর দেখতে হবে না, কাল দেখবি। পথ ছাড়।"

লজ্জিত হল কার্তিক। বললে, "যাঃ! আচ্ছা ফাজিল মেয়ে ত।"

পথ ছেড়ে দিয়ে শঙ্করের কাছে এসে বললে, "শঙ্করদা, জন্তুটা কী। ওই বুঝি মাষ্টারনী?"

"হ্যাঁ।"

কার্তিক জিজ্ঞাসা করলে, "দরখাস্তের সঙ্গে ফটো পাঠিয়েছিল নাকি?"

শঙ্কর বললে, "না।"

"বেশ বেছেছ ত।" কার্তিক বললে, "খেয়ে নাও, আর দেরি কেন?"

"দে। আমি চট করে হাতমুখ ধুয়ে নিই।"

গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে শঙ্কর উঠে দাঁড়াল।

স্টোভে-চড়ানো মাংসের বাটিটা কার্তিক টেবিলের উপর রাখলে। বললে, "দেখলে? একটা জিনিস দেখতে ভুলে গেলাম।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কী?"

"জয়াটা ভাল করে' দেখতেও দিলে না। সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা দেখলাম না।"

এতক্ষণ পরে শঙ্কর হেসে ফেললে। বললে, "আছে।"

"তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি। আমাদের কোনও আশা নেই।" বলেই হো হো করে হেসে উঠল শঙ্কর।

তারিণীশঙ্কর বিদ্যামন্দির (বালিকা বিদ্যালয়) খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মুরুব্বি-মাতব্বরদের ডেকে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছিল খোলবার আগে। গ্রামের লোকসংখ্যা কম নয়। সবাই এসে-ছিল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল বালিকা বিদ্যালয়ের সুমুখের রাস্তাটা। নেহাত যারা আসবার নয়, তারা ছাড়া গ্রামের মেয়েরাও উঁকিঝুঁকি মারছিল এদিক-ওদিক থেকে। সেটা অবশ্য সভা দেখবার জন্য নয়। সবাই শুনেছিল, মেয়েদের পড়াবার জন্যে একজন মাষ্টারনী এসেছে কলকাতা থেকে। সে নাকি লেখাপড়াজানা খুব সুন্দরী মেয়ে।

সভা কেমন করে করতে হয় তাও জানে না এখানকার কেউ। শঙ্করকেই সব আয়োজন করতে হল। সভাপতি করা হল তারিণীশঙ্করকে। শঙ্করের ইচ্ছে ছিল রাখহরিকে প্রধান অতিথি করে। রাখহরি কিছুতেই রাজি হল না। বললে, "জয়া ত রয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা তোমাদের ওই মাষ্টারনীর সঙ্গে। জয়া যাবে তাইতেই হবে। আমি আর নাই-বা গেলাম।"

শঙ্কর বললে, "একটিবার গিয়ে ঘুরে আসবেন।"

তাই হল। শঙ্করের অনুরোধ এড়ান শক্ত। হুঁকো টানতে টানতে রাখহরি এল একবার। বালিকা বিদ্যালয়টা ঘুরে ফিরে দেখলে। পাছে তারিণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন চাষীকে করে দেওয়া হল প্রধান অতিথি। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তারিণীশঙ্করের পাশে লোকটি কিছুতেই চেয়ারে বসতে চাইলে না। তারিণীশঙ্করের পাশে দুখানি চেয়ারে বসল ইন্দ্রাণী আর জয়া।

আবার আর-এক বিপদ বাধল। শঙ্কর যখন তারিণীশঙ্করকে বললে, "আপনি